ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৭:১৮

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা
সুলতানি যুগে ভারতের বাণিজ্য : গতি ও প্রকৃতি
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা
১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন ও 'দৈনিক ইত্তেফাক'
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন : বৈধতার স্বরূপ সন্ধান
কুমিল্লার সাময়িকপত্রে রাষ্ট্রভাষা-চিন্তা
বাংলাদেশে নাট্য-ব্যবস্থাপনা : সাংগঠনিক কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন
সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান . একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা
মেহেরপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি : লোক-কারুশিল্প ও লোকছড়া
উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানে নারীর আর্তি
মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' . বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃরূপ
শিল্পী এস.এম. সুলতান : বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক
সেলিম আল দীন-এর নাটক 'কেরামতমঙ্গল'
বাংলাদেশে শেখ সাদীর কাব্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা
সংস্কৃত প্রকরণ কাব্যের উদ্ভব ও উপযোগিতা
গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন
বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রম শোষণের প্রকৃতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
মো. মাহবুবর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭
প্রকাশকাল : মার্চ ২০১১

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক

এস.এম. গোলাম নবী
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ।। ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মুদ্রক
মেসার্স শাহপীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

মো. মাহবুবর রহমান
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জাকির হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

এম. হাবিবুর রহমান
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ.এইচ.এম. মোস্তাফিজুর রহমান
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল

এম. জয়নূল আবেদীন
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সনজীব কুমার সাহা
প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. কামরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগর ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে"। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা ৭
স্বরোচিষ সরকার
সুলতানি যুগে ভারতের বাণিজ্য : গতি ও প্রকৃতি ৩৭
ইমতিয়াজ আহমেদ
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা ৫১
মোহাম্মদ মাহবুবুল হক
১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন ও 'দৈনিক ইত্তেফাক' ৬১
মো. আনোয়ারুল ইসলাম
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন : বৈধতার স্বরূপ সন্ধান ৭১
এস. এম. এক্রাম উল্যাহ
মো. সুলতান মাহমুদ
কুমিল্লার সাময়িকপত্রে রাষ্ট্রভাষা-চিন্তা ৮৯
মামুন সিদ্দিকী
বাংলাদেশে নাট্য-ব্যবস্থাপনা : সাংগঠনিক কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন ৯৯
মলয় কুমার ভৌমিক
সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ১০৯
মোঃ আমিরুল ইসলাম
মেহেরপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি : লোক-কারুশিল্প ও লোকছড়া ১১৯
ইয়াসমিন আরা সাথী
উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানে নারীর আর্তি ১২৫
মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগম
মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা ১৩১
শামীমা সুলতানা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' : বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃরূপ ১৩৩
মো. আতাউর রহমান
শিল্পী এস.এম সুলতান: বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক ১৩৯
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা
সেলিম আল দীন-এর নাটক 'কেরামতমঙ্গল' ১৫৫
অনুপম হাসান
বাংলাদেশে শেখ সাদীর কাব্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা ১৭১
মোঃ ওসমান গনী
সংস্কৃত প্রকরণ কাব্যের উদ্ভব ও উপযোগিতা ১৮১
বিপুল কুমার বিশ্বাস
গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন : একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সমীক্ষা ২৯৩
মো. নূরুল ইসলাম
বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রম শোষণের প্রকৃতি: মেঘনা পাড়ের ইলিশ আহরণকারী জেলেদের উপর সমীক্ষা ২১৩
মোঃ জাহাঙ্গীর কবির

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা

স্বরোচিষ সরকার*

Abstract: Bengali language is described as 'state language' in the Bangladesh Constitution. It demands that Bengali will be used as medium of expression all over Bangladesh. Accordingly, governments in different times created many rules and laws for puting into practice of Bengali as official, judicial, educational, commercial, cultural purposes. But what is the trait of these initiatives since independence ? How much implementation is noticeable? This paper is an effort to investigate the pattern of Bengali language uses in every sphere of national life in Bangladesh.

১. ভূমিকা

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পৃথিবীতে বাংলাভাষী জনসংখ্যা ২৩ কোটির বেশি। এই হিসেব অনুযায়ী বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা।[১] অনেকের হিসেবে বাংলা এখনই চতুর্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা।[২] জাতিসংঘে মোট ছয়টি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং সেইসব ভাষায় জাতিসংঘের কাজকর্ম চলে। ভাষাগুলো নির্বাচনের সময়ে ভাষিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যদি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষাও বর্তমানে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার দাবিদার। সম্ভবত এই বিবেচনায় ২০০৯ সালের ৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করা হয় যে, জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্তি দাবি করা হবে।[৩] উল্লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্তি দাবি করেছিলেন।[৪] ২০১০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তিনি এই দাবি

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

[১] ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মান্ডারিন (চীনা) ভাষা ৮৩,৬০,০০,০০০ জনের, হিন্দি-উর্দু ভাষা ৩৩,৩০,০০,০০০ জনের, হিস্পানি ভাষা ৩৩,২০,০০,০০০ জনের, ইংরেজি ভাষা ৩২,২০,০০,০০০ জনের এবং বাংলা ভাষা ২৩,১৮,০০,০০০ জনের মাতৃভাষা। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[২] www.davidbrown.co.uk/help/top-language-by-population, accessed on 9 April 2010. এদের হিসেব অনুযায়ী মান্ডারিন, হিস্পানি এবং ইংরেজির পরে বাংলা ভাষার স্থান, পরে হিন্দি।

[৩] *সংবাদ*, ৮ এপ্রিল ২০০৯।

[৪] *সংবাদ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯। শেখ হাসিনা তাঁর এই বক্তৃতাটি বাংলা ভাষায় দিয়েছিলেন; ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণের পর দ্বিতীয় বার।

পুনরায় উত্থাপন করেন।[৫] এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে ভারতও যাতে জাতিসংঘের নিকট অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করে, সেজন্য তিনি কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন।[৬]

১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর থেকে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের যে আকাঙ্ক্ষা বাঙালি জাতিসত্তাকে প্রণোদিত করে আসছে, জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি সেই আকাঙ্ক্ষার একটি সম্প্রসারণ। এর ফলে সর্বস্তরের সংজ্ঞা নিঃসন্দেহে আরো বিস্তৃত হলো। অর্থাৎ জাতীয়ভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার সার্বজনিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও এই ভাষা ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো। তবে এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য জাতীয়ভাবে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার, তা কতোটা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই নিবন্ধে মূলত সেই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হবে। বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার কী পর্যায়ে রয়েছে, তা জানা সম্ভব হলে, এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কোনো অসম্পূর্ণতা চোখে পড়লে, তা পূরণ করার মাধ্যমে উল্লিখিত দাবিকে আরো শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব হবে।

যতোভাবে মানুষ তার ভাষাকে ব্যবহার করে, অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের যতো রকমের কৌশল রয়েছে, তার মধ্যে সবগুলো কৌশল বাংলা ভাষা কাজে লাগাতে পারলে বলা যাবে যে, বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই প্রথমে ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ভাষার প্রকাশ-মাধ্যমে ঘটেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। ভাষার প্রকাশ-মাধ্যম মূলত ত্রিমুখী: দৃশ্য মাধ্যম, শ্রব্য মাধ্যম এবং দৃশ্যশ্রব্য মাধ্যম। দৃশ্য মাধ্যমের মধ্যে অনেকগুলো মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, আবার অনেকগুলো অমুদ্রিত অবস্থায় থাকে। পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাদি, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। আবার নথিপত্র, দলিলপত্র, চিঠিপত্র, ম্যাসেজ, ই-মেইল ইত্যাদি অমুদ্রিত অবস্থায়ও পাওয়া যায়—পড়া যায়। শ্রব্য মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে ফোন, মোবাইল, রেডিও এবং বিভিন্ন ধরনের অডিও রেকর্ড। আবার দৃশ্যশ্রব্য মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন এবং নানা ধরনের অডিও-ভিজুয়াল। বাংলাদেশের কোন কোন স্তরে ভাষার এসব যোগাযোগ-মাধ্যম কাজে লাগে, সেগুলোর দিকে তাকালে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি উপলব্ধি সহজ হবে।

প্রথমত, দাপ্তরিক যোগাযোগ বা অফিস সংক্রান্ত যোগাযোগ। অফিস বলতে বোঝায় সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের দপ্তর যেখান থেকে প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই হিসেবে সরকারি দপ্তর বলতে বোঝায় ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে শুরু করে সরকারপ্রধানের কার্যালয় পর্যন্ত। এসব কার্যালয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ড একমাত্র লিখিত ভাষা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়।

দ্বিতীয়ত, আদালত। আদালতের মূল কাজ বিচার পরিচালনা করা। সরকারি অফিসের মতো এরও নিম্ন এবং উচ্চ পর্যায় রয়েছে। আদালতে বিচারকাজ সম্পন্ন হয়; বিচারপ্রার্থী, আসামি, সাক্ষী, আইনজীবী, বিচারক সকলকেই কাজ করতে হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষার মাধ্যমেই

---

[৫] *প্রথম আলো*, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০। এবারও তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন।

[৬] ২০০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতায় বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খন্দকার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের সঙ্গে দেখা করেন এবং অনুরোধ জানান, যাতে জাতিসংঘে বাংলা ভাষাকে অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা একটি বিল পাস করে এবং অচিরে জাতিসংঘে প্রেরণ করে। *আক্রান্ত মাতৃভাষা: আসুন প্রতিরোধ করি*, নীতীশ বিশ্বাস সম্পা. (কলকাতা: ঐকতান, ২০১০), পৃ. সংযোজনী ৪৪।

আবেদন-নিবেদন করতে হয়, সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হয়, আইনজীবীদের মুসাবিদা করতে হয়, এমনকি বিচারের পর যে রায়টি দেওয়া হয়, তাও দিতে হয় লিখিত ভাষার মাধ্যমে।

তৃতীয়ত, শিক্ষা। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহু স্তরে ও বহু ধারায় বিভক্ত। এর রয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্তর। রয়েছে সাধারণ ধারা ও ধর্মীয় ধারা। শিক্ষাকে ভাগ করা যায় অবৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা—এভাবে। তবে সব ক্ষেত্রের জন্যই চূড়ান্ত সত্য হলো, জ্ঞান ভাষানিরপেক্ষ, এবং ভাষা ছাড়া জ্ঞান আহরণ করা বা বিতরণ করা সম্ভব নয়। তাই সব স্তর ও সব ধারার শিক্ষাব্যবস্থাতেই ভাষার ব্যবহার আবশ্যিক।

চতুর্থত, গণযোগাযোগ। বাংলাদেশের গণযোগাযোগের জন্য মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলো ভাষার লিখিত রূপকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলোর বড়ো একটি অংশে ভাষার উচ্চারিত রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পঞ্চমত, ব্যবসা-বাণিজ্য। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বিমুখী: অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক। উভয় ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত পত্রাদি, চালান, কোটেশন, টেন্ডার, দৈনিক হিসাব-নিকাশ, অডিট প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে।

ষষ্ঠত, সেবা-প্রতিষ্ঠান। বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি বরাদ্দ, বাতিল এবং বিল তৈরি করার জন্য ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়।

বাংলাদেশের এসব স্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দান করা অন্বিষ্ট নিবন্ধের মূল লক্ষ্য।

২. আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পটভূমি

হাজার বছর পূর্বে বাংলা ভাষার জন্ম হলেও প্রশাসনিক বা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার অতো প্রাচীন নয়। বাস্তবে মোগল শাসনামলের বাংলাদেশের কোনো কোনো জমিদারিতে, যেমন রাজশাহীর নাটোরে; এবং প্রায় একই সময়ে আরাকান, ত্রিপুরা, আসাম, শ্রীহট্ট ও কুচবিহার প্রভৃতি প্রান্তিক কিছু রাজ্যে বাংলা ভাষায় দাপ্তরিক কাজের উদাহরণ পাওয়া যায়। এরপর ব্রিটিশ শাসনের এক পর্যায়ে, বিশেষভাবে উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বীকৃতি মেলে। সীমিত পর্যায়ে হলেও ১৯৩৭ সালে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার চালু হয়। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ছিলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা, নিম্ন আদালতে সাক্ষ্যাদি গ্রহণ, ভূমিব্যবস্থায় কিছু কিছু চুক্তিপত্র ও দলিল, ইত্যাদি।

একদিকে রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্যদিকে জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জোরালো আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর। বিশেষভাবে নব-সৃষ্ট পাকিস্তানে যখন দেখা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা, তখন স্বাভাবিকভাবে আবদুল হকের মতো অনেকের মনে এমন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে বাংলা।[৭] কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের মূলে ছিলো সর্বভারতীয় মুসলমানত্ব ও অমুসলমানত্ব। সর্বভারতীয় একটি ভাষা সেই জাতীয়তাবাদীদের প্রয়োজন হয়। এক পর্যায়ে আরবি লিপিতে লেখা হিন্দুস্তানি তথা উর্দুকে তাঁরা মনে করতে শুরু করেন, এটি ভারতীয়

---

[৭] আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ১৬। ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় তিনি এই দাবি করেছিলেন।

মুসলমানের জাতীয় ভাষা। সেই অনুযায়ী তাঁরা প্রচারণা চালান। এই প্রচারণা বাঙালি মুসলমানের নিকটেও এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে আবদুল হকের মতো যুক্তিবাদী লেখকও এক পর্যায়ে নিবৃত্ত হন এবং বুঝতে পারেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন এখানে চলবে না। এই পরিস্থিতিতে শুধু পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা যায় কিনা, অতঃপর সেটাই হয়ে ওঠে বিবেচনা, আলোচনা, দাবি, ও আন্দোলনের বিষয়।

এরপর ১৯৪৮ সাল আসে, ১৯৫২ সাল আসে, ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মেলে। ১৯৬২ সালে আবার সংবিধান হয়, সেখানেও বাংলা ভাষার স্বীকৃতি একই রকম থাকে। এর প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশের মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের। তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। প্রথম উদ্যোগ ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা—বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত করাই যার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষাদি তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই প্রতিষ্ঠানকে। এভাবে পাকিস্তান শাসনামলের ২৪ বছরে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে একাধিক সরকারি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এইসব উদ্যোগের সঙ্গে ১৯৪৭-পূর্ববর্তী উদ্যোগের কিছু যোগসূত্র ছিলো। বিশেষভাবে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিশ শতকের সূচনা থেকে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছিলো, যাতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্ভব হয়। বাংলা ভাষামাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ লাভের মাধ্যমে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে, বাংলা ভাষা বিকাশে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ঘটে যুগান্তকারী এক ঘটনা, জন্ম নেয় বাঙালির জন্য আলাদা দেশ—বাংলাদেশ। জন্ম নেওয়ার এক বছরের মধ্যেই প্রণীত হয় এ দেশের সংবিধান—বাংলা ভাষায় রচিত পৃথিবীর প্রথম সংবিধান। দাপ্তরিক ভাষা যে বাংলাই হবে এবং জীবনের সব স্তরে যে বাংলাই হবে একমাত্র ভাষা, তা এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্মের আগেই তা চূড়ান্ত করে রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন, "আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলা ভাষা চালু হবে, তা হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয় তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।"[৮]

বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা রেখেছিলেন। জীবনের সর্বস্তরে যাতে বাংলা ভাষা চালু হয়, সেজন্য তিনি নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলা ভাষায় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯] বাংলা ভাষাকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব কম সময় পাওয়া সত্ত্বেও তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেগুলোর মধ্য থেকে মাত্র দুটির উল্লেখ যথেষ্ট: এক. তিনি বাংলা ভাষায় দেশের সংবিধান রচনা করেছিলেন, এবং দুই. ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায়

---

[৮] উদ্ধৃত, শামসুজ্জামান খান, "বাংলা প্রচলন প্রসঙ্গে," *বাংলার বাণী*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

[৯] *দৈনিক বাংলা*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দান করেছিলেন। তাঁকে মেরে ফেলা হয় ১৯৭৫ সালে। তিনি আরো কিছু কাল দেশ শাসনের সুযোগ পেলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিষয়টি আরো খানিকটা শক্ত অবস্থানে উন্নীত হতো। সেই কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছাতে না পারলেও এ ব্যাপারে যেসব মৌলিক সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে রেখেছিলেন, ইচ্ছা থাকলেও পরবর্তী শাসকগণের পক্ষে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিলো না। তাই বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী কালের শাসকগণ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা বঙ্গবন্ধুর অবদানের ধারাবাহিকতামাত্র।

৩. সংবিধান ও বিধি-বিধান

সংবিধানে স্বীকৃতি থাকলেই কোনো ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহারের সুবিধা পায়, এমন নয়। তবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকলে সুনির্দিষ্ট ভাষার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, সেটাই স্বাভাবিক। সাংবিধানিক স্বীকৃতির ফলে কোনো দেশের সংখ্যালঘুর ভাষাও কিভাবে ক্রমে দেশের প্রধান ভাষায় পরিণত হয়ে যায়, উর্দু তার উদাহরণ হতে পারে। পাকিস্তানের সর্বশেষ সংবিধানে (১৯৭৩) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলা হয়নি, বলা হয়েছে শুধু জাতীয় ভাষা। তাতেই উর্দু এখন পাকিস্তানের শিক্ষিত মানুষের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা তো বটেই, ইংরেজির পাশাপাশি তা জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বত্র স্থান করে নিয়েছে। অথচ ১৯৪৭ সালের পরে সমগ্র পাকিস্তানে তা ছিলো পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র সাত শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা।[১০] অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় একশত ভাগ ছিলো বাংলাভাষী। তাই এমন একটি দেশের সংবিধানে যদি বাংলা ভাষাকে সরাসরি 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়, বাংলা ভাষার কাঙ্ক্ষিত বিকাশের জন্য তা কতোটা সহায়ক, সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে বাংলা ভাষার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো, সম্ভবত এই বিবেচনায় বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা হয়: "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"।[১১] তিন শব্দের এই বাক্যটি সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ। বাংলাদেশের সংবিধানে ভাষাকে কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে, এ থেকে তা অনুমান করা যায়।[১২]

বাংলাদেশের সংবিধানের এই চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কাজকর্মের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। সেই প্রতিবন্ধকতা ছিলো মূলত দ্বিবিধ: প্রথমত যান্ত্রিক ও দ্বিতীয়ত মানসিক। একদিকে সরকারি কাজকর্মের জন্য দেশের সর্বত্র যে পরিমাণ বাংলা টাইপ-রাইটার প্রয়োজন ছিলো, সরকার তা সরবরাহ করতে পারেনি। অন্যদিকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, যাঁরা বহু কষ্টে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে নিজেদের আলাদা একটি শ্রেণীতে পরিণত করেছেন, সেই ভাষা ত্যাগ করে

---

[১০] ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাভাষী লোক ছিলো শতকরা ৫৪.৬ ভাগ, অন্যদিকে উর্দুভাষী লোক ছিলো শতকরা ৭.২ ভাগ। আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, পৃ. ৪২।

[১১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৩।

[১২] প্রসঙ্গত স্মরণীয় ভারতের সংবিধানে ভাষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয় ৩৪৩ নং অনুচ্ছেদে, এবং পাকিস্তানে ১৯৭৩ সালে গৃহীত সে দেশের সর্বশেষ সংবিধানে ভাষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয় ২৫১ নং অনুচ্ছেদে। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের "মাতৃভাষার সাংবিধানিক অধিকার ও বাস্তবতা," in *History Society Culture: A. B. M. Husain Festschrift,* M. A. Bari and M Fayek Uzzaman ed. (Dhaka: Khan Brothers & Co., 2009), pp. 558–64.

সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করছিলেন।[১৩] নানা ধরনের অজুহাত তুলে ধরে তাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম অজুহাত ছিলো পরিভাষার।

উচ্চ পর্যায়ের কর্তকর্তাগণের এই মনোভাব যে বাংলা ভাষা বিকাশের পক্ষে চরম অন্তরায়, কিছুটা দেরিতে হলেও বঙ্গবন্ধু তা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কাজকর্ম বাংলায় করার নির্দেশ জারি করেন। সেই নির্দেশে তিনি যাবতীয় ইংরেজি ফরমকে বাংলায় অনুবাদ করার আদেশ দেন এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া সরকারি মুদ্রণালয় থেকে ফরম, ডিও প্যাড, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি ইংরেজিতে মুদ্রণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[১৪] এতেও যখন কাজ হয় না, তখন পরের বছর তাঁকে আরো কঠোর নির্দেশ জারি করতে হয়। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ জারিকৃত সেই কঠোর নির্দেশটি ছিলো নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গণভবন, ঢাকা
সংখ্যা ৩০/১২/৭৫, সাধারণ—৭২৯/১ (৪০০) ১২ই মার্চ, ১৯৭৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তার ভালবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাংগালী কর্মচারীরা ইংরেজী ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।

এ আদেশ জারী হওয়ার সংগে সংগে সকল সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারী অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে উক্ত বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তা ব্যক্তিগণ সতর্কতার সাথে এ আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ব্যবস্থা করবেন। তবে কোন বিদেশী সংস্থা বা সরকারের সাথে পত্র যোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে ইংরেজী অথবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন। তেমনিভাবে বিদেশের কোন সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময়ও বাংলার সাথে অনুমোদিত ইংরেজী বা সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান
রাষ্ট্রপতি[১৫]

---

[১৩] হুমায়ুন আজাদ, *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র* (২য় সং; ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৪৯।

[১৪] বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ'-এর প্রাসঙ্গিক নথি।

[১৫] উদ্ধৃত, মাহবুব তালুকদার, *সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার: সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৪৪–৪৫।

'মাতৃভাষার প্রতি যার ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তার ভালবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়'—এই ধরনের বাক্য সরকারি আদেশের মধ্যে সাধারণত দুর্লক্ষ্য। একজন রাষ্ট্রপতি কেন তাঁর আদেশের মধ্যে নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয় টেনে আনবেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। বর্তমান আলোচকের ধারণা, এই বাক্যটি স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর—জাতির জনকের—যাঁর বিশ্বাস-অবিশ্বাস গোটা জাতির বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, তাকে আলাদা করা অসম্ভব। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যায় ১৯৭৫ সালের ২৩শে অক্টোবর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাক্ষরিত প্রায় অনুরূপ একটি আদেশপত্র পাঠ করার পর। আদেশপত্রটি ছিলো নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, রাষ্ট্রপতির বিভাগ, বংগভবন, ঢাকা
নং ৩০/১২/৭৫-সাধারণ-৩৭০/১ (৩০০) ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭৫

বাংলা রাষ্ট্রভাষা। পূর্বেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে সরকারী নথি এবং চিঠিপত্র বাংলায় লেখা হইবে।

এই আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে কোন কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং আধা-সরকারী দফতরসমূহে এখন পর্যন্ত ইংরেজীতে নথি এবং চিঠিপত্র লেখা হইতেছে। ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের এই প্রবণতা অনভিপ্রেত।

অতএব পুনরায় এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে সকল সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং আধা-সরকারী দফতর[-এ] বাংলায় নথি ও চিঠিপত্র লেখা হইবে। বিদেশের কোন সরকার বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে বাংলার সহিত অনুমোদিত ইংরেজী বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলিবে। তবে কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থার সহিত পত্র যোগাযোগ ইংরেজীতে করা যাইবে।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ
রাষ্ট্রপতি[১৬]

এটি-যে অভিজ্ঞ কোনো আমলার হাত দিয়ে উপস্থাপিত, তা এর ভাষা দেখেই বোঝা যায়—মোশতাক আহমদ শুধু স্বাক্ষর করেছেন মাত্র। একই কারণে এখানে প্রথমোক্ত পত্রের 'বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা' ধরনের 'অ-নির্লিপ্ত' বাক্য নেই। এই আদেশের মধ্যে দুটি পরিবর্তন লক্ষণীয়: প্রথমটি ভাষার শৈলীগত, এবং দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে একমাত্র ইংরেজি ব্যবহারের স্বীকৃতি। পূর্ববর্তী আদেশের কোথাও একমাত্র ইংরেজিতে কোনো কিছু রচনার বিধান ছিলো না, তা মনে করা যেতে পারে। এছাড়া কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় একই ধরনের নতুন একটি আদেশ দেওয়ার পেছনে অন্তত দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে: প্রথমত, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা বাংলা ভাষা ব্যবহারে চরম অনীহ ছিলেন, সেখান থেকে তাদের সরিয়ে আনার চেষ্টা, যাতে গণবিচ্ছিন্নতাকে যতোটা সম্ভব কমিয়ে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানমুখী এই সরকারকে আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে বিদেশের সঙ্গে এতো বেশি যোগাযোগ করতে হচ্ছিলো, দ্বিভাষিক নীতি মেনে তা দ্রুত গতিতে করা সম্ভব হচ্ছিলো না। তবে যে কারণেই হোক না কেন,

---

[১৬] উদ্ধৃত, মাহবুব তালুকদার, *সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার: সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, পৃ. ৪৬।

একমাত্র ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সুযোগে সরকারের চূড়ান্ত পর্যায়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত একমাত্র ইংরেজিতে রাখার চল হতে শুরু করে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ইংরেজিতে কাজ করার প্রবণতা এভাবে খানিকটা বৃদ্ধি পায় বটে, তবে পাশাপাশি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সরকারি উদ্যোগকেও অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। খোন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সেনাবাহিনী সমর্থিত যে সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে, তা খানিকটা থিতু হওয়ার পর সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের পূর্ববর্তী উদ্যোগকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার প্রথম প্রতিফলন ঘটে ১৯৭৬ সালের ৩রা মে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমের দপ্তর থেকে সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে পাঠানো একটি চিঠির মধ্য দিয়ে। এই চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, "রাষ্ট্রপতির নিকট উত্থাপিত সকল নোট, সারসংক্ষেপ, প্রস্তাব বাংলা ভাষায় পেশ করতে হবে।"[১৭] এই চিঠি থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, খোন্দকার মোশতাক আহমদের ঐ আদেশের ফলে সরকারের কর্মকর্তাগণ শুধু বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগই নয়, দেশের মধ্যকার যাবতীয় কাজকর্মও ইংরেজিতে করতে শুরু করেছিলেন।

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হোক, তা তিনি চাইতেন বলে মনে হয়। কিন্তু যে কর্মকর্তাগণ তাঁকে ঘিরে ছিলেন, বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি তাঁদের আগ্রহ এবং আন্তরিকতা যথেষ্ট ছিলো না। বিষয়টি বোঝা যায় ১৯৭৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তাঁর মন্ত্রী পরিষদে গৃহীত বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নোট গ্রহণ ও তা প্রচারের ভাষা থেকে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন করার ঐ সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত হয় ইংরেজি ভাষায়। ঐসব সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করে ১৯৭৯ সালের ১২ই জানুয়ারি ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে একটি আদেশ জারি করা হয়। আদেশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো:

> (a) The Bengali language is an integral part of our nationalism and was a key element in our struggle for independence. The failure to use and apply the language at all levels of national life is a sad commentary on our declared intentions and sincerity. All work and files concerning the cabinet and Ministries may be conducted in Bengali from now onwards. Report on command over the mother tongue should be made a part of the ACR of each officer.
>
> (b) Stress should be laid on preparing the coming generation from the very elementary school-level for application and use of Bengali in all activities of life and living. A responsible committee may be formed to ensure preparation of text books in simple and lucid Bengali, rather than the difficult language in which many school text books have been written. Imposing the use of the language from the top will not bear fruit unless adequate preparation is made at the base level.

---

[১৭] পত্রের স্মারক: ১/৪৬/৭৯ সাধারণ ১১৪৩ (৪৩), সংরক্ষিত, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের প্রাসঙ্গিক নথি।

(c) The report of the national Education committee is being awaited pending receipt of which no further committee should be set up. A number of steps have been taken to expand the use of Bengali in practical life. Instructions at college and university level are being given usually in Bengali and the students have an option to appear in the examination in English also. In the armed services and the police, the word of command has been changed into Bengali. The PSC may conduct the examinations in Bengali which will influence the university and the officers to adopt wider use of Bengali. The departmental examinations and the in-service training programmes of Govt. employees may also be conducted in Bengali. With sincerity of purpose, it will not be difficult to use Bengali at all official levels. The language itself will develop and grow in quality with practice. The language must rid itself of the grip of the 'pundits' and must reach for the people. That is the way it can be made simple effective and progressive.

(d) We must take lead and sincerely play our role to the best of our ability. Others will follow us. There is no need to fix a target date for the eventual switch-over to Bengali. The work may start now and instead of going for publicity, necessary executive orders may be issued."[১৮]

ভাষানিরপেক্ষভাবেও নির্দেশটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে এই নির্দেশের বহু অংশ যথেষ্ট আন্তরিক বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এর মধ্যে একাধিক অসত্য ভাষণ এবং স্ববিরোধিতা রয়েছে, মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে তা বোঝা যায়।

বলা হচ্ছে এখন থেকে কেবিনেট ও মন্ত্রণালয়ের কাজ বাংলায় হবে, অথচ সিদ্ধান্তটিই লেখা হলো ইংরেজিতে। পাঠ্যপুস্তক বাংলায় লেখার জন্য কমিটি করা হবে, এমন বক্তব্য রাখার অর্থ হলো, বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই। অথচ বাস্তবে পাকিস্তান শাসনামল থেকেই মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠন হতো।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হলো এখন থেকেই বাংলা ভাষায় কাজ করতে হবে। আবার শেষ অনুচ্ছেদে বলা হলো, বাংলায় কাজ শুরু করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। একই আদেশের মধ্যে এমন বিরোধিতা হাস্যকর। সবচেয়ে হাস্যকর এমন উক্তি, যেখানে বলা হয়, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাবো, কেননা, অন্যরা আমাদের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী ইংরেজিতে লিখছি, অন্যরাও এটা অনুসরণ করুক!

---

[১৮] উদ্ধৃত, মাহবুব তালুকদার, *সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার: সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, পৃ. ১৩–১৪।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তৃতীয় এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে স্থিত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা দুর্বোধ্য, বাস্তবতার সঙ্গে যার মিল নেই। আবার চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলা ভাষাকে পণ্ডিতদের কব্জা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এ ধরনের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার দুর্বলতা তুলে ধরা, যা অনায়াসে বোধগম্য।

অবশ্য এই ধরনের নির্দেশেও শাপে বর হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নড়ে-চড়ে বসে। ইংরেজি ভাষায় লেখা নির্দেশ বলে কথা! এই নির্দেশের আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের অধীনস্থ দপ্তরসমূহে যেসব নির্দেশ পাঠায়, তা বাংলা ভাষাতে পাঠায়। যেমন ১৯৭৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব (প্রশাসন) স্বাক্ষরিত 'অফিস আদালতের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রসংগে' শিরোনামে বহু ধারাবিশিষ্ট একটি নির্দেশ প্রচার করা হয়।[১৯] এই নির্দেশপত্রে জানানো হয়, বিদেশে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ নিতে পারবেন। এমনকি এই নির্দেশপত্রে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে ইংরেজি ভাষার উপর স্থান দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

নির্দেশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এর ভাষারীতির কারণে। পূর্ববর্তী সরকারি নির্দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর একদিকে যেমন ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বাড়ে, অন্যদিকে যেসব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু থাকে, সেসব স্থলে সাধুরীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এমন অবস্থায় চলিত ভাষায় রচিত এই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন অবিলম্বে এর প্রতিকার করা উচিত। তার ফলে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে এ নিয়ে সচিব কমিটির একটি সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, চলিত রীতি নয়, সরকারি কাজকর্মের ভাষা হবে সাধু রীতির। এছাড়া ঐ সভায় প্রয়োজনীয় পরিভাষা পুস্তক এবং বাংলা অভিধান প্রণয়নের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের অনেকে এই সিদ্ধান্ত পালন করতে এগিয়ে আসেননি। যেমন ঐ বছরের ৪ঠা মে তারিখ মন্ত্রী-পরিষদ সচিব মোহাম্মদ কেরামত আলী স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশ প্রচারিত হয়। বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে লিখিত এই নির্দেশে জানানো হয় যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট যেসব নথি যাবে, সেগুলোর সারাংশ বাংলায় লিখতে হবে। তবে যেসব সারাংশ এক পৃষ্ঠার বেশি হবে, সেগুলো ইংরেজিতে লেখা যাবে।[২০] এটি অবশ্য হাস্যকর যে, এক পৃষ্ঠার কম হলে রাষ্ট্রপতি বুঝতে পারবেন, আর এক পৃষ্ঠার বেশি হলে তা ইংরেজিতে না লিখলে বুঝতে পারবেন না। বিষয় যাই হোক, এই নির্দেশের চলিত বাংলা সচিব কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। সম্ভবত এই কারণে ঐ বছর নভেম্বর মাসে সচিব কমিটিকে পুনায় সভা আহ্বান করতে হয়। অতঃপর আহূত সভায় ভাষার সাধুরীতি ব্যবহারের পক্ষে সকলে মত দেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে চলিত রীতির পরিবর্তে ভাষার সাধু রীতিতে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[২১]

সহজেই অনুমেয় যে, বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতি নিয়ে এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কাজ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সচিব কমিটি সাধুরীতির পক্ষে একমত পোষণ করলেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে উভয় রীতি নানা ধরনের জটিল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। যেমন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সহ অন্য কয়েকটি মন্ত্রণালয় সাধু ভাষায়

---

[১৯] হুমায়ুন আজাদ, *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র*, পৃ. ৪৫।

[২০] মাহবুব তালুকদার, *সর্বস্তরে বাংলাভাষার ব্যবহার: সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, পৃ. ১৪।

[২১] তদেব।

কাজকর্ম করতে শুরু করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৭৬ সাল থেকেই পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হিসেবে ঘোষিতভাবে চলিত রীতির ব্যবহার অব্যাহত রাখে।[২২] এর ফলে একজন শিক্ষার্থী বহু বছর ধরে যে ভাষারীতিটি আয়ত্ত করে, চাকরির বাজারে সেই যোগ্যতার কোনো মূল্য থাকে না, অথবা চাকরি পাওয়ার পর তাকে নতুন করে ভাষার সাধুরীতি আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়। ভাষার সাধুরীতি এবং চলিতরীতির এই বিরোধের অবসান একুশ শতকের প্রথম দশকেও ঘটেনি। অর্থাৎ সরকারি কাজকর্মে খুব সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধু রীতিই প্রাধান্য বজায় রেখেছে। অন্যদিকে ভাষার প্রমিত রূপ হিসেবে গণমাধ্যম, শিক্ষা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে চলিত রীতি হয়ে ওঠে সর্বজনগ্রাহ্য।

পূর্বোক্ত সচিব কমিটির দ্বিতীয় সভায় (১৯ মে ১৯৭৯) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, বাংলা ভাষা ব্যবহারের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার অধীনে সার্বক্ষণিকভাবে একটি 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ' প্রতিষ্ঠা করা হবে। অবশেষে ১৯৮১ সালের ৮ই আগস্ট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৮১ সালের ২৪শে এপ্রিল তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে মন্ত্রীপরিষদের একটি বৈঠকে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার বিষয়টি আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়: বাংলা পরিভাষা পুস্তক প্রণয়ন করা হবে, মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁট মুদ্রাক্ষরিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাংলা মুদ্রাক্ষরিক যন্ত্র সংগ্রহ করা হবে, কোর্টে এবং সামরিক বাহিনীর কার্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রচলন সহজ করার জন্য আইন-কানুন, বিধি, নির্দেশমালা, প্রশিক্ষণগ্রন্থ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগে অনুবাদের ব্যবস্থা করবে; এবং বাংলা ভাষায় লেখা না-হলে কোনো নথি মন্ত্রী ও সচিবগণ গ্রহণ করবেন না।

বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর এই প্রক্রিয়া বিশেষ জোরদার হয়। অভিন্ন লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৮৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি 'সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচী' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। পুস্তিকার নির্দেশগুলো দেখে মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বাংলা ভাষা প্রচলন বিষয়ক নির্দেশাবলি এখানে সংকলন করা হয়েছিলো। "সাধারণ নির্দেশমালা' নামে সেখানে যে ১৯টি সাধারণ নির্দেশ মুদ্রিত হয়, তা নিম্নরূপ:

১। এখন হইতে মন্ত্রী/সচিবের নিকট প্রেরিত নথিতে বাংলায় নোট লিখিতে হইবে। ইংরেজীতে লেখা হইলে তাহা বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে না। আইন, অধ্যাদেশ, বিধি প্রভৃতি বাংলায় অনূদিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ সবের উল্লেখ/উদ্ধৃতি ইংরেজীতে দেওয়া যাইবে।

২। নথিপত্রে বাংলা ব্যবহার না করা শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বাংলাভাষা ব্যবহারে আগ্রহ ও দক্ষতার বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। সাঁটলিপিকার/মুদ্রাক্ষরিকদের মধ্যে যাহারা এখনো বাংলায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদিগকে অবিলম্বে ষ্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পরে কৃতকার্যতার সনদ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বার্ষিক বেতন

---

[২২] মনসুর মুসা, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৯।

বৃদ্ধি বন্ধ থাকিবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রশিক্ষণ দানের জন্য কর্মচারীর নামের তালিকা বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষে পাঠাইবেন। পর্যায়ক্রমে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে।

৪। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিশেষ নির্দেশমালায় উল্লেখিত সংখ্যক ইংরেজী মুদ্রাক্ষর যন্ত্র রাখিয়া অতিরিক্তগুলির বদলে বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্র সংগ্রহ করিবেন। এই বদলের কাজ ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্র সংগ্রহ করিবেন। ইংরেজী ও বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের অনুপাত সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হইল। নূতন বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্র ক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে যথাসময়ে পেশ করিয়া বাজেটে বরাদ্দের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিশেষ নির্দেশমালায় উল্লেখিত সংখ্যক ইংরেজী মুদ্রাক্ষর যন্ত্র সমন্বয়ে একটি টাইপপুল গঠন করিয়া সেখানেই যাবতীয় ইংরেজী কাজ সম্পন্ন করিবেন।

৬। প্রাপক বিদেশী সংস্থা বা ব্যক্তি হইলে চিঠিপত্র ইংরেজীতে লিখিতে হইবে। আন্তঃবিভাগীয় চিঠি বাংলায় লিখিতে হইবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস ও কর্মকর্তাদের সংগে বাংলায় যোগাযোগ করিতে হইবে। ইংরেজীতে মুদ্রিত ফরমের ছক বাংলায় পূরণ করিতে হইবে।

৭। পরিভাষা প্রণয়নের জন্য বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন।

৮। যে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ কারিগরি/বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করেন, তাহারা ঐসব বিষয় বাংলায় অনুবাদের জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ অনুবাদক নিয়োগ করিবেন। অনুবাদক নিয়োগের সময় যথাসম্ভব নূতন লোক না লইয়া উক্ত বিষয়সমূহে পারদর্শী অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা অধিকতর সুফলদায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া চুক্তির ভিত্তিতে অনুবাদক নিয়োগ করিতে হইবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত আইন, ম্যানুয়েল, অধ্যাদেশ সমূহ অনুবাদের জন্য বিভাগে কর্মরত দক্ষ কোন কর্মকর্তাকে সম্মানী ভাতার বিনিময়ে নিয়োগ করিবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে অধিক হারে ভাতা প্রদান আবশ্যক হইলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া প্রচলিত নিয়ম শিথিল করা যাইতে পারে।

৯। বিদেশের সাথে কোন চুক্তি যে ভাষাতেই সম্পাদিত হউক না কেন তাহার সংগে একটি বাংলা অনুলিপি থাকিবে।

১০। এখন হইতে যথাসাধ্য নূতন আইন, অধ্যাদেশ, বিধি প্রভৃতি বাংলায় প্রণীত হইবে।

১১। উচ্চতর আইনের গ্রন্থসমূহ অনুবাদের জন্য আইন মন্ত্রণালয় একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অনুবাদ বোর্ড গঠন করিবেন। আইন বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি বা কমপক্ষে অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত হইবে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোর্ড অনুবাদ সংক্রান্ত কাজ সমাপ্ত করিবেন। এই কাজ সম্পাদনের পর সকল নূতন আইন ইত্যাদি কেবলমাত্র বাংলাভাষায় প্রণীত হইবে।

১২। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত ও অর্থানুকূল্য প্রাপ্ত সকল প্রকার কমিটি বা কমিশনের রিপোর্ট (যাহা বিদেশে বা বিদেশীর মধ্যে প্রচারের জন্য নহে) বাংলায় প্রণীত হইবে।

১৩। বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের পি, পি, (প্রকল্প ছক) ইংরেজী ভাষাতেই রচিত হইবে।

১৪। এই নির্দেশমালায় ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য বিশেষ নির্দেশমালায় উল্লেখিত যেই সব বিষয় ইংরেজীতে সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে, উহা ভিন্ন অন্য কিছু বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়ে ইংরেজীতে মুদ্রিত হইবে না। তবে বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া অত্যাবশ্যকীয় কিছু ইংরেজীতে ছাপানো যাইবে।

১৫। টি এন্ড টি বোর্ড টেলিগ্রাম, ট্যালেক্স ইত্যাদির "কোড" দুই বৎসরের মধ্যে বাংলায় রূপান্তরের কাজ সম্পাদন করিবেন।

১৬। এই সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব প্রয়োজনে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ নির্দেশমালা জারী করা হইল; ইহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কিছু কাজ নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ইংরেজীতে সম্পাদনের বিধান রহিয়াছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে এই সব কাজও বাংলায় করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বাংলা ভাষা প্রচলনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অবশ্য তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

১৭। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিও উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করিবেন।

১৮। এখন হইতে বাংলাদেশের সকল অফিসের সাইন বোর্ড ও কর্মকর্তাদের নামফলক বাংলায় লিখিতে হইবে এবং নথিপত্র বাংলায় লেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরও বাংলায় করিতে হইবে।

১৯। বিশেষ নির্দেশমালায় যে সব কাজে আপাততঃ ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের অনুমতি রহিয়াছে, উহা ব্যতীত বাকী সব কাজ বাংলায় সম্পাদন করিতে হইবে।[২৩]

১৯৮৭ সালে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই নির্দেশমালাই সরকারি নির্দেশ হিসেবে কার্যকর ছিলো। এমনকি এই নির্দেশমালা যাতে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হতে পারে, সেজন্য বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ একই সময়ে ২৩ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করে এবং তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করে।[২৪] উল্লিখিত ১৮ নং নির্দেশ যাতে যথাযথভাবে পালিত হতে পারে, সেজন্য ১৯৮৬ সালের ২১শে নভেম্বর সচিব কমিটির অনুমোদনের পর বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ একটি পুস্তিকার আকারে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থার বাংলা নাম প্রকাশ করে।[২৫] সরকারি ও স্বশাসিত সংস্থাগুলোর এইসব নাম এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিশেষ আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয়। তাঁর শাসনামলে (১৯৮২–৯০) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বহু সরকারি প্রতিবেদন ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে।[২৬] সরকারি মুখপত্র 'বাংলাদেশ গেজেট'-এর দিকে তাকালেও তা বোঝা যায়। তাছাড়া সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ'-এর কর্মতৎপরতাও এ সময়ে বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

---

[২৩] বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেল, *সরকারি কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচী—প্রথম পর্যায়* (ঢাকা: সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪), পৃ. ৩–৪।

[২৪] বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ-এর সংশ্লিষ্ট নথি।

[২৫] তদেব।

[২৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: ১৯৮৫–৯০* (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৮৬)।

তাঁর শাসনামলে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে এসব উদাহরণ ও তৎপরতাই শুধু নয়, সরাসরি একটি আইনও প্রণীত হয়। ১৯৮৭ সালের ৮ই মার্চ পাস হওয়া সেই আইনটি নিম্নরূপ:

১৯৮৭ সালের ২ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—(১) এই আইন "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে "অনুচ্ছেদ" অর্থে সংবিধানের অনুচ্ছেদ বুঝাইবে।

৩। প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

(২) ৩(১) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির অধীনে অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।[২৭]

তবে এই আইন প্রচলিত হওয়ার পর কেউ তা লঙ্ঘন করেছিলেন কিনা, এবং করে থাকলে এজন্য তাঁকে কী শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনার খবর পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় না। তাই মনে করা যেতে পারে যে, এই আইন এমন সময়ে প্রচলিত হয়েছিলো, যখন বাংলাদেশের সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বাংলা ভাষায় দাপ্তরিক কাজ করার ব্যাপারে কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হননি বা সেজন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতেও হয়নি। এমনকি এই আইনের ৪র্থ অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক বিধি প্রণয়নের যে ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে, তারও কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

---

[২৭] *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত, ৮ মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ১২৭৬।

৪. বাস্তবতা: অফিস

সরকারি অফিসসমূহে নানা অজুহাতে যাঁরা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে নথিপত্র লিখতে চাইতেন ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন প্রণীত হওয়ার পর তাঁরা খানিকটা সংযত হন। অতঃপর অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া সরকারি অফিস থেকে ইংরেজি ভাষার নির্বাসন ঘটে। ১৯৯৪ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রশাসনিক পরিভাষা কোষ প্রণীত হওয়ার পর, পরিভাষার দুর্বলতা দেখিয়ে বাংলা ভাষাকে অবহেলা করার পথও বন্ধ হয়ে যায়।[২৮] তবে নব্বইয়ের দশকে কম্পিউটার যন্ত্রের আবির্ভাবের পর সরকারি অফিসসমূহে এই অবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এর পাশাপাশি বেসরকারি অফিসসমূহের চিত্র খানিকটা আলাদা। বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগিয়ে থাকে; আবার এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সত্তরের দশকে বাংলা ভাষায় কাজ শুরু করলেও, আন্তর্জাতিকতার ছুতোয় আশির দশক থেকে বাংলা ভাষা বর্জন করতে শুরু করে, নব্বইয়ের দশকে কম্পিউটারের আগমনের পর, যে সামান্য কাজও তারা বাংলায় করতো, তাও বর্জন করে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি অফিসের কাজে ভাষামাধ্যমের স্পষ্ট বিভাজন খুব সহজে চোখে পড়বে।

৪.১. সরকারি প্রশাসন

সরকারি অফিসসমূহে সত্তরের দশকে বাংলা টাইপ-রাইটারের অভাব বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। তা সত্ত্বেও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহার যে চলে আসছিলো, বাংলাদেশ গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে তা বোঝা যায়।[২৯] আশির দশকে ব্যাপক হারে বাংলা টাইপ রাইটারের আগমন ঘটায় সে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। কিন্তু নব্বই দশকের সূচনায় কম্পিউটার প্রযুক্তি জনপ্রিয় হতে শুরু করায় নতুন জটিলতা দেখা দেয়। এই যন্ত্রে একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজিতে কাজ করার সুবিধা থাকায় অনেকে ইংরেজিতে দাপ্তরিক কাজ করতে উৎসাহিত হন। এর পেছনে বড়ো কারণ এই যন্ত্র বাংলার চেয়ে অধিক ইংরেজি-সহায়ক। বাংলায় টাইপ করা কঠিন, সেজন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই ইংরেজি কম্পোজ করা যায়। এছাড়া সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো ইংরেজিতে কম্পোজ করার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারই শব্দের বানান ও বাক্যের ভুল ধরে দেয়। সর্বোপরি, ই-মেইল ইত্যাদি করার জন্য কম্পিউটারে বাংলা ভাষার কোনো অপশন না থাকায় বিভিন্ন অফিসে ইংরেজির আধিপত্য নতুনভাবে শুরু হয়।

---

[২৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *প্রশাসনিক পরিভাষা* (ঢাকা: বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, ১৯৯৪)। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা প্রশাসনিক পরিভাষা তৈরির কাজ শুরু করেছিলো। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার পর 'প্রশাসনিক পরিভাষা' নামে ছোট একটি পুস্তিকা বাংলা একাডেমী থেকে বের হয়। এর পর বাংলা একাডেমী ১৯৭৫ সালে 'প্রশাসনিক পরিভাষা' নামে বেশ বড়ো আয়তনের (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮৩) একটি পরিভাষাকোষ প্রকাশ করে। ১৯৯৪ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পরিভাষা-গ্রন্থটি বাংলা একাডেমীর ঐ পরিভাষা-গ্রন্থেরই একটি পরিমার্জিত সংস্করণ মাত্র। দ্রষ্টব্য, *প্রশাসনিক পরিভাষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫)।

[২৯] যেমন ১৯৭২ সালের ১৩ই জুলাই স্বাক্ষরিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (মন্ত্রকের) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা বিষয়ক আদেশ। *The Bangladesh Gazette,* 3 August 1972.

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নব্বইয়ের দশকের সূচনায় (১৯৯৩) সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে কম্পিউটার সাক্ষরতার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।[৩০] একুশ শতকের সূচনায় (২০০২) প্রশাসনকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'ন্যাশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) পলিসি, ২০০২' প্রণয়ন করে।[৩১] এই নীতিমালা বস্তুত ই-গভর্ন্যান্স-এরই একটি পদক্ষেপ। লক্ষণীয় যে, সরকারের এই পদক্ষেপ পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষার বিপক্ষে যায়। কারণ ই-গভর্ন্যান্স প্রচলন করার জন্য কম্পিউটারে যে পরিমাণ বাংলা সফ্টওয়ার প্রয়োজন, বাংলাদেশে তা না থাকায়, কম্পিউটার সাক্ষরতার সঙ্গে ব্যবহারিক ইংরেজি শেখাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাকে অবহেলা করার সুযোগ তৈরি হয়। বাংলা ভাষার শত্রুগণ তখন নির্দ্বিধায় সুপারিশ করতে পারে: বাংলা ভাষা যেহেতু কম্পিউটারের উপযুক্ত নয়, অতএব ইংরেজি ভাষাতেই জনগণের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা যাক।[৩২] এভাবে জনগণের কাছে যাওয়ার কথা বলে কার্যত জনগণ থেকে সরকারকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলতে থাকে। ই-গভর্ন্যান্স-এর পরিবর্তিত নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ। বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার-উপযোগী করে তোলা না হলে এই প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের খুব কাজে আসবে, এমন মনে হয় না। যেমন ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার মোবাইল কোম্পানির মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় 'ডি-ওয়ার্মিং' কর্মসূচির একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে। এতে দেশ থেকে কৃমি নাশ করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় বটে কিন্তু বাংলাদেশের শতকরা প্রায় একশো ভাগ মোবাইল গ্রাহকের নিকট সত্যিকার অর্থে এতে কোনো তথ্য পৌঁছায় না।

৪.২. স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন

ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: বাংলা-আগ্রহী এবং ইংরেজি-আগ্রহী। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠান, ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই যে প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষায় কাজ করতে শুরু করে।[৩৩] ১৯৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের একটি সভার কার্যবিবরণী নিম্নরূপে লেখা হয়:

বাংলা একাডেমী
বর্ধমান হাউস, ঢাকা-২

---

[৩০] Shah Mohammad Sanaul Hoque, "E-Governance in Bangladesh: Initiatives and Challenges," PhD Dissertation, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 2009, p. 146.

[৩১] তদেব।

[৩২] হুমায়ুন আজাদ তাঁর অসাধারণ শক্তিশালী ভাষায় বাংলা ভাষার শত্রুদের চিহ্নিত করেছিলেন এভাবে: "আমাদের শক্তিমান প্রতিষ্ঠানগুলো—ব্যাংক, করপোরেশন, বিচারালয়, সচিবালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি—সক্রিয়নিষ্ক্রিয়ভাবে বাঙলা ভাষার সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছে।" *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র*, পৃ. ১৫।

[৩৩] তবে এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলা একাডেমী তার দাপ্তরিক কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করলেও যে অর্ডিন্যান্স দ্বারা বাংলা একাডেমী এখনো পরিচালিত, তা ইংরেজি ভাষাতেই রচিত। এমনকি ১৯৫৭ সালে প্রণীত অর্ডিন্যান্সের ১৯৭২ সালে এবং ১৯৭৮ সালে যে সংস্করণ হয়, তাও ইংরেজি ভাষায়। প্রাসঙ্গিক অর্ডিন্যান্সগুলো দেখার জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলা একাডেমী স্মারকগ্রন্থ: চল্লিশ বর্ষ পূর্তি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩১৬–৫২।

১৩/৬/৬৩ ইং তারিখ তিন ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় জনাব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধেয় জনাব সৈয়দ আলী আহ্সান পরিচালক সাহেবের কামরায় অনুষ্ঠিত বাংলা সালের বিভিন্ন মাসের তারিখ নির্ধারণকল্পে গঠিত উপসংঘের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্যবিবরণী।

সভায় উপস্থিত ছিলেন:—

১। জনাব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—সভাপতি
২। জনাব সৈয়দ আলী আহ্সান—সদস্য
৩। জনাব আবুল কাসেম— "
৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি জ্যোতির্ভূষণ— "
৫। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যজ্যোতিস্তীর্থ— "
৬। শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-স্মৃতিতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী সাহিত্যোপাধ্যায় স্মৃতিপুরাণরত্ন জ্যোতিঃশাস্ত্রী—আহ্বায়ক

বিগত ১০/৬/৬৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী পাঠের পর বিনা সংশোধনে তাহা অনুমোদিত হয়।

সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পেশ করা হয়:—

ক) শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ কর্মকার কাব্যরত্ন সাহিত্যতীর্থ—বাণীপীঠ, পোঃ নাটোর, রাজশাহী (জীবনসদস্য সংখ্যা ৩৩), ইনি বাংলা একাডেমীর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব করেন—"বাংলা সালের বিভিন্ন মাসের তারিখ নির্ধারণ করা হউক্।"—ইহা সভায় আলোচিত হয়।

খ) অধ্যাপক এম, এ হামিদ, এম, এস.সি, প্রেসিডেন্ট, গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা সংঘ, পোঃ চাঁচকৈড়, জেলা রাজশাহী—তাঁহার বঙ্গাব্দ মাসের তারিখ সম্বন্ধে প্রস্তাবও এই সভায় আলোচিত হয়।

গ) গত বৈঠকের প্রস্তাবানুযায়ী শ্রদ্ধেয় জনাব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, শ্রদ্ধেয় জনাব সৈয়দ আলী আহ্সান, জনাব আবুল কাসেম, বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যজ্যোতিস্তীর্থ ও শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-স্মৃতিতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী সাহিত্যোপাধ্যায় স্মৃতিপুরাণরত্ন জ্যোতিঃশাস্ত্রী—ইহাদের সহিত বৈঠকে দীর্ঘ সময় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করা হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে ভারতে নবপ্রবর্ত্তিত তারিখের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হয় এবং উপস্থিত মনীষীবৃন্দের সুচিন্তিত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১। বর্ত্তমানে বাংলা মাসের তারিখ নির্ধারণ ও গণনা অত্যন্ত দুষ্কর বিধায় আগামী ১৩৭১ সালের বৈশাখ হইতে প্রতি বৎসর ভাদ্র পর্য্যন্ত ৩১ দিন এবং আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতি মাস ৩০ দিন গণনা করা হউক।

২। যেহেতু ১৩৬৯ সনে অতিবর্ষ (লিপ্ ইয়ার) গণনা করা হইয়াছে এজন্য ঐ বর্ষ হইতে প্রতি চতুর্থ বৎসরে একদিন বৃদ্ধি পাইয়া চৈত্র মাস ৩১ দিন গণনা করা হউক্।[৩৪]

---

[৩৪] প্রাসঙ্গিক নথি, সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বা বার্ডকে যদি এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে, বাংলা একাডেমী এ ব্যাপারে কতোটা অগ্রসর ছিলো। ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানও গণমুখী একটি প্রতিষ্ঠান, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খান নিজে বাংলা জানতেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, তাদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাড়া প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালি। তা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমীর মতো এখানে বাংলায় কাজ হতো না। যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ হতো ইংরেজিতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে কিছু কালের জন্য বাংলা ভাষায় কাজকর্ম হয় ঠিকই, কিন্তু বার্ডে সত্যিকারভাবে বাংলায় কাজ হতে শুরু করে ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন পাস হওয়ার পরে। অবশ্য ১৯৮৬ সাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠান সীমিত আকারে বাংলা ভাষায় কাজকর্ম করতে শুরু করেছিলো। উদাহরণ হিসেবে ঐ বছর ২১শে মে অনুষ্ঠিত বার্ডের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কার্যবিবরণীতে সর্বপ্রথম সামান্য কিছু অংশ বাংলা ভাষায় লেখা হয় এবং ১৯৮৭ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বাংলায় কার্যবিবরণী লেখা হতে থাকে।[৩৫]

৪.৩. বেসরকারি প্রশাসন

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি প্রচলিত প্রতিশব্দ এনজিও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ব্র্যাক নামের একটি এনজিও বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে।[৩৬] বর্তমানে এই জাতীয় এনজিও অসংখ্য। এরা বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক নানা ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত। এইসব এনজিও প্রধানত গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। তার ফলে তাদের মাঠ পর্যায়ের কাজকর্মে বাংলা ভাষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এইসব এনজিওর দাপ্তরিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা এক রকম অনুপস্থিত। এইসব প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নিয়োগপত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম ইংরেজিতেই হয়। অনেক সময়ে এইসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি দাতা সংস্থা থেকে, জাতিসংঘের সংস্থা থেকে সরাসরি আবার কখনো বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে অর্থ পায়—যেভাবেই পাক, এইসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে, তাদের দাতা যেহেতু ইংরেজিভাষী, তাই ইংরেজিতে কাজকর্ম করলে দাতাদের নিকট নিজেদের স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে পারবে। সম্ভবত এই মনস্তত্ত্ব থেকে ইংরেজি ভাষার প্রতি এনজিওদের এমন দুর্বলতা।

৫. বাস্তবতা: আদালত

বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতার সঙ্গে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। বাদী-বিবাদী-আইনজীবী-বিচারক সকলেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন ভাষার মাধ্যমে। তাই আদালতের ভাষা এমন হওয়া উচিত, যা উক্ত চার পক্ষের সকলের নিকট সমান বোধগম্য। কেননা এই চার পক্ষের কোনো একটি পক্ষ যদি ভাষাগত কারণে বুঝতে ভুল করে, তাহলে বিচার-প্রক্রিয়ায় ভুল হতে পারে। তার ফলে বিচার-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হতে পারে, দেশের দুর্নীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক।

---

[৩৫] ১১ই এপ্রিল ২০১০ তারিখ গবেষকের পক্ষে কুমিল্লায় অবস্থিত বার্ডের অফিস থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন ড. জি. এম. মনিরুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

[৩৬] গোলাম মোর্তোজা, *ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৫৭।

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় একশত ভাগ মানুষ বাংলাভাষী। অতএব এই দেশের বিচার ব্যবস্থার ভাষা বাংলা না হওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। বাংলাদেশের আদালত উপর-নীচ দিক দিয়ে স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত: উচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট; অন্যদিকে নিম্ন আদালত তথা জেলা বা অধস্তন আদালতসমূহ। বিচারের জন্য গ্রহণ-করা মামলাগুলোর প্রকৃতি অনুসারে নিম্ন আদালতসমূহকে আবার দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালত হিসেবে বিভক্ত করা হয়।

আদালতের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। আদালতের ভাষা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক আইন বলতে যেসব বিধান প্রচলিত, তার সবগুলোই বাংলা ভাষার পক্ষে। আদালতের বিচার-কাজ সম্পন্ন হয় যেসব আইনের উপর ভিত্তি করে, তার মধ্যে প্রধান দুটি আইন হলো ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি।

১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও, বেশ কয়েকটি ধারায় সাক্ষী ও আসামির বোধগম্যতার প্রশ্নে অনুবাদ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্বীকার করা হয়। প্রসঙ্গত ৩৬০ (৩), ৩৬১ (১), ৩৭১, ৩৭২ প্রভৃতি ধারার বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।[৩৭]

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারায় অধস্তন আদালতের ভাষা সম্পর্কিত বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত সরকার অন্য কোনো নির্দেশ প্রদান না করেন সে পর্যন্ত হাইকোর্টের অধীনস্থ যে আদালতে আদালতের ভাষা হিসেবে যে ভাষা প্রচলিত আছে সে আদালতে সে ভাষাই প্রচলিত থাকবে।[৩৮]

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন প্রণীত হওয়ার পর পূর্বোক্ত কার্যবিধিতে যে যুক্তিতে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য ছিলো, অভিন্ন যুক্তিতে বাংলা ভাষার প্রাধান্য তৈরি হয়ে যায়। কেননা সর্বশেষ আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

"৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

"(২) ৩(১) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।"

এই আইন প্রচলনের পরে পূর্বের যেসব আইনে আদালতের ভাষামাধ্যম হিসেবে ইংরেজির স্বীকৃতি ছিলো, সেগুলো নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সালে প্রণীত হাইকোর্ট বিধিমালায় তাই যদি উল্লেখও থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হবে, তারও কোনো বৈধতা থাকে না।

---

[৩৭] নাহিদ ফেরদৌসী, "আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন: বিশ শতকের অগ্রগতি," *বিশ শতকের বাংলা*, মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১০), পৃ. ২৪৭।

[৩৮] তদেব, পৃ. ২৪৬।

১৯৮৯ সালের শেষ দিকে বিষয়টি নিয়ে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের কমবেশি মতানৈক্য ও বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ স্পষ্ট হয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অফিসমূহের ৮৬টি বিধি/প্রবিধি/অধ্যাদেশ/ম্যানুয়েলের বঙ্গানুবাদ পরীক্ষা করার (ভেটিং-এর) জন্য বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর। প্রতিক্রিয়ায় আইন মন্ত্রণালয় জানায় যে, ইংরেজি বিধি/প্রবিধিগুলো বাতিল করার পর নতুনভাবে তা বাংলায় জারি করা না হলে আইন-আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না, তাই এসব অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া যাবতীয় আইন বাংলা করাও সহজ কাজ নয়। আইন মন্ত্রণালয়ের এই মতামতের ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর সচিব কমিটি আদালতের ভাষা বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

"(ক) যে সকল আইন হালনাগাদকরণ কিংবা পুনর্বিন্যাসপূর্বক পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজন হইবে, সেইগুলি অবশ্যই বাংলায় রূপান্তর করিয়া নূতন আইনের ন্যায় যথানিয়মে জারী করিতে হইবে।

"(খ) যে সকল আইন হালনাগাদকরণ বা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন নাই সেইগুলি অনুবাদ করা হইলে বঙ্গানুবাদটি আপাততঃ মূল আইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের দলিল (সেকেন্ডারী ডকুমেন্ট) হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নিজ দায়িত্বেই মুদ্রিত হইবে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রকার আইনও অনুবাদ করিয়া নূতন আইনের ন্যায় যথা নিয়মে বাংলায় জারী করা যাইবে।"

উচ্চ আদালতসমূহে ইংরেজিতে সওয়াল-জবাব ও রায় প্রদানের বিষয়টি এই সিদ্ধান্তের অনুকূল।

অন্যদিকে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' প্রণয়নের পর বাংলাদেশের নিম্ন আদালতের প্রায় সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন চালু হয়। নিম্ন আদালতসমূহে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলো প্রচলিত কার্যবিধি ও আইনের অনুবাদের অভাব। ধীরে ধীরে প্রাসঙ্গিক কার্যবিধি ও আইনের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় সংশ্লিষ্ট বিচারকগণের আন্তরিকতা। এভাবে নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড়ো অর্জন সাধিত হয়।

উচ্চ আদালত বলতে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগকে বোঝানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে হাইকোর্টের অনেকগুলো রায় ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলা ভাষায় দেওয়া শুরু করে। এই মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে যে কয়জন বিচারপতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক, বিচারপতি এ কে বদরুল হক, বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস, বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, বিচারপতি এফ এম জিয়াউল করিম, বিচারপতি সৈয়দ জিয়াউল করিম, বিচারপতি আব্দুল আউয়াল, বিচারপতি মোঃ আবু তারিখ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৯] এঁদের মধ্যে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বাংলা ভাষায় রায় দানের ক্ষেত্রে

[৩৯] ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় রায় হয়েছে এমন কয়েকটি রায়ের তালিকা প্রণয়ন করেছেন নাহিদ ফেরদৌসী। তদেব, পৃ. ২৪৯–৫০।

তিনি সকলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। ২০১০ সালের স্বাধীনতা ঘোষণা বিষয়ক রায়ের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।[৪০]

বিচারপতিদের এই সদিচ্ছা অব্যাহত থাকলে এবং তা অন্যদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সুপ্রিম কোর্টের এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ও বাংলা ভাষায় প্রণীত হবে।

৬. বাস্তবতা: শিক্ষা

১৮৯২ সালে রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আলোচনাসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, প্রবন্ধটির নাম "শিক্ষার হেরফের"। প্রবন্ধটিতে তিনি প্রচলিত শিক্ষার সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে, তা মাতৃভাষায় না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তরে গভীরভাবে দাগ কাটে না। প্রবন্ধটিতে তিনি সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত নীতিকেও সমালোচনা করেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ সমালোচিত হন। সেই সমালোচনার জবাবে তাঁকে "শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি" নামে আরো একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য আরো স্পষ্টতা লাভ করে। তিনি বলেন, "কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়।"[৪১] শতাধিক বছর পরেও রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য সমান প্রাসঙ্গিক। তবে রবীন্দ্রনাথের সময়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান ছিলো একেবারেই গৌণ। শতাধিক বছরে সে অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্পন্ন হয়েছে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাও অনেকাংশে মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এখন আর গুরুত্বহীন নয়। এমনকি পিএইচডি পর্যায়ের অভিসন্দর্ভ পর্যন্ত এখন বাংলা ভাষায় রচিত হয়।

কিন্তু জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা এটুকুতে সীমিত থাকতে চায় না। পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলোর সমান্তরালে বাংলা ভাষা উঠে আসুক, সব ধরনের অ্যাকাডেমিক কাজ যেমন, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও চর্চা বাংলা ভাষা মাধ্যমে সম্পন্ন হোক তথা শিক্ষার সর্বত্র বাংলা ভাষা চালু হোক, এমন প্রত্যাশা বাংলাদেশের মানুষ মনের মধ্যে লালন করে।

---

[৪০] "বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা-এর মামলা," *বাংলাদেশ ল' টাইম্‌স*, বিশেষ সংখ্যা ২০১০, পৃ. ৪–১৬৪। বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

[৪১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি," *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: জয় বুক্‌স ইন্টারন্যাশনাল, ২০০০), পৃ. ৭১১।

৬.১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ ধারায় সবার জন্য সমান শিক্ষার (গণমুখী ও সর্বজনীন) কথা বলা হয়েছে।[৪২] এই ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পিত। সরকারিভাবে এই তিন স্তরের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষা মাধ্যমে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এই তিন স্তরের মধ্যে প্রথম দুই স্তরের শিক্ষা মাতৃভাষায় চালু হয়েছে বহু পূর্ব থেকেই। এ ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান স্মরণীয়। ১৯৩২ সালে হাসান সুরাবর্দী যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষায় প্রদান করার নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অনুমোদন করে এবং ১৯৩৫ সালের মধ্যে তা বঙ্গদেশের সর্বত্র কার্যকর হয়।[৪৩] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ সময়ে বঙ্গদেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত ছিলো। পাকিস্তান শাসনামলের ২৩ বছর অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশ শাসনামলে মাতৃভাষায় শিক্ষার স্তর উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত নির্বিঘ্ন হয়।

তবে এ কথা স্বীকার করা কর্তব্য যে, শিক্ষার এই মূল ধারার পাশাপাশি আরো একাধিক ধারার শিক্ষা ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই চালু আছে। বিশেষভাবে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূল ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি সবসময়ে অব্যাহত থেকেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলোর নাম কিন্ডারগার্টেন, এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর যথাক্রমে ও লেভেল-এ লেভেল।

একুশ শতকের সূচনায় বিত্তবান শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় তারা তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। শিক্ষা খানিকটা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হওয়ার কারণেও এই প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে খানিকটা গৌণ করে তুলছে বলে মনে হতে পারে। সেটি হলো বড়ো বড়ো শহরগুলোতে মূল ধারার শিক্ষাক্রমকে ইংরেজি ভাষায় পড়ানোর উদ্যোগ। এটি বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ ধারার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই উদ্যোগের ফলে সবার জন্য সমান শিক্ষার বদলে বিশেষ একটি শ্রেণীর জন্য আলাদা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে, এমন মনে করা যায়।

একইভাবে এসএসসি ও এইএইচচি পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের ভাষা-মাধ্যমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সার্টিফিকেট, মার্কশিট প্রভৃতি প্রধানত বাংলা ভাষায় প্রদান করা হতো। তবে প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষায় প্রদান করার বিধানও ছিলো। একুশ শতকে এসে সেখানে একটি অভাবনীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে। এখন বোর্ডগুলো শুধু ইংরেজি ভাষায় সার্টিফিকেট ও মার্কশিট দিতে শুরু করেছে।

৬.২. মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

১৯৪৭ সালের পূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক, এবং বিএ পাস কোর্সের পরীক্ষা বাংলা মাধ্যমে হওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ঢাকা

---

[৪২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৭।

[৪৩] বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, "শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা," *বাংলাভাষা মাতৃভাষা*, নীতীশ বিশ্বাস সম্পা. (কলকাতা: ঐকতান, ২০০৫), পৃ. ৩৭।

বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চমাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও শিক্ষার ভাষামাধ্যমে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭-পূর্ব নীতি অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এই অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের কলেজগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণিতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠন শুরু হয়। বিশেষভাবে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা মাধ্যমকে সরকারিভাবেও স্বীকার করা হয়।[৪৪] প্রায় সমকালে (১৯৭২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও নীতিগতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স, এমএ, এমএসসি, এমকম প্রভৃতি পরীক্ষায় বাংলা মাধ্যমকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেয়।[৪৫] এর ফলে বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হতে থাকে। যদিও এ ব্যাপারে বাংলাদেশের থেকে কলকাতার প্রকাশক ও লেখকগণ খানিকটা এগিয়ে থাকেন। কলকাতায় প্রকাশিত হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রচুর পাঠ্যপুস্তকের বড়ো বাজার তৈরি হয় বাংলাদেশ।

বাংলা একাডেমী ঢাকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমী একে একে অনেকগুলো পরিভাষাকোষ প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলা একাডেমীতে পাঠ্যপুস্তক নামে আলাদা একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠযোগ্য কয়েক হাজার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার বিস্তারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আশির দশকে ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমীর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এগিয়ে আসে। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রচুর সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে নব্বইয়ের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বাংলা ভাষায় প্রচুর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়।

একুশ শতকের সূচনায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ভাষামাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের পাঠ্যক্রমের দিকে তাকানো যেতে পারে। বিজ্ঞান অনুষদের অধীনস্থ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত বাংলা ভাষায় রচিত প্রচুর পাঠ্যপুস্তক বাংলা একাডেমী সহ বিভিন্ন প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত আছে। এমনকি বাংলা ভাষায় পাঁচ খণ্ডের একটি বিজ্ঞান বিশ্বকোষও বাংলা একাডেমীর রয়েছে। কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিজ্ঞান অনুষদের কোনো বিভাগের সিলেবাসেই এসব বইয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় না। সবচেয়ে কঠোর অবস্থানে থাকে রসায়ন বিভাগ। অথচ এই বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বই বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশিত এই বইগুলো যদি ছাত্রপাঠ্য বিবেচিত

---

[৪৪] *Rajshahi University Calendar,* vol. I (Rajshahi: Rajshahi University, 1991), p. 97.

[৪৫] বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, "শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা," পৃ. ৩৭।

না হয়, তাহলে বাংলা একাডেমী কেন এর পেছনে এতো অর্থ ব্যয় করলো—এমন প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা যায়, সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও যতোদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার বিধান ছিলো, ততোদিন পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ছাত্ররা পড়তো। কিন্তু ২০০৭ সালে এই বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটি একমাত্র ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার বিধান জারি করার পর বাংলা বইগুলো অ-পাঠ্য বইয়ে পরিণত হয়েছে।[৪৬]

আশির দশকে বা নব্বইয়ের দশকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলা ভাষাকে যতোটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতো, নতুন শতাব্দীতে এসে সে শ্রদ্ধাবোধও অবসিতপ্রায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর প্রায় অর্ধশত বিভাগে ছাত্র ভর্তির জন্য বিভাগওয়ারি পরীক্ষা গ্রহণ করে। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রশ্ন করা হয়। কোনো কোনো বিভাগের প্রশ্নপত্র শতভাগ বাংলা ভাষায় করা হয়। কিন্তু সেই বাংলা ভাষা ব্যবহার করার সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ ভাষার প্রমিত বানানের দিকে বা শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার দিকে কঠোরভাবে নজর রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। তার ফলে প্রশ্নপত্রগুলোতে প্রচুর ভুল, বিশেষভাবে বানানের ভুল থেকে যায়। উদাহরণ হিসেবে ২০০৮–০৯ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ও অ-বিজ্ঞান দুটি বিভাগের প্রশ্নপত্রের দিকে তাকানো যেতে পারে।

বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগে শতকরা একশত ভাগ বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করা হয়। সঙ্গত কারণে সেখানে ভুলের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু কতোটা বেশি হলে তা সমর্থনযোগ্য? অথবা কতোটা বেশি না হলে মনে করা যাবে যে, বাংলা ভাষার প্রতি যথেষ্ট অবহেলা করা হয়নি! বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। কেননা দেখা যায়, ২০০৮–০৯ শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগের ১০০টি প্রশ্নে মোট ৫০টি শব্দের বানানে ভুল করা হয়েছে। শব্দের পৌনঃপুনিকতা থাকায় বাস্তবে এই ভুলের সংখ্যা আরো বেশি (৫৮টি)। এছাড়া যতিচিহ্নের ভুল, মুদ্রণ-প্রমাদ জনিত ভুল তো রয়েছেই। যেমন ড্যাশের জায়গায় হাইফেন দেওয়া হয়েছে, বিন্দুর জায়গায় কোলন দেওয়া হয়েছে, কোলনের জায়গায় বিসর্গ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। মুদ্রণ-প্রমাদ জনিত ভুলের মধ্যে বেশি রয়েছে স্পেস জনিত ভুল, ে-কার ৈ-কার জনিত ভুল ইত্যাদি। নিম্নের সারণিতে আসল ভুলগুলোর দিকে তাকানো যাক:

সারণি ১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় (২০০৮–০৯) বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগের প্রশ্নে বানান-ভুল

প্রশ্নপত্রের বানান	শুদ্ধ বানান	প্রশ্নপত্রের বানান	শুদ্ধ বানান
১. ঘন্টা	ঘণ্টা	২. অ্যারিস্টোটল	অ্যারিস্টটল
৩. মৃত্যু বরন করা	মৃত্যুবরণ করা	৪. আবিস্কার	আবিষ্কার
৫. অগাষ্ট	আগস্ট	৬. শুক্রানু	শুক্রাণু
৭. যকৃত	যকৃৎ	৮. তৈরী	তৈরি

[৪৬] সাক্ষাৎকার: ড. সুভাষ চন্দ্র পাল, প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০১০।

৯. কারনে	কারণে	১০. আঁইশ	আঁশ
১১. পেশী	পেশি	১২. ধরিত্রি	ধরিত্রী
১৩. অনুষ্টিত	অনুষ্ঠিত	১৪. প্রজাতী	প্রজাতি
১৫. ঔষুধ	ঔষধ	১৬. নি:সৃত	নিঃসৃত
১৭. অন্ত:ত্বক	অন্তস্ত্বক	১৮. বহি:ত্বক	বহিস্ত্বক
১৯. খন্ডক	খণ্ডক	২০. প্রকারভেদ নাই	প্রকারভেদ নেই
২১. পরিমান	পরিমাণ	২২. কোন সময়ই	কোন সময়ে
২৩. থাকেনা	থাকে না	২৪. আয়ূ	আয়ু
২৫. এক অনু	এক অণু	২৬. মুত্র	মূত্র
২৭. ব্রঙকাইটিস	ব্রঙ্কাইটিস	২৮. সুষুম্নাকান্ড	সুষুম্না কাণ্ড
২৯. কেন্দ্রিয়	কেন্দ্রীয়	৩০. পরিপক্ক	পরিপক্ব
৩১. পরিস্ফূটন	পরিস্ফুটন	৩২. বহিঃভ্রূণীয়	বহির্ভ্রূণীয়
৩৩. রজঃচক্র	রজশ্চক্র	৩৪. স্থায়ীত্ব	স্থায়িত্ব
৩৫. ভৌগলিক	ভৌগোলিক	৩৬. প্রাইমারী	প্রাইমারি
৩৭. সেকেন্ডারী	সেকেন্ডারি	৩৮. টারসিয়ারী	টারসিয়ারি
৩৯. গ্রীণহাউস	গ্রিনহাউস	৪০. বনভুমি	বনভূমি
৪১. নিঃসরন	নিঃসরণ	৪২. মূখ্য	মুখ্য
৪৩. ফুলে উঠে	ফুলে ওঠে	৪৪. সংক্রমন	সংক্রমণ
৪৫. যন্ত্রনাদায়ক	যন্ত্রণাদায়ক	৪৬. অনুজীব	অণুজীব
৪৭. পুন:আবিস্কার	পুনরাবিষ্কার	৪৮. নালী	নালি
৪৯. পিটুইটারী	পিটুইটারি	৫০. পশ্চাৎভাগ	পশ্চাদ্ভাগ

অ-বিজ্ঞান বিভাগগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বা ফোকলোর বিভাগের প্রশ্নপত্রে বানান-ভুল নেই বললেই চলে। তবে কলা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, আইন অনুষদের অনেকগুলো বিভাগের প্রশ্নে প্রচুর বানান-ভুল লক্ষ করা যায়। এমনই একটি অ-বিজ্ঞান বিভাগের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ১০০টি প্রশ্নের মধ্যে ৬০টি প্রশ্ন বাংলায় এবং ৪০টি প্রশ্ন ইংরেজিতে করা হয়। বাংলা ৬০টি প্রশ্নের মধ্যে প্রমিত বানানের বিচারে ভুলের সংখ্যা ছিলো ৩৪টি (পৌনঃপুনিকতায় তা ৪২), যা নিম্নের সারণি থেকে দেখা যাবে:

সারণি ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় (২০০৮–০৯) অ-বিজ্ঞান একটি বিভাগের প্রশ্নে বানান-ভুল

প্রশ্নপত্রের বানান	প্রমিত ও শুদ্ধ বানান	প্রশ্নপত্রের বানান	প্রমিত ও শুদ্ধ বানান
১. গাড়ী	গাড়ি	২. নীচুমন	নিচু মন
৩. ভানকরা	ভান করা	৪. রেনু	রেণু
৫. সৎমা	সৎ মা	৬. তুর্কী	তুর্কি
৭. আরবী	আরবি	৮. ফার্সী	ফারসি
৯. পর্তুগীজ	পর্তুগিজ	১০. জাপানী	জাপানি

১১. ঠাকুরণ	ঠাকরুন	১২. পাগলী	পাগলি
১৩. ডাইনী	ডাইনি	১৪. ভূষন্ডি	ভূশণ্ডি
১৫. প্রতীক্ষমান	প্রতীক্ষমাণ	১৬. বদ মেজাজী	বদমেজাজি
১৭. গাজী মিয়া	গাজী মিয়াঁ	১৮. পুত্র বধুর	পুত্রবধূর
১৯. দূর্যোগ	দুর্যোগ	২০. চালিত রূপ	চলিত রূপ
২১. তাঁতী	তাঁতি	২২. কাঠমিস্ত্রী	কাঠমিস্ত্রি
২৩. রাজমিস্ত্রী	রাজমিস্ত্রি	২৪. প্যারীদাস মিত্র	প্যারীচাঁদ মিত্র
২৫. হুমায়ুন আহমেদ	হুমায়ূন আহমেদ	২৬. সার্বজনীন	সর্বজনীন
২৭. জারী	জারি	২৮. দন্ডবিধি	দণ্ডবিধি
২৯. নারীগন	নারীগণ	৩০. ফৌজদারী	ফৌজদারি
৩১. ফারসী বিপ্লব	ফরাসি বিপ্লব	৩২. ইরানী	ইরানি
৩৩. অন্তর্ভূক্ত	অন্তর্ভুক্ত	৩৪. পৃথকীকরণ	পৃথক্‌করণ

অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, এই বিভাগের প্রশ্নপত্রে যেসব বানান-ভুল চোখে পড়ে, তা প্রধানত প্রমিত বানানের ভুল। তাই শতকরা হারের দিক দিয়ে এটিকে খানিকটা বেশি মনে হলেও ভুলের মাত্রা বিবেচনায় এই বিভাগের ভুলের পরিমাণ বিজ্ঞান বিভাগের মতো মারাত্মক নয়।

যেভাবেই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার কথা ভেবে এই জাতীয় ভুলের হাত থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলোকে মুক্ত রাখা দরকার। মর্যাদার কথাটি তোলা হলো এইজন্যে যে, যেসব ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে আসে, তাদের অভিভাবকগণ যদি এগুলো দেখেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হতে পারেন। কেননা, যাঁরা সামান্য একটা প্রশ্ন করতে এতোগুলো বানান-ভুল করে, তাঁদের হাতে শিক্ষাগ্রহণ কতোটা নিরাপদ—এমন ভাবনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। অনুষদ অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে প্রশ্নপত্রে ভুলের পরিমাণ হয়তো কয়েক গুণ হ্রাস পাবে, কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।[৪৭]

ফলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে দাপ্তরিক কাজকর্ম ছাড়া এবং ক্লাশ-লেকচারে শিক্ষকের আঞ্চলিকতা মিশ্রিত মাতৃভাষা ছাড়া যেহেতু বাংলা ভাষার কোনো ব্যবহার নেই, তাই সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ভুল খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রায়োগিক বিদ্যায় ভাষার ব্যবহার খুব সামান্য হলেও এইসব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যক্রম পুরোপুরি ইংরেজি ভাষামাধ্যমের। অথচ এসব বিদ্যা বাংলা ভাষায় প্রদান করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন না। কেন ভাবেন না, বলা মুশকিল। অথচ বিশ শতকের সূচনায় ঢাকায় প্রথম যে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সেখানকার শিক্ষকগণ বাংলা মাধ্যমেই চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতেন, বাংলা মাধ্যমের পাঠ্যবইও তখন প্রকাশিত হতো এবং ছাত্ররা তা পড়ে ডাক্তারিও করতে পারতেন।[৪৮]

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার এই দৈন্যের পেছনে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এবং শিক্ষার বাণিজ্যীকরণের প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা,

---

[৪৭] ২০১০–১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে। এতে বানান-ভুলের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কমেছে। যেমন ঐ অ-বিজ্ঞান বিভাগ যে অনুষদের অধীনস্থ, তার প্রশ্নপত্রে এবারের বানান-ভুল ও মুদ্রণের ভুল দশটিরও কম।

[৪৮] শরীফ উদ্দিন আহমেদ, "বাংলাদেশে চিকিৎসা বিদ্যালয়: সূচনা পর্ব, ১৮৭৫–১৯০৫," *বিশ শতকের বাংলা*, পৃ. ২৯৪।

সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার কোনো কারবার নেই। আবার সেগুলোর অনেকটার সঙ্গে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ থাকে। সর্বোপরি, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো যাই থাক না কেন, এখানকার শিক্ষকদের বেতনের পরিমাণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রলুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট। বাস্তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বাড়তি কামাই করতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন। যাঁরা সেই সুযোগ পান, অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষমতা বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান গ্রহণ করে।

৭. বাস্তবতা: গণযোগাযোগ

গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট মর্যাদাজ্ঞাপক। বাংলাদেশের মুদ্রিত মাধ্যম, শ্রব্য মাধ্যম এবং দৃশ্যশ্রব্য মাধ্যম—সবগুলোর বেলায় এ মন্তব্য করা যায়। যে বাণিজ্যিক কারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে ক্রমে একপেশে করে ফেলছে, সেই একই বাণিজ্যিক কারণ গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়িয়ে তুলছে। ক্রমবর্ধমান সে ব্যবহার বাংলা ভাষার ভাষিক মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাধ্যমগুলোর দিকে একে একে তাকানো যেতে পারে।

একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা কয়েক শত। এর মধ্যে এক ঢাকা থেকেই অর্ধশতাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রিকার অধিকাংশই কঠোরভাবে ভাষার রীতি-নীতি মেনে চলে। সবগুলো পত্রিকা সমকালীন প্রমিত ভাষা মেনে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। এটি নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। বেশি কঠিন কাজ প্রতিদিনের খবর সঙ্গে সঙ্গে সংকলন করা এবং অনেকটা নির্ভুলভাবে তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করা। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন যে অসম্ভব কিছু নয়, তা এই পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা-মান থেকে অনেকটা আন্দাজ করা যায়।

দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার জন্য অনেক পত্রিকায় ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থাকে। বানান-ভুলও চোখে পড়ে। প্রায় সকলেই বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান ব্যবহারের চেষ্টা করেন। 'যায়যায়দিন' পত্রিকার মতো দু-একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীও যে নেই, তা নয়। তবে তা মূল ধারায় বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না; বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হয়েই থাকে। বরং কিভাবে আরো নির্ভুলভাবে পত্রিকা প্রকাশ করা যায়, সে ব্যাপারে নামকরা পত্রিকাগুলোর বিশেষ উদ্যোগ চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে 'প্রথম আলো' পত্রিকার কথা স্মরণীয়। বাংলা একাডেমীর বানান-নীতিকেই এরা মূলত অনুসরণ করে থাকে, তা সত্ত্বেও তাদের কর্মীবাহিনী যাতে ভাষিক শুদ্ধতাকে নিশ্চিত করতে পারে, সেজন্য তারা আলাদা পুস্তক প্রকাশ করে।[৪৯]

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান বহুকাল যাবৎ বাংলা গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। এগুলোর ভাষাগত মান দৈনিক পত্রিকার তুলনায় খারাপ। যেখানে প্রতিদিনের খবর দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন প্রায় নির্ভুল ভাষায় প্রকাশ করতে পারে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলা জার্নালগুলোকে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা জার্নালগুলো খুবই হতাশাব্যঞ্জক। বিভিন্ন ধরনের ভাষাগত ভুল, যতিগত ভুল, বানান-ভুল ও মুদ্রণ-প্রমাদে এগুলো পরিপূর্ণ থাকে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো হেরফের ঘটে না। পদোন্নতির

---

[৪৯] *প্রথম আলো ভাষা-রীতি* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯)।

সঙ্গে প্রকাশনার সম্পর্ক থাকা, এবং সেইসঙ্গে যোগ্য ব্যবস্থাপনার অভাব হয়তো এর জন্য দায়ী। তবে সবচেয়ে বেশি দায়ী বাংলা ভাষার প্রতি সংশ্লিষ্টজনদের ভালোবাসার অভাব।

শ্রব্য মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে রেডিও ও বিভিন্ন ধরনের অডিও রেকর্ড। অন্যদিকে দৃশ্যশ্রব্য মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন চ্যানেল ও নানা ধরনের ভিডিও রেকর্ড। রেডিও এবং অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে ভাষার উচ্চারণগত দিকগুলোই শুধু ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেতারকেন্দ্রগুলো যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করে। বিশেষভাবে খবরগুলো, প্রতিবেদনগুলো, গানগুলো প্রমিত ভাষায় পরিবেশিত হয়ে থাকে।

দৃশ্যশ্রব্য মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন থেকে ভাষার অংশ যেমন শোনা যায়, আবার টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা মুদ্রিত বাক্য থেকে ভাষা দেখাও যায়। তবে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল ধ্বনি উচ্চারণের দিকে যতোটা খেয়াল রাখে, লিখিত অংশ প্রচারের সময়ে ততোটা খেয়াল রাখে বলে মনে হয় না। বিশেষভাবে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে টেলিভিশনের পর্দায় মাঝে মাঝে যেসব বাক্য ভেসে উঠতে দেখা যায়, তাতে ভাষাগত বেশ ভুল থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা চ্যানেলগুলোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্র লক্ষণীয়।

৮. বাস্তবতা: ব্যবসা-বাণিজ্য

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষায় কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিকতার ছুতোয় মফস্বলের মুদি দোকানদার পর্যন্ত বাংলা ভাষা থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই ব্যাংকগুলোর নাম করতে হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অধিকাংশ ব্যাংক সরকারি থাকায় সরকারের ভাষানীতিকে তারা অনুসরণ করতে বাধ্য হতো। বিশেষভাবে ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন পাস হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর হিসাব-নিকাশ, জমার রশিদ, দলিল-পত্র ইত্যাদি বাংলায় হতে শুরু করেছিলো। তাই বিভিন্ন ধরনের ফরমও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হতে শুরু করে। কিন্তু একুশ শতকের সূচনায় ব্যাংকগুলো একদিকে সরকারি মালিকানা থেকে ব্যক্তিমালিকানার দিকে যেতে থাকে, অন্যদিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ ও লেনদেন শুরু হওয়ায় উল্লিখিত ভাষা পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময়ে সে পরিবর্তন যথেষ্ট সুখকর হয় না। পরিববর্তিত পরিস্থিতিতে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে দাপ্তরিক কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা হয় বটে, কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে বাংলা ভাষায় দাপ্তরিক কাজ হয় না, এমনকি তাদের হিসাব-নিকাশ বা লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্রেও কোনো বাংলা হরফ চোখে পড়ে না।

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা যুক্তি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য, তা হলো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে তাদের এমন ভাষা ব্যবহার করতে হয়, যা উভয় পক্ষের বোধগম্য, এক্ষেত্রে ইংরেজির কোনো বিকল্প নেই। তাই বাধ্য হয়ে তারা ইংরেজিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু ঐসব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ব্যবসার ক্ষেত্রেও যখন ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে, তখন তাদের ঐ যুক্তি ধোপে টেকে না।

প্রতিষ্ঠানগুলো যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার প্রশ্নও তোলে। বিশেষভাবে যেসব যন্ত্র দিয়ে তারা বিল প্রদান করে বা হিসাব-নিকাশ করে, তার অনেকগুলোতে বাংলা অপশন থাকে না। কিন্তু যে কম্পিউটারের মাধ্যমে তারা হিসাব-নিকাশ করে, সেখানে বাংলা অপশন খুব সহজে ঢোকানো যায়। প্রয়োজনে সফ্‌টওয়ার তৈরি করে নেওয়াও কঠিন কিছু নয়।

একদিকে যেমন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে আসছে, অন্যদিকে প্রচারণার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। পূর্বে দেশীয় কোম্পানিগুলোও তাদের প্রচারণার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিতো, এখন আন্তর্জাতিক কোম্পানিও বাংলা ভাষায় প্রচারণা করতে এগিয়ে এসেছে। কৌশলগত কারণেই তারা এটা করছে, এতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

কৌশলগত কারণ হোক আর যাই হোক, এই প্রবণতা বাড়তে থাকার ফলে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের মোড়কে বাংলা ভাষার স্থান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিদেশে প্যাকেটজাত দ্রব্যের গায়েও তাই বাংলা লেখা দেখা যাচ্ছে। পূর্বে দেশীয় পণ্যের মোড়কে যেখানে ইংরেজি ভাষার বাড়াবাড়ি থাকতো, সেই হীনম্মন্যতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

৯. বাস্তবতা: সেবা-প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের সেবা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষার ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাংলাভাষী নাগরিকের সংখ্যা নগণ্য। শুধু তাদের কথা ভেবে যদি সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলো অ-বাংলা ভাষা ব্যবহারে আগ্রহ দেখায়, তাকে বাড়াবাড়ি না বলে উপায় থাকে না।[৫০] বাস্তবতা তা নয়। বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা থেকেই এই মানসিকতার জন্ম।

প্রসঙ্গত বিদ্যুৎ বা টেলিফোনের বিলের প্রসঙ্গ তোলা যায়। বাংলাদেশে বাংলাভাষীরাই বিদ্যুতের বিল দেয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে এই বিল তৈরি করা হয়ে থাকে। বাংলা সংখ্যাবর্ণ আর ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত আরবি সংখ্যাবর্ণের অবস্থানগত কোনো তফাত নেই, শুধু চেহারাগত তফাত। বিদ্যুৎ বা টেলিফোন বিলে বাড়তি যে কথাগুলো থাকে, তা হলো গ্রাহকের নাম-ঠিকানা ও খাত। এগুলো রোমান লিপিতে লেখার মধ্যে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব আছে, এমন মনে হয় না। বরং বাংলায় লিখলে নাম-ঠিকানাগুলো শুদ্ধভাবে লেখা যেতো, অন্যদিকে ইংরেজি লেখার ফলে খুব সহজেই একজনের নাম আর একজনের নামে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

১০. উপসংহার

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি দেশের রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ যে মাত্রায় সংকটের মুখে পড়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ তার চেয়ে বেশি মাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরে বাংলা ভাষার প্রতি কখনো ইতিবাচক আচরণ কখনো নেতিবাচক আচরণ লক্ষ করা যায়, সেটিও রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে অনেক সময়ে মিলিয়ে দেখা যায়। তাই ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে প্রথমবার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার পর দীর্ঘ ৩৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়, একই রাজনৈতিক দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করা পর্যন্ত।

ভাষার প্রসার বিষয়ে অর্থনীতিও অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়, তাহলে বাংলা ভাষার মর্যাদা নিঃসন্দেহে

---

[৫০] এই ধরনের একটি বাড়াবাড়ির উদাহরণ দিয়েছেন ২০১০ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে প্রদত্ত বক্তৃতায় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। তিনি জানান ঢাকার একটি সভায় তিনি দেখেছেন, শ্রোতাদের মধ্যে একজন মাত্র সাদা চামড়ার লোক থাকায় আলোচনাসভার সকলেই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। আলোচকগণ একবারও ভাবেন না, তাঁদের মূল শ্রোতারা ইংরেজি বোঝেন না, এবং তাদের নিকটেই কথাগুলো বলা দরকার। প্রফেসর মামুন এটিকে চিহ্নিত করেন বাঙালির 'দাসমনোবৃত্তি' হিসেবে।

আরো বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় যেমনটা দেখা গেছে, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের কোনো স্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ ও অনীহা—অর্থনীতিই তার পেছনে চালিকাশক্তি। বাংলা ভাষায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করলে অথবা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন দিলে অধিক লাভ, তাই তখন বাংলা ভাষার কদর। আবার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরি পাওয়া যায় না বা বিদেশি দাতাদের খয়রাত পাওয়া যায় না, তাই তখন বাংলা ভাষা অপাঙ্‌ক্তেয়। বাংলা ভাষা এভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে কখনো উপরের দিকে ওঠে আবার কখনো নীচের দিকে নামে।

এমন ওঠানামা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে বাংলা ভাষার প্রসার ও ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। বিশ শতকের সূচনার বাংলা ভাষার সঙ্গে একুশ শতকের সূচনার বাংলা ভাষার অবস্থার তুলনা করেও তা বোঝা যায়। হিন্দি-উর্দুর তুলনায় এই অগ্রগতি হয়তো খানিকটা মন্থর, তবে হতাশাব্যঞ্জক নয়। পূর্বের আলোচনায় যেসব দুর্বলতা নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো দূর করা সম্ভব হলে আরো বেশি আশাবাদী হওয়া সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর যে আকাঙ্ক্ষা দিয়ে এই আলোচনা সূচিত হয়েছিলো, তাও পাবে পায়ের নীচে শক্ত মাটি।[৫১]

---

[৫১] প্রবন্ধটি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের অর্থানুকূল্যে রচিত এবং বাংলা নববর্ষ ১৪১৭ উপলক্ষে ১৫ই এপ্রিল ২০১০ তারিখে আইবিএস-এর সেমিনারকক্ষে পঠিত। এই সেমিনারের সভাপতি ছিলেন আইবিএস-এর পরিচালক অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসের এবং ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবুল হাসান চৌধুরী।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

সুলতানি যুগে ভারতের বাণিজ্য : গতি ও প্রকৃতি

ইমতিয়াজ আহমেদ•

Abstract: India had commercial prosperity from ancient time. It was highly increased during the Sultanate period. The volume of trade, both internal and external, carried on by Indians, was enormous in that time. India had commercial relations with the outside world. Foreign trade was carried on both through land and sea routes. A large number of foreign traders came to India and participated in the trade freely. Muslim traders specially the Arabs and the Gujaratis established their monopoly in that trade. Brokers played an important role in commercial transactions. The balance of trade on the whole was in Indians favour. The view of this article is to introduce of those characteristics the Indian trade in the Muslim Sultanate period.

ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে সুলতানি শাসনের প্রবর্তন কেবল ভারতের ইতিহাসে নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে।[১] প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্য উভয়ই সমৃদ্ধ ছিল। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়াও এদেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যেতো যা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্ব হতে পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে যেসব দেশের বণিক ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে ফিনিশীয়, ক্যালদীয়, ব্যবলনীয়, গ্রিক, রোমান অন্যতম ছিল।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমানদের হাতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে রোমানরা প্রাচ্যের মসলা এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রী সংগ্রহের জন্য ভারতে আসতে থাকে। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কখনো নদীপথে, কখনো স্থলপথে (ক্যারাভানপথ) অগ্রসর হয়ে লোহিত সাগরীয় পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তের

• ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] ১১৯২ সালে গজনীর শাসনকর্তা মুহাম্মদ ঘোরী দিল্লি ও আজমীরের চৌহান বংশীয় শাসক পৃথ্বিরাজকে তরাইন প্রান্তরে পরাজিত করে ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১২০৬ সালে মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য সেনাপতি ও বিজিত ভারতের প্রতিনিধি কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং সুলতান উপাধি গ্রহণ করে ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকেন। এভাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সালতানাত তথা সুলতানি আমল। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট বাবরের কাছে সুলতান ইবরাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতে সুলতানি শাসনের পতন ঘটে।

বন্দরগুলোতে উপস্থিত হতো। অতঃপর বিশালাকৃতির জাহাজসহ ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতো। কখনোও আরব সাগরের উপকূল বরাবর, কখনো আবার সরাসরি পূর্বদিকে জাহাজ চালনা করে রোমানরা ভারতের মালাবার উপকূলীয় বন্দরগুলোতে উপস্থিত হতো। উল্লেখ্য, এ সময়ে লোহিত সাগর ও আরব সাগরের উপর রোমানদের আধিপত্য ছিল এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। রোমানরা ভারত আগমনকালে সঙ্গে আনতো প্রবাল, কাঁচের জিনিসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি। বিনিময়ে তারা সংগ্রহ করতো গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মসলিন, সুতি বস্ত্র, চিনি, সুগন্ধি দ্রব্য, কস্তুরী, মণিমুক্তা, হাতির দাঁত ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী। ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসব পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হতো। গুজরাটি ও করোমণ্ডল উপকূলীয় বণিকরা এসব পণ্য সংগ্রহ করে রোমানদের সরবরাহ করতো। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপিত রোমান-ভারত বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের পাশাপাশি আরব এবং পারসিক বণিকরাও অংশ নিতো যদিও গুজরাটিদের ন্যায় তাদের অবস্থান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ভারতের এ বাণিজ্য ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য নামে অভিহিত হতো।

চতুর্থ শতাব্দীতে বার্বারদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে রোমানদের আধিপত্য দুর্বল হয়ে যায়। রোমানের পরে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে প্রথমে অক্সামীয়দের (ইথিওপীয়) এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ আরবদের ও পারসিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম-অষ্টম আরব ভূখণ্ডে ইসলামের আগমন এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তৃত অংশে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তারে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য তথা বিশ্ব বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের মধ্যে স্থাপিত সমস্ত বাণিজ্যপথ আরবদের অধীনে চলে আসে। মরু আরবরা প্রধান অর্থনৈতিক অবলম্বন হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেয়। তারা আরব বিশ্বের সঙ্গে বিভিন্ন মহাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তাদের যাতায়াত ছিল যা ইতোমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। মুসলিম হওয়ার পর তাদের এই আগমন আরো বৃদ্ধি পায়। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের সিন্ধু বিজয় এবং সিন্ধুসহ ভারত উপকূলীয় জলভাগে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আরব বণিকদের ভারতে জোরালো আগমনের পটভূমি তৈরি করে। নবম শতাব্দীতে গুজরাটে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে এ আগমন আরো সুদৃঢ় হয়। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এবং ইউরোপীয়দের চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আরবদের ব্যাপক যাতায়াত শুরু হয়। এ সময় শ্রীলংকা এবং চীনেও আরব মুসলমানদের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ভারত হয়ে আরবদের এসব দেশে যাতায়াত করতে হতো। এভাবে একদিকে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন এবং অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনে যাতায়াতের পথে ভারতের বন্দরগুলোতে অবস্থানজনিত কারণে ভারতবর্ষে আরব বণিকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। আরব বণিকদের ভারতে অধিক যাতায়াত ও পণ্য সংগ্রহের ফলে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপিত হলে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম শাসনপূর্ব যুগে অর্থাৎ হিন্দু আমলে এককেন্দ্রিক শাসনের অভাব, শাসকদের পারস্পরিক রাজ্যগ্রাসের মনোভাব, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ, কৃষি ও শিল্পে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ভারতের অর্থনীতিতে এক প্রচণ্ড স্থবিরতার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষত তৎকালীন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। অত্যধিক শুল্ক আরোপ, অনুন্নত মুদ্রা নীতি, দস্যু-তস্করের উপদ্রব, অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত

রাস্তাঘাট এবং বিদেশী বণিকদের জন্য গঞ্জ ও বন্দরগুলোর উন্নয়নের অভাব প্রভৃতি কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মালাবার ও করোমণ্ডল উপকূলীয় কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্র আরব, পারসিক, গুজরাটি, তামিল প্রভৃতি বণিকগোষ্ঠীর সহায়তায় বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারত বিজয়ের পরে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, দস্যু-তস্করের উচ্ছেদ, কঠোর হস্তে অভ্যন্তরীণ ও প্রাদেশিক বিদ্রোহ দমন, দক্ষতার সঙ্গে বিদেশী আক্রমণ বিশেষত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলিম সুলতানগণ ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পটভূমি রচনা করে। মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার অন্যতম উপাদান হওয়ায় প্রথম থেকেই দিল্লির সুলতানগণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার ও মানসম্মত মুদ্রার প্রবর্তন, উদার শুল্কনীতির প্রবর্তন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সুলতানগণ কর্তৃক বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য এসব উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলে দেশি এবং বিদেশি বণিকগণ ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে থাকে।

সুলতানি শাসনামলে আরব, সিরীয়, পারসিক, তুর্কি, ইটালীয় প্রমুখ বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত যাতায়াত করতো। তবে আরব বণিকদের যাতায়াত অন্যান্যদের তুলনায় বেশি ছিল। এর কারণ ছিল সম্ভবত ধর্মীয় অনুভূতি। ভারতের শাসকগণ মুসলমান হওয়ায় এবং তাদের প্রায় প্রত্যেকে খিলাফত ও আরব খলিফাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় স্বাভাবিকভাবে আরব বণিকগণ অন্যান্য দেশীয় বণিক অপেক্ষা অধিক সুযোগ-সুবিধা যে লাভ করবে তা উপলব্ধি করা যায়। সুলতানি ভারতে আরব বণিকদের আধিক্যের পশ্চাতে আরেকটি কারণ হলো 'আরব' শব্দটির ব্যাপকতা। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে এমনকি পরবর্তীতেও আরব বলতে কেবল আধুনিক সৌদি আরবের লোকদের বোঝাতো না, বরং বর্তমান পশ্চিম এশিয়ার যেসব রাষ্ট্র মুসলিম শাসনাধীনে এসেছিল এবং যারা আরবি ভাষায় কথা বলতো তারা সবাই আরব নামে অভিহিত হতো। এভাবে ভারত তথা প্রাচ্য বাণিজ্যে আরব আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বাণিজ্যে আরবদের আধিপত্য পরিলক্ষিত হলেও এর উন্নয়ন ও বিকাশে অন্যান্য দেশীয় বণিকদেরও ব্যাপক অবদান লক্ষণীয় ছিল। এ ব্যাপারে ভারতীয় বণিকদের মধ্যে গুজরাটি, তামিল ও বাঙালি বণিকদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের সবার প্রচেষ্টায় সুলতানি শাসনামলে ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়।

সুলতানি আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের মূলে নগরায়ণ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। উত্তর ও পূর্ব ভারতে শহরায়ন ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে। হস্তশিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং গৃহনির্মাণ শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নতি নগরায়ন বিকাশের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল বলে প্রসিদ্ধ গবেষক ও ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মনে করেন।[২] সুলতানি শাসন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উত্তর ভারতে শহর তৈরি ও শাসকশ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের শিল্প উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। এর ফলে শহরগুলোতে প্রথমদিকে দাস কারিগর, বিদেশী কারিগর ও স্থানীয় কারিগররা মিলে যেসব

---

[২] ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সমীক্ষা*, অনু. সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৪), পৃ. ৩-৪।

শিল্প উৎপাদন করে সেগুলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহায়ক হয়। শহর ও তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যেরও ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সুলতানগণ কর্তৃক ঋণদান ব্যবস্থা এ প্রক্রিয়ার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। আলাউদ্দিন খলজী দূরবর্তী অঞ্চল থেকে পণ্য নিয়ে আনার জন্য মুলতানি বণিকদের বিশ লক্ষ টাকা ঋণ দিতেন।[৩]

অবশ্য পূর্ব ভারতের বাণিজ্য কাঠামোতে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের আগেই ভাগীরথী নদীর উপর অন্তত ছটি শহরের কথা পাওয়া যায়, যেগুলোর সঙ্গে সম্ভবত স্থলপথে ও সমুদ্রপথে বিদেশের বাণিজ্য যোগাযোগ হতো। দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতের উপকূলের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শহরগুলোর বাণিজ্যিক লেনদেন মুসলমান শাসকগোষ্ঠী আসার আগে থেকেই ছিল। মুসলমানরা আসার ফলে অন্তত পশ্চিম উপকূলবর্তী শহরগুলোর সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্য যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। আলোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধটিকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: (ক) অন্তর্বাণিজ্য বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, এবং (খ) বহির্বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্য। পর্যায়ক্রমে উভয় বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি : সুলতানি যুগে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সুলতানগণ নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করেন। কৃষকদের নগদ অর্থে সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে হতো। এজন্য কৃষিজ পণ্যের বাজার গড়ে ওঠে। দিল্লির মতো বৃহৎ শহরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাণিজ্য ও বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। আয়তন ও লোকসংখ্যায় দিল্লি ছিল ইসলামি প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শহর। দৌলতাবদাও ছিল প্রায় দিল্লির সমান। এ দুটো প্রধান শহর ছাড়াও লাহোর, মুলতান, আনহিনওয়ারা, কাম্বে, কারা ও লক্ষ্মণাবতী ছিল সুলতানি যুগের অন্যান্য প্রধান শহর। সুলতানি যুগে এক নগর অর্থনীতির আবির্ভাব হয়। এ ধরনের অর্থনীতির প্রয়োজনে বিস্তৃত বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

গ্রাম থেকে শহরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল আসতো। উল্লেখ্য, সুলতানি যুগে কৃষকদের উপর করের চাপ ছিল বেশি। কৃষকরা সরকারি প্রাপ্য মেটানোর জন্য ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত থেকে তা বিক্রি করতে বাধ্য হতো। দশ থেকে বিশ হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে নায়ক বণিকরা গ্রাম থেকে শহরে শস্য নিয়ে আসতো। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় দিল্লিতে শস্যের বাজার স্বাভাবিক ও নিয়মিতভাবে বসতো। সুলতান একই সঙ্গে কঠোরতা ও আর্থিক সুযোগ প্রদান করে এ ব্যাপারে সফল হন। জিয়াউদ্দীন বারানী উল্লেখ করেছেন যে, দিল্লিতে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ক্যারাভানীদের সম্পত্তি ও পরিবার জামিন হিসেবে রাখতেন। তাছাড়া সুলতান নায়ক বণিকদের অগ্রিম মূল্য ও বহুমূল্য পোশাক দিয়ে দিল্লিতে নিয়মিতভাবে শস্য প্রদানে বাধ্য করেন।[৪] এসব শস্য ব্যবসায়ীদের হাতে নগদ অর্থের ভাণ্ডার থাকতো। শহরগুলো থেকে গ্রামে বিশেষ কিছু যেতো না। গ্রামবাসীদের ব্যাপক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করে নগদ অর্থ বলতে তেমন কিছু থাকতো না। সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রামের কুটির শিল্পগুলোতেই উৎপন্ন হতো। গ্রামবাসীরা বস্ত্রসহ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য

---

[৩] *তদেব*, পৃ. ৫।

[৪] Tapan Ray Chaudhuri and Irfan Habib, ed., *The Cambridge Economic History of India* (Delhi: Cambridge University Press, 1982), p.83 (hereinafter cited as *CEHI*).

সাধারণত গ্রাম্য বাজার এবং মৌসুমি ও বাৎসরিক মেলা থেকেই সংগ্রহ করতো। এভাবে সুলতানি আমলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি পাকাপোক্ত হয় এবং বাণিজ্যিক লেনদেকে উহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ক্যারাভান বাণিজ্য : অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত স্থলপথে পরিচালিত হতো যা ক্যারাভান বাণিজ্য নামে অভিহিত হয়। স্থলপথগুলো সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পথিক ও বণিকদের বিশ্রামের জন্য পথে নির্দিষ্ট দূরত্বে মঞ্জিল স্থাপন করা হয় এবং সরাইখানা নির্মাণ কর হয়। সুলতানি আমলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনার জন্য অসংখ্য হাটবাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ছোট ছোট হাটবাজার থেকে বণিকরা পণ্য সংগ্রহ করে বড় বড় শহরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে প্রেরণ করতো। সুলতানি ভারতে দিল্লি ছিল সবচেয়ে বড় বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র। বড় ঘোড়া ও ক্রীতদাসের জন্য দিল্লির বাজার বিখ্যাত ছিল। খোরাসানি বণিকরা এজন্য মুলতানে না গিয়ে সরাসরি দিল্লিতে এসে বাণিজ্য করতে চাইতো। রাজধানী দিল্লির খাদ্য শস্যের জোগান আসতো আমরোহা থেকে, পানীয় আলিগড় ও মীরাট থেকে পান আসতো। রাজধানীর বস্ত্রের চাহিদা ছিল বিচিত্র। অযোধ্যা অঞ্চল থেকে সাধারণ কাপড়, দেবগিরি থেকে মসলিন এবং বাংলা থেকে ছাপা কাপড় আসতো। বাংলাতেও মসলিন তৈরি হতো এবং তা অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল। বাংলার মসলিন এবং রেশম ভারতের বিভিন্ন বাজারে যেতো।

পণ্য পরিবহনের জন্য বলদ, বলদে টানা গাড়ি এবং পালকি ব্যবহৃত হতো। তবে রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল না হওয়ায় গাড়ির ব্যবহার কম ছিল। যারা পণ্য নিয়ে দিল্লি যেতো তাদের নায়ক বণিক বলা হতো। দশ থেকে বিশ হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে এরা গ্রাম থেকে শহরে শস্য নিয়ে আসতো। ইবনে বতুতার প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, তিন হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে আমরোহা থেকে দিল্লিতে ত্রিশ হাজার মন শস্য আনা হতো। ইবনে বতুতা আরো জানিয়েছেন যে, ভারী ও আয়তনে বিশাল পণ্য পরিবহনের জন্য বলদ ব্যবহার করা হতো।[৫] সমকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী উল্লেখ করেছেন যে, দিল্লিতে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ক্যারাভানীদের সম্পত্তি ও পরিবার জামিন হিসেবে রাখতেন। তাছাড়া সুলতান নায়ক বণিকদের অগ্রিম মূল্য ও বহুমূল্য পোশাক দিয়ে দিল্লিতে নিয়মিতভাবে শস্য প্রদানে বাধ্য করেন।[৬] শহরগুলো থেকে গ্রামে বিশেষ কিছু যেতো না। গ্রামবাসীদের ব্যাপক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করে নগদ অর্থ বলতে তেমন কিছু থাকতো না। সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রামের কুটির শিল্পগুলোতেই উৎপন্ন হতো। গ্রামবাসীরা বস্ত্রসহ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণত গ্রাম্য বাজার এবং মৌসুমি ও বাৎসরিক মেলা থেকেই সংগ্রহ করতো।

স্থলপথের সঙ্গে সঙ্গে নদীপথ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কাশ্মীর, বাংলা, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে নদীপথের বহুল প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবরের সময় কাশ্মীরে প্রায় ৩০,০০০ নৌকা ছিল। একই সময়ে সিন্ধুতে ছিল প্রায় ৪০,০০০ নৌকা। খাদ্যশস্য, চিনি, ঘি, লবণ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান পণ্য হিসেবে পরিগণিত হতো।[৭] নদীপথে বর্ষা এবং খরা উভয় মৌসুমে পণ্য পরিবহনের সুবিধা ছিল। তাছাড়া বলদের তুলনায় নৌকায় অধিক

---

[৫] Ibid.
[৬] Ibid.
[৭] P. N. Chopra and others, *A Social, Cultural and Economic History of India*, vol. II, reprint; (Delhi : Macmillan India Ltd., 2003), p. 114.

পণ্য আনা নেওয়া করা যেতো। পণ্য পরিবহনের সুবিধার জন্য সুলতানি আমলে গঞ্জ, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো সাধারণত নদীর তীরে গড়ে উঠতো।

দস্যুতস্করের উপদ্রব : ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দস্যুতস্করের উপদ্রব লক্ষণীয় ছিল। দস্যুরা বণিক ও যাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত হতো না, প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটাতো। ইবনে বতুতা মুলতান থেকে দিল্লী যাত্রাকালে আবোহর নামক শহর পরিত্যাগের পর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রমকালে একদল দস্যু কর্তৃক তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আক্রান্ত হন এবং দস্যুদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কয়েকজনের জীবনহানি ঘটে।[৮] মেওয়াটি, কামপিল, পাতিয়ালা, ভোজপুর প্রভৃতি এলাকার দস্যুদের দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাজ ও দস্যুবৃত্তিতে সুলতানি ভারতের চর্তুদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। মেওয়াটি দস্যুদের উৎপাত এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাদের ভয়ে রাস্তাঘাটে বণিক ও জনগণ পথ চলতে সাহস করতো না। এমনকি দিল্লি শহরের চতুষ্পার্শ্বের লোক নামাজের সময়ও ঘরের দরজা বন্ধ রাখতো। নামাজের পরে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মাজার জিয়ারত করতে কিংবা সুলতানি হাউজের কিনারায় বেড়াতে যেতে কারোর সাহস হতো না।[৯]

সুলতান বলবন মেওয়াটি দস্যুদের প্রধান আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত জঙ্গলসমূহ পরিষ্কার করেন, শত শত মেওয়াটি দস্যুকে তরবারির মুখে নিক্ষেপ করেন, তাদের বাড়িঘর লুণ্ঠন, সহায় সম্পত্তির ধ্বংস সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে কঠোরভাবে এই দস্যুদের দমন করেন। দিল্লীর নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন থানা নির্মাণ করেন এবং দুর্ধর্ষ আফগান দলপতিদিগকে থানাসমূহের নেতৃত্ব দেন। সুলতান স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে কামপিল, পাতিয়ালা, ভোজপুর, কাথিয়াড় প্রভৃতি স্থান দস্যুমুক্ত করেন। দস্যুদের আশ্রয়স্থলের মাঝে মাঝে তিনি আফগান সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি দস্যুদের দমন করে দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।[১০]

দালালদের দৌরাত্ম্য : সুলতানি যুগে ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে দালাল শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে তারা কমিশন গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, দালালদের জন্য বাজারে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। দালালরা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে অভিনব উপায়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করতো। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি অনেকটা সফলতাও অর্জন করেন। কিন্তু ভারতে বাজার ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকলে এ বিশাল বাজারে ক্রেতা ও বণিকদের মধ্যে দালালদের অবস্থানকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি।

বৈদেশিক বাণিজ্য

কারাভান ও সমুদ্রপথ: সুলতানি আমলে কারাভান ও সমুদ্র উভয় পথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে এবং জলপথে দক্ষিণ-

---

[৮] Ibn Battuta, *Travels in Asia and Africa, 1325-1354*. trans. H. A. R. Gibb, 3rd im. (London : Routledge & Kegan Pall Ltd.,1953), pp.190-191 (hereinafter cited as Ibn Battuta).

[৯] জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, অনু. গোলাম সামদানী (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪৪।

[১০] তদেব।

পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সুলতানি ভারতের বাণিজ্য চলতো। ক্যারাভানপথের প্রধান পণ্য ছিল ঘোড়া ও ক্রীতদাস। দিল্লি ছিল ভারতের ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের সর্ববৃহৎ বাজার। ঘোড়ার ব্যবসা বাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে উল্লেখ আছে, মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী যখন কয়েকজন অশ্বারোহীসহ বাংলার রাজধানী নদীয়ার নগরদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনিই যে বখতিয়ার খলজী এমন ধারণা রাজপ্রাসাদের কেহই করেননি। সকলের ধারণা হয়েছিল তাঁরা বণিকদল এবং মূল্যবান অশ্ব বিক্রয়ের জন্য এসেছেন।[১১] তুর্কিস্তান থেকে ভারতে প্রধানত ঘোড়া আমদানি হতো। কাবুল থেকে আসতো বিভিন্ন ধরনের ফলমূল। ভারত থেকে যেতো বস্ত্র, কম্বল, চিনি, নীল ও ঔষধি গাছ। ক্যারাভানপথে পরিচালিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য মুলতানি সাহু ও দৌলতাবাদের হিন্দু বণিকদের হাতে আবদ্ধ ছিল।[১২]

সুলতানি যুগে দিল্লি ও মুলতানের বাজার অনেকাংশে লাহোর ও মধ্য এশিয়ার ক্যারাভানীয়দের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের ক্যারাভান বাণিজ্যের পতন ঘটে। এর জন্য দায়ী ছিল ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর আবির্ভাব ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার। কিন্তু মধ্যএশিয়া ও ভারতের মধ্যে স্থাপিত ক্যারাভান বাণিজ্য মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণে ব্যাহত হয়। ফলে মুলতান ও দিল্লির বাজারও সংকুচিত হয়ে পড়ে। মোগলদের সময়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেকাংশে সমুদ্রমুখী হয়ে পড়ে। মোগলদের মালাবার উপকূল এবং করোমণ্ডল উপকূলে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুলতানি যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ পরিচালিত হতো জলপথে। সমুদ্রপথে ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। পশ্চিম উপকূলের গুজরাট, দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য এবং পূর্বে বাংলায় উৎকৃষ্টমানের কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য উৎপন্ন হতো। এসব পণ্যের মধ্যে বস্ত্র, রেশম, মসলা, সুগন্ধি তেল, চাল, গম, চিনি, সৌখিন দ্রব্য, দগ্ধদ্রব্য, স্বর্ণালঙ্কার, লোহা ও ইস্পাত এবং দামি মণিমুক্তা পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো এবং ইউরোপ ও আফ্রিকায় রপ্তানি হতো। বিদেশ থেকে আসতো নানা ধরনের সৌখিন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য। ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে আমদানি হতো মখমল, নকশাদার পর্দা, রেশমি ও কিংখাবের কাপড়। তাছাড়া ঔষধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মদ, কাঁচ, সোনা-রুপা, ঘোড়া, ও আফ্রিকার ক্রীতদাস আমদানি হতো। ভারতে গুজরাটি ও মুলতানি হিন্দু বণিকরা অবস্থাশালী হলেও বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের তেমন ভূমিকা ছিল না। পারস্য, মিশর ও আরবের মুসলিম বণিকরা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ দখল করে রাখে। অল্প কিছু খ্রিস্টান, ইহুদি ও পারসিক (জরথ্রুস্টু সম্প্রদায়ের লোক)। এ বাণিজ্যে অংশ নিতো। তারা ভারতের পশ্চিম উপকূলের ক্যাম্বে, এলি, কুইলন, কালিকট ও কোচিন এবং পূর্ব উপকূলের মসুলিপত্তন, নেগাপত্তন এবং বাংলার সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁয়ে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্য পরিচালনা করতো।

সুলতানি যুগের বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব ও পশ্চিম প্রধান দুই ধারায় বিভক্ত ছিল। পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারতের বাণিজ্যতরী ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, মালাক্কা, জাভা ও চীনে ; আর পশ্চিমে পারস্য উপসাগর হয়ে হরমুজ, বসরা ও নিকটবর্তী আল ওবুল্লাতে বাণিজ্যে যেতো। আবার

---

[১১] মিনহাজ ই সিরাজ, *ধযখ্ধ-ঈ-ব্রুঢ়ম্ব*, অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৬।

[১২] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস: সুলতানি আমল* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৫), পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

লোহিত সাগর হয়ে এডেন বন্দরে বাণিজ্য করতে যেতো। এসব বন্দর থেকে ক্যারাভান পথে ভারতীয় পণ্য কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে যেতো। কায়রো ছিল তখন মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী নগরী। এখান থেকে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও রাশিয়ায় ভারতীয় পণ্য পৌঁছে যেতো। শুধু তাই নয়, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ভারতীয় পণ্য ইউরোপে বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে গিয়ে হাজির হতো।

সমুদ্রপথে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন হতো। উল্লেখ্য, ভারতের সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় দেশগুলোর বাণিজ্য ছিল বহুদিনের। আফ্রিকা থেকে এশিয়াতে আসতো প্রধানত ক্রীতদাস। দিল্লির তুর্কি দাসরা সিংহাসন পেলেও তারা সিংহাসন লাভের পূর্বে প্রত্যেকে দাসত্ব মুক্তির ছাড়পত্র লাভ করেছিলেন। সুলতানি যুগে দাসেরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল। সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক শামস দামখানি নামে এক দাসকে গুজরাট প্রদেশ ইজারা দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তিনি বছরে চারশ হাবশি (আবিসিনীয়) দাস দিল্লিতে পাঠাবেন। আমির খসরু বিদেশ থেকে দাস ক্রয়ের কথা বলেছেন এবং হাবশি দাস ও জাঞ্জিরা দাসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। পরবর্তীকালে জাঞ্জিরা সিদ্দীরা মোগলদের নৌবিভাগ পরিচালনা করতো। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফ্রিকার দাসরা দিল্লি, বাংলা ও গুজরাটের শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। বাংলার হাবশি দাসরা কিছুকালের জন্য বাংলার সিংহাসনেও বসে। জৌনপুরের সুলতানরা আফ্রিকার দাসদের বংশধর ছিল বলে মনে করা হয়।[১৩]

সুলতানি যুগে চীনের সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চীনা জাঙ্কগুলো ভারত মহাসাগরে ঐ দেশের পণ্য বহন করে নিয়ে আসতো। চীন রপ্তানি করতো ঔষধ, চীনামাটির বাসনপত্র, চীনের রেশম ও রেশমি কাপড়। ভারত থেকে চীন আমদানি করতো মসলা, কাপড়, গাছগাছড়ার মূল ও অন্যান্য দ্রব্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চীনা ভূগোলবিদ চাওজুকুয়ার রচনায় এই বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। চীনে গোলমরিচের খুব চাহিদা ছিল। মাহুয়ান ও চাওজুকুয়া উভয়ে বলেছেন যে, প্রধানত মালাবার অঞ্চল থেকে গোলমরিচ সংগ্রহ করা হতো।[১৪] চীনা পণ্যের কিছুটা ভারতে বিক্রি হতো এবং বাকিটা পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে চলে যেতো। এখান থেকে চীনা পণ্য ইউরোপ পর্যন্ত রপ্তানি হতো।

মৌসুমি বায়ুর প্রভাব : ভারতের সমুদ্র বাণিজ্য 'মৌসুমি' নামক একটি নিয়মাবদ্ধ বায়ু দ্বারা প্রভাবিত ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (৪৭ খ্রি.) হিপ্পলাস (Hippalus) নামক জনৈক গ্রিক নাবিক সর্বপ্রথম পর্যায়ভিত্তিক এই মৌসুমি বায়ুর গতিপথ আবিষ্কার করেন।[১৫] আফ্রিকার পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ চীন সাগরের মধ্যে নিয়মিতভাবে এ বায়ু প্রবাহিত হয়। দুটি পর্যায়ে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। একটি উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু যা নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু যা এপ্রিলের শেষ হতে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রবাহিত

---

[১৩] তদেব, পৃ. ৩৫২।

[১৪] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন, ১২০০-১৭৫০* (কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬), পৃ. ২৬।

[১৫] E. H. Warmington, *The Commerce between the Roman Empire and India*, 1st pub. London, 1974, Indian ed. (Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1974), pp. 47-48.

হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে ভারতীয় উপকূল হয়ে চীন সাগরের দিকে এ বায়ু প্রবাহিত হয়। মধ্যযুগে এই মৌসুমি বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করেই দেশি-বিদেশি বণিক ও পর্যটকরা ভারত মহাসাগরে তাদের বাণিজ্য জাহাজ চালনা করতো। মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ যতক্ষণ থাকতো ততক্ষণ পর্যন্ত নাবিক ও বণিকরা তাদের জাহাজগুলোকে গন্তব্যের পথে চালিত করতো। বায়ু পড়ে গেলে নাবিক ও বণিকরা নিকটবর্তী কোনো নিরাপদ বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করতো এবং অনুকূল বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতো। এ অপেক্ষা কখনো কখনো মাসের পর মাস চলতে থাকতো। ভেনেসীয় পর্যটক মার্কো পোলো চীন থেকে সমুদ্রপথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে সুমাত্রায় এসে অনুকূল মৌসুমি বায়ুর অভাবে সুমাত্রায় প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান করেছিলেন।[১৬] বস্তুত মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করেছিল।

বৃহৎ জাহাজের ব্যবহার : সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হতো বড় বড় জাহাজ। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় উল্লেখ করেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই বাণিজ্য প্রধানত দুই ধরনের জাহাজের উপর নির্ভর করে চলছিল। একটি চলতো পূর্ব প্রান্তে ও অন্যটি পশ্চিম প্রান্তে। পূর্ব প্রান্তের জাহাজগুলোকে 'জাঙ্ক' এবং পশ্চিম প্রান্তের জাহাজগুলোকে 'ধাও' বলা হতো।[১৭] ধাও প্রকৃতির জাহাজগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল পশ্চিম এশিয়াতে। বিশালাকৃতির ধাও জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরীয় ও উত্তর ইউরোপের শক্তিশালী জাহাজের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। ধাও নামে পরিচিত আরব জাহাজগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং এগুলোর দুপ্রান্তেই দুটি বৈঠা ছিল। আরবে ধাও জাহাজের উৎপত্তি হলেও ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় মুসলমানদের এ ধরনের জাহাজ ছিল। এক একটি জাহাজের ওজন ছিল আধুনিক টনের ১২ টন। এ ধরণের জাহাজ ৭০টি ঘোড়া, ১০০ সৈন্য এবং খালাসি ও যাত্রী বহন করতো।[১৮] পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারসিক দূত এবং পর্যটক আব্দুর রাজ্জাক এ ধরণের একটি জাহাজে চড়ে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। জাঙ্ক ধাও এর তুলনায় কিছুটা বড় ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র ও নিরাপত্তা রক্ষীবেষ্টিত থাকতো। চীনা জাহাজগুলো 'জাঙ্ক' নামে পরিচিত ছিল। তবে মালাক্কার বণিকরাও এ ধরণের জাহাজ ব্যবহার করতো।

বাংলায় পণ্য পরিবহনে ডিঙা নামক বিশালাকৃতির নৌকা ব্যবহৃত হতো । মাসের পর মাস সময় ধরে এদেশের কারিগররা বিশাল আকৃতির ডিঙা তৈরি করতো। বণিকরা অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রে ডিঙার ব্যবহার করতো। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যে এর ব্যবহার বেশি হতো। বাঙালি বণিকরা পণ্য ভর্তি ডিঙা ভাসিয়ে করোমণ্ডল ও মালাবার উপকূলীয় বন্দরে এবং সিংহলে বাণিজ্য করতে যেতো। ইবনে বতুতা লখনৌতির শাসক আলী শাহ এবং বাংলার সুলতানের মধ্যে নৌযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৯] এ ঘটনা বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রমাণ দেয়। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাংলায় তৈরি মধুকর, মধুপাল, দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচুর, ছোটমুঠি, শতগজ, মকরমুখী, রণজয়া, রণভীমা, সর্ব্বধরা, চন্দ্রতারা, নাটশালা, আগল-পাগল, চন্দনপাট, টিঞ্চাধুটি, জাত্রাবর, সুতারেখি, হিঙ্গুলবাড়ি, কাজলরেখি,

---

[১৬] *The Travels of Marco Polo*, intro., Jhon Masefield, First Pub. 1908, Last rpt. (London : J. M. Dent & Sons Ltd., 1954), p. 339 (hereinafter cited as *Maoco Polo*) .

[১৭] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২।

[১৮] *CEHI* , p.128.

[১৯] *Ibn Battuta,* p. 268.

শঙ্খচুর, রত্নমালা, উদয়তারা প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ও আকৃতির ডিঙা এবং নৌকার নাম পাওয়া যায়।[২০]

জাহাজগুলোর নাম দেখে অনুমান করা যায় যে, জাহাজগুলো কোনোটি তৈরি করা হতো বাণিজ্যের জন্য, আবার কোনোটি রণতরী হিসেবে। নৌকার দৈর্ঘ্য, অলঙ্করণ, আকার-আকৃতি এবং ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে জাহাজের নাম রাখা হতো। চীনা বিবরণে বাংলার রাজা কর্তৃক জাহাজ তৈরি এবং সে জাহাজে রাজার লোকদের বিদেশে বাণিজ্য ব্যাপদেশে গমনের কথা উল্লেখ আছে।[২১] চীনের মিং বংশের সরকারি নথি থেকে জানা যায়, বাংলার সুলতান একটি বিরাট জাহাজে করে বাংলার পণ্যসামগ্রী এবং মণিমুক্তা পূর্ণ করে চীন, সুমাত্রা ও ব্রুনিতে এক বাণিজ্য মিশন পাঠিয়েছিলেন।[২২] পর্তুগিজ পর্যটকদের বিবরণেও বাংলার সমৃদ্ধ নৌশিল্পের কথা বর্ণিত হয়েছে। বারবোসা এদেশের নৌশিল্প সম্পর্কে বলেন, এরা (বাঙালি) সকলেই বড় বড় ব্যবসায়ী। এদের নিজেদের বড় জাহাজগুলোর নির্মাণকৌশল মক্কার 'ধাও' জাহাজের ন্যায়, অন্যগুলো চীনদেশের 'জাঙ্ক'-এর মতো। এগুলো খুবই বৃহৎ এবং যথেষ্ট পরিমাণে মাল বহন করে। এসব জাহাজ নিয়ে তারা চোল, মান্দার, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, সিংহল এবং মালাক্কায় যায়।[২৩]

তবে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে ছোট জাহাজের ব্যবহার যে একবারে ছিল না এমন নয়। নানা কারণে ছোট ছোট জাহাজের ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল। বিদেশে রপ্তানির জন্য ভারতের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন হাট-বাজার ও বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পণ্য নদীপথে ভারতের উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলোতে আনার জন্য ছোট জাহাজের ব্যবহার হতো। তাছাড়া পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্যমুখী বৃহদাকার জাহাজগুলো আরব সাগর থেকে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের সরু পথ দিয়ে যেতে পারতো না। বণিকরা আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরে জাহাজগুলো নোঙর করতো এবং মালামাল খালাস করে ছোট ছোট জাহাজে ভর্তি করতো। ছোট জাহাজগুলো নিয়ে তারা লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর বরাবর অগ্রসর হয়ে উপকূলস্থ বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ ভিড়াতো। অতঃপর ছোট জাহাজগুলো থেকে পণ্য খালাস করে তারা ভারবাহী পশু অথবা ক্রীতদাসের পিঠে চড়িয়ে ক্যারাভান পথে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতো।

জলদস্যুদের উপদ্রব : স্থলপথের ন্যায় সমুদ্রপথেও দস্যুবৃত্তি ঘটতো। জলদস্যুদের উপদ্রবে পারসিকরা মাঝেমধ্যে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ রাখতো। এমনকি তারা সমুদ্র তীরেও কোনো বন্দর নির্মাণ করেনি। ভারতীয় পশ্চিম উপকূলভাগ জলদস্যুদের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল। দস্যুতার প্রধান কারণ হিসেবে প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর কে. এন.

---

[২০] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, *চণ্ডীমঙ্গল*, সম্পা. সুকুমার সেন (নয়া দিল্লী : বাংলা অকাদেমি, ১৯৭৫), পৃ. ১৯১, ২২৩ - ২২৪; নারায়ণ দেব, *পদ্মা পুরাণ* (মনসামঙ্গল), সম্পা. তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত (কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭),পৃ. ১৫৮।

[২১] অধীর চক্রবর্তী, " বাংলা ও বহির্বিশ্ব (প্রাগৌপনিবেশিক কাল)", *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪* , ১৯৮৯, পৃ. ৭১।

[২২] অনিল দাস, "বাঙালি কবি ও বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বাঙালির বাণিজ্য", *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪* , ১৯৮৯, পৃ. ১০৮।

[২৩] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ১২০৪-১৫৭৬ (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২০০০), পৃ. ৬৩০।

চৌধুরী এশিয়ার দেশগুলোর বিভাজন এবং রাজনৈতিক অনৈক্যকে চিহ্নিত করেছেন।[২৪] ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের অস্থিতিশীলতার সুযোগে দস্যুরা স্থলভাগে এবং জলপথে সাধারণ যাত্রী এবং বণিকদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ যা থাকতো সব লুট করে নিতো। ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর সুলতানগণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে স্থলপথে দস্যুতস্করের উপদ্রব কমলেও সমুদ্রপথে তা কমেনি। এর কারণ ছিল মূলত ভারতের দক্ষিণ উপকূলভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অভাব। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় সমগ্র দাক্ষিণাত্য তথা সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো বিজিত হলেও সেগুলো প্রায় স্বাধীনভাবে থাকতো। তাছাড়া সমুদ্রপথে কোনো বিদেশি আক্রমণের সম্ভবনা না থাকায় দিল্লির সুলতানগণ নৌবহর গঠনের দিকে গুরুত্ব প্রদান করেননি।

জলদস্যুরা অভিনব উপায়ে দস্যুবৃত্তি করতো। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে জানা যায়, জলদস্যুদের শ'খানেক ছোট ছোট জাহাজ থাকতো। সমুদ্রে কোনো জাহাজকে যেতে দেখলে তারা ছুটে গিয়ে জাহাজটিকে লুট করতো। যাতে কোনো জাহাজ তাদের দৃষ্টি এড়াতে না পারে সেজন্য তারা জাহাজগুলিকে পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর নোঙ্গর করে রাখতো। এতে একশত মাইল জুড়ে কুড়িখানা জাহাজ থাকতো। কোনো জাহাজের জলদস্যুরা দূরে কোনো বণিকের জাহাজকে যেতে দেখলে অমনি তাদের জাহাজে আগুন জ্বালিয়ে বা ধোঁয়া ছেড়ে সংকেতে তাদের অন্যান্য জাহাজগুলোকে জানিয়ে দিতো। অমনি জলদস্যুদের জাহাজগুলো বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছুটে যেতো। মার্কো পোলো গুজরাটের জলদস্যুদের বেপরোয়া ও নৃশংস হিসেবে অভিহিত করে বলেন, যখন তারা কোনো বাণিজ্যজাহাজকে অবরোধ করে, তখন সাগরের পানিতে তেতুঁল গুলে সেই পানি জাহাজের সওদাগরকে জোর করে গিলিয়ে দেয়, যাতে তারা মূল্যবান পাথর, মুক্তা ইত্যাদি গিলে থাকলে সেটা পেট থেকে বের করে দেয়।[২৫]

নৌপথে দস্যুদের মোকাবেলার জন্য জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবাজ রক্ষীদের রাখা হতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় এবং পূর্বদিকস্থ অঞ্চলে সশস্ত্র বাণিজ্য দৃষ্ট হয়। ইবনে বতুতা ক্যাম্বে উপসাগরের মুখে অবস্থিত গান্ধার থেকে মালাবার যাবার প্রাক্কালে চারটি জাহাজ তার সফরসঙ্গী হয়েছিল। তিনি আল উকারি নামক যে জাহাজটিতে তিনি আরোহণ করেছিলেন সেটি একটা যুদ্ধ জাহাজের ন্যায় সুরক্ষিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে এসব জাহাজকে ছাদসহ এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হতো যে জাহাজ চালনার দায়িত্বে নিয়োজিত নাবিক কোনোভাবে শত্রুদের তীর বা নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা আক্রান্ত হতো না। আল জাগির নামক অপর যে জাহাজটি তাঁর সফর সঙ্গী হয়েছিল তাতে ৫০ জন তীরন্দাজ ও ৫০ জন আবিসিনীয় সৈন্য ছিল। ইবনে বতুতা নিজেই উল্লেখ করেছেন, ভারত মহাসাগরে নিরাপত্তার জন্য এ হাবশি অস্ত্রধারীদের ব্যবস্থা। তিনি হাবশিদের সাগরের প্রভু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, প্রতি জাহাজে একজন হাবশি থাকলেই ভারতীয় জলদস্যুরা কাছে এগোতে সাহস পায় না।[২৬]

চীনা জাঙ্কগুলোতে প্রায় ১০০০ লোক থাকতো। কোনো কোনো জাহাজে এক হাজারের বেশি লোক থাকতো। জাহাজে নিরাপত্তার জন্য তীরন্দাজ, ঢালধারী এবং তরল ধাতু নিক্ষেপকারীরা থাকতো। জাহাজের মালিকের সম্মান একজন আমিরের সমতুল্য ছিল বলে ইবনে

---

[২৪] K. N. Chaudhuri, *Trade and Civilization in the Indian Ocean* (Cambridge : Cambridge University Press, 1985), *op. cit.*, p. 14.

[২৫] *Marco Polo*, p. 384.

[২৬] *Ibn Battuta*, p. 229.

বতুতা উল্লেখ করেন। তিনি যখন কোথাও যান, তখন তার সঙ্গে ঢাক, শিঙ্গা প্রভৃতিসহ আবিসিনীয় ক্রীতদাসরা চলে, সাথে সাথে চলে অস্ত্রধারী কিছু লোক এবং তারা তার দু'পাশে দণ্ডায়মান থাকে।[২৭] ইবনে বতুতা বাংলার জাহাজগুলিতে ড্রাম বাজনোর কথা উল্লেখ করেছেন।[২৮] যদিও তিনি এর কারণ হিসেবে জাহাজগুলোর পারস্পরিক অভিনন্দন জানানোর কথা উল্লেখ করেন কিন্তু মধ্যযুগে জলদস্যুদের প্রচণ্ড উৎপাতের সময়ে কেবল অভিনন্দন জানানোর জন্য জাহাজগুলোতে ড্রাম বাজানো হতো ইবনে বতুতার এ মন্তব্য একবাক্যে গ্রহণ করা যায় না। বণিকগণ সম্ভবত জলদস্যুদের আক্রমণ সম্পর্কে অন্য জাহাজগুলোকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের সাহায্য লাভের আশায় ড্রামগুলো বাজাতো।

মুসলিম বণিকদের আধিপত্য : সুলতানি শাসনামলে ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্যে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। বিভিন্ন পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এ সম্পর্কিত বহু তথ্যপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। গুজরাট, মালাবার, করোমণ্ডল এবং বাংলার বণিকরা তাদের নিজস্ব জাহাজে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপকভাবে যাতায়াত করার কথা কে এন চৌধুরী বর্ণনা করেছেন।[২৯] অপর একটি বিবরণে দেখা যায়, এ সময় ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে বাণিজ্য ও জাহাজ পরিচালনায় আরব ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু গুজরাট থেকে পূর্ব দিকে মালাক্কা পর্যন্ত অঞ্চলের নৌচালনা ও ব্যবসা ছিল অনেকটা গুজরাটিদের হাতে।[৩০] তোম পিরেস মালাক্কার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুজরাটি বণিকদের জন্য স্বতন্ত্র শাহ-ই-বন্দর বা পৌর অফিসার নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১] উল্লিখিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনার ভিত্তিতে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আরব ও গুজরাটি মুসলিম বণিকদের প্রাধান্যের বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুলতানি শাসনামলে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে ভারতীয় এবং আরব বণিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল এসময়ে ভারত মহাসাগরে এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রভাব হ্রাস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনে মীং বংশের উত্থানের পর চীনের বৈদেশিক নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। চীন এ সময় পূর্বেকার সামুদ্রিক আধিপত্য বিস্তার নীতি বিসর্জন দিয়ে তার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে এবং ক্রমশ সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পূর্ব অনুমতি ছাড়া চীনা বণিকদের অবাধ সমুদ্রবাণিজ্যে গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, বিশেষত ক্যান্টন বন্দরে বণিকদের গমনাগমনে কড়া বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। চীনা প্রভাব হ্রাস গুজরাটি এবং আরব বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে। তবে সিরীয়, পারসিক, ইটালীয়, তুর্কি ও অন্যান্য দেশীয় বণিকদের ভারতের বাণিজ্যে অংশগ্রহণে কোনোরকমের প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

বিদেশি বণিকদের নিরাপত্তা দান : দিল্লির সুলতানগণ ভারতে বাণিজ্যরত দেশি ও বিদেশি বণিকদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Meilink-Roelofsz বলেন, মালাবার উপকূলীয় বন্দরসমূহে যারা ঘন ঘন আসতো এবং

---

[২৭] Ibid, p. 235.
[২৮] Ibid, p. 271.
[২৯] K. N. Chaudhuri, p. 100.
[৩০] Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence* (Netherland : Martinus Nijhoff, 1962), p. 62.
[৩১] *The Suma Oriental of Tome Pires,* Ed. & trans. A. Cortesao (London : Hakluyt Society, 1944), p. 265.

স্থায়ীভাবে বসবাস করতো তারা নিষ্কর সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মতো বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। কালিকটে বসবাসরত মুসলিম বণিকদের নিজস্ব গভর্নর ছিল। তিনি কালিকটের রাজার হস্তক্ষেপ ছাড়াই শাসন কার্য পরিচালনা করতেন এবং অপরাধের শাস্তি বিধান করতেন। তিনি রাজাকে কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে রাজাকে অবহিত করতে বাধ্য ছিলেন।[৩২] আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য মুসলিম বন্দরে বিদেশি বণিকরা ১২৩৮ সাল থেকে সুলতানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের নিজেদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার ভোগ করছিল।[৩৩]

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শাসকগণ বিদেশি বণিকদের নিরাপদে বাণিজ্য পরিচালনায় সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সুলতান বলবন দস্যুতস্করদের দমনের জন্য পাইকারিহারে হত্যা, তাদের বাড়িঘর জ্বালানো এবং তাদের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত বন জঙ্গলসমূহ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি ঝুঁকিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন ও সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা করেন যাতে স্থলপথে বণিক ও পথিকদের যাতায়াত নিরাপদ হয়। বলবনের রাজত্বকালের দীর্ঘদিন পরেও ভারতের অভ্যন্তরে দস্যুতস্করদের উপদ্রব ছিল না বললেই চলে। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে সমুদ্রপথেও বণিকরা নির্ভিগ্নে এবং নির্ভয়ে বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারতো। ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী ছোট ছোট রাজ্য এবং বন্দরগুলোর উপর সাধারণত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ঐ রাজ্যগুলোর অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। বন্দর ব্যবহার, ভাড়ায় জাহাজ প্রদান, পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, আবাসিক সুযোগ সুবিধা দান প্রভৃতি বাবদ বিদেশি বণিকদের কাছ থেকে উপকূলীয় রাজ্যের শাসক ও বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। ফলে বিদেশি বণিকদের যাতায়াতে এবং পণ্য পরিবহণে যাতে কোনো ঝুঁকির সম্মুখিন হতে না হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ রাখা হতো। প্রায় প্রতিটি স্থানীয় রাজার নিরাপত্তা বাহিনী থাকতো। তারা বিদেশি বণিকদের নিরাপত্তা বিধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

উপহার-উপঢৌকন প্রদান : বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে ভারতীয় সুলতানদের উপহার ও উপঢৌকন বিনিময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। চর্তুদশ শতাব্দীতে চীনের সম্রাট দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তোগলকের নিকট কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে পাঁচশত ক্রীতদাস-দাসী, পাঁচশত রেশমি বুটিদার কাপড়, পাঁচ মন মুখোশ ও পাঁচখানা রত্নখচিত বস্ত্র। এর শুভেচ্ছাস্বরূপ সুলতান ভারত থেকে দু'শত ক্রীতদাস-দাসী, একশত ঘোড়া, পাঁচশত সূক্ষ্ম বস্ত্র ও পাঁচশত রেশমি কাপড়। এর সঙ্গে ছিল সোনারুপার বাসনপত্র, পোশাক, তরবারি ইত্যাদি। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী পারস্যের উজিরকে যে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র, দামি পাথর, সুগন্ধি দ্রব্য ও কিছু পশু-পাখি।[৩৪] এ সময়ে অন্যান্য মুসলিম দেশেও উপহার ও উপঢৌকন প্রেরণের প্রথা জানা যায়। তবে এসব উপহার সামগ্রী প্রেরণ কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য করা হয়েছিল এমনটি ছিল না, কূটনৈতিক উদ্দ্যেশও এর পিছনে কাজ করেছিল বলে মনে হয়। মধ্যযুগে চীন সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে এশীয় দেশগুলোর উপর যে প্রভাব প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেছিল সম্ভবত সেই পটভূমিতেই চীন বিভিন্ন দেশে দূত ও উপঢৌকন প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

---

[৩২] Ibid, p 18.

[৩৩] K.S.Mathew, *Portuguese Trade with India in the Sixteenth Century* (New Delhi: Monohor Pub.,1983), *p.*18.

[৩৪] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৫-২৬।

ভারতের অনুকূলে বাণিজ্য : প্রাচীন কাল থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের অনুকূলে ছিল। সুলতানি ভারতেও এ বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকরা ভারতের বিভিন্ন বন্দরে অবাধে চলাচল করতো এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে পণ্য সংগ্রহ করতো। ভারতীয় বণিকরা সাধারণত পণ্যের বদলে পণ্য নিতে চাইতো না। ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী রপ্তানি হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য সুলতানি ভারতে আমদানি হতো। তাছাড়া ভারত ছিল বিভিন্ন দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। এমন কিছু ছিল না যা এখানে উৎপন্ন হতো না। কিছু বিলাস সামগ্রী এবং এদেশে উৎপন্ন হতো না এমন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে তা ভারতীয়রা সংগ্রহ করতো তবে তা মুদ্রা নিয়ে নয়, পণ্যের বিনিময়ে। উপরন্তু যেসব কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হতো তার সিংহভাগই ছিল ভারতের উৎপাদিত পণ্য। ফলে পণ্য রপ্তানি করে যে অর্থ উপার্জিত হতো তা ভারতেই থেকে যেতো। আর এভাবেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতীয়দের অনুকূলে থাকতো।

উপসংহার

সর্বদিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুলতানি যুগে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয়েছিল। যদিও রাস্তাঘাটের দৈন্য-দুর্দশা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সুলতানগণের পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব (বিশেষত সমুদ্রপথে) কিছুটা হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। সুলতানি ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কি পরিমাণ ছিল তা নির্ধারণ করার যদিও উপায় নেই কিন্তু আধুনিক কালের সঙ্গে তুলনায় যে এ বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল তা অনুমান করা যায়। তবে উপরে প্রদত্ত ভারতীয় বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে এ ধারণা করা অমূলক হবে না যে, সুলতানি ভারতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের এক অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীকে এ দেশে আসতে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করেছিল।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা

মোহাম্মদ মাহবুবুল হক*

Abstract: In the face of military mass killing of the Pakistan government nearly 10 million Bengalis took shelter in the neighbouring India. There refugee teachers were organized and 'Bangladesh Teachers Association' was formed so that they can take part in deferent activities of the Bangladesh Liberation War. The Association brought out several publications so that public opinion in favour of the liberation war could be formed in deferent parts of the world and to provide a proper idea regarding Bangladesh. The Association sent representatives to deferent states of India and abroad to form public opinion in favour of the liberation war. Besides these, campaigning and participating in psychological warfare, rehabilitating the refugee teachers on temporary basis, forming 'Bangladesh Archives' to preserve documents regarding the liberation war, establishing 'camp school' at refugee camps were some of the notable activities of the Association.

ভূমিকা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামরিক গণহত্যার মুখে প্রায় এককোটি বাঙালি প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বের জনমত গঠন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমিতি বেশকিছু প্রকাশনা বের করে এবং অন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে। সমিতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বহির্বিশ্বে প্রতিনিধি ও পুস্তক-পুস্তিকা পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়। এছাড়া সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রচারণা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করা, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, পুস্তক, দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য 'বাংলাদেশ আর্কাইভস' গঠন, বিভিন্ন বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ করা, শরণার্থী শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে শরণার্থী শিবিরসমূহে 'ক্যাম্প স্কুল' প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনায় সহায়তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

* ড.মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্ল্যানিং সেল মুখ্যত সমিতির সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন, এঁদের মধ্যে কয়েকজন শহীদও হয়েছেন। এভাবে বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতি মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা

একাত্তর সালের ২১শে মে কলকাতায় সর্বস্তরের শরণার্থী শিক্ষকদের সমাবেশে 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'[১] (এরপর শিক্ষক সমিতি/ সমিতি)গঠিত হয়। এ সমাবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ আর মল্লিককে সভাপতি করে ২১ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়।[২] উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ৩রা এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উদ্যোগে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'(এরপর থেকে 'সহায়ক সমিতি') গঠিত হয়।[৩] 'সহায়ক সমিতি' এবং 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' একত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে।[৪]

---

[১] 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় গড়া একটি সংগঠনের নামের মত। দেশের যুদ্ধাবস্থায় বিদেশে আশ্রয়লাভকারী শিক্ষকদের একটা অস্থায়ী সমিতি, এর যে একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, নাম থেকে তা বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশ শরণার্থী শিক্ষক সমিতি – এই নামটা আমরা বিবেচনা করেও বাদ দিয়েছিলাম এই ভেবে যে, এতে এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে যেন আমরা ভিক্ষাপাত্র হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি।" – *আমার একাত্তর*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭) পৃ. ১৩২।

[২] সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল নিম্নরূপ: সভাপতি – ড. এ আর মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; কার্যকরী সভাপতি: কামরুজ্জামান, ঢাকা জুবিলি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সংসদ সদস্য; সহ সভাপতি: ড. ফারুক খলিল, অধ্যাপক গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমেদ; সম্পাদক: ড. আনিসুজ্জামান, রিডার বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; পরে জুলাই মাস থেকে ড. অজয় রায়, রিডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সহ সম্পাদক : গোলাম মুরশিদ, রাম বিহারী ঘোষ ও এস.এম. আনোয়ারুজ্জামান; কোষাধ্যক্ষ: ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য ১২ জন। – সাক্ষাৎকার: অজয় রায়, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* (এরপর থেকে *দলিলপত্র* রূপে উল্লিখিত), খণ্ড ১৫, ২য় মুদ্রণ (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,২০০৪) পৃ. ৪৯৪।

[৩] 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ ছিলেন: সভাপতি : অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ, উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; কার্যকরী সভাপতি: অধ্যাপক পি কে বোস, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; কোষাধ্যক্ষ: শ্রী এইচ এম মজুমদার, উপ-উপাচার্য (অর্থ সংক্রান্ত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; সম্পাদক: অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, সিটি কলেজ, কোলকাতা। – Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report, *দলিলপত্র*, খণ্ড ১২, পৃ. ৩৬৬-৩৬৯।

[৪] প্রায় একই সময় এবং পরবর্তীতে বেশকিছু সংগঠন গড়ে ওঠে। সকল স্তরের শরণার্থী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের নিয়ে 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টাশিয়া', শরণার্থী তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির', এছাড়াও 'সাংবাদিক সমিতি' 'চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি', বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর' , 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা', 'বাংলাদেশ

এই সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল: (১) সর্বস্তরের শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা; (২) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতসহ বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা; (৩) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যমূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং এ বিষয়ে অন্য সংগঠনকে সহায়তা করা; (৪) শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুর্নবাসন ও আর্থিক অনুদান প্রদান; (৫) সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ করা; (৬) প্রচারণা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সহায়তা করা;[৫] (৭) শরণার্থী শিবিরবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য ক্যাম্প স্কুল স্থাপন; (৮) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।[৬]

শিক্ষক সমিতি গঠিত হওয়ার পর থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা শরণার্থী শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। ৬,২০০ শরণার্থী শিক্ষক সমিতির তালিকাভুক্ত হন। এঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১৫০, কলেজ শিক্ষক ১০৫০ এবং স্কুল শিক্ষক ছিলেন ৫০০০।[৭]

সমিতি গঠিত হওয়ার পর পর সভাপতি ড.মল্লিকের নেতৃত্বে দু'টি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ড. এ আর মল্লিক ও ড. আনিসুজ্জামান, 'সহায়ক সমিতি'র পক্ষে ড. অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক অনিল সরকার, সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিনিধিদল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধি দলে ছিলেন ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান ও কামরুজ্জামান।

ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিদেশে তাঁদের পরিচিত শিক্ষকদের নিকট পাকবাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতন এবং নিজেদের অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেন।[৮] মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী শিক্ষক সমাজের সহযোগিতা কামনা করে শিক্ষক সমিতি কর্তৃক ড. মল্লিক স্বাক্ষরিত একটি ছাপানো আবেদনপত্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও শিক্ষক সংগঠনের কাছে প্রেরণ করা হয়। 'সহায়ক সমিতি' ভারতীয় শিক্ষক সমাজের কাছে এবং একই সাথে রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর পরামর্শ দেয়।[৯] সমিতি ভারতের মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ

সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির' ইত্যাদি গঠিত হয়। সবগুলো সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করা।

[৫] অজয় রায়, পৃ. ৪৯৪।

[৬] আনিসুজ্জামান, পৃ. ৭৩।

[৭] অজয় রায়, পৃ. ৪৯৫।

[৮] বহির্বিশ্বের শিক্ষকদের নিকট নিজেদের অবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি লিখা শিক্ষকদের মধ্যে ড. আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান, ড. এ আর মল্লিক ছিলেন অন্যতম। ড. আনিসুজ্জামান তাঁর শিক্ষক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড ডিমককে, সৈয়দ আলী আহসান ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফ্রান্সে – কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের সঙ্গে যুক্ত তাঁর বন্ধুদের কাছে; ড.মল্লিক এক সময়ের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের, তখন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক এ এল ব্যাশামকে চিঠি লিখেন। – আনিসুজ্জামান, পৃ. ৬২।

[৯] তদেব, পৃ. ৯৯।

এবং উত্তর ভারতে কয়েকটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। উত্তর ভারতে প্রেরিত প্রতিনিধিদলে ছিলেন ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান ও সুবিদ আলী এম পি এ। 'সহায়ক সমিতি'র পক্ষ থেকে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক – বাণিজ্য বিভাগের অনিল সরকার, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অনিরুদ্ধ রায়, হিন্দি বিভাগের বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এবং সিনেট সদস্য সৌরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এ দলটি এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে।[১০] ড. মল্লিকের নেতৃত্বাধীন এ দলটি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধে অধিকতর সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছাড়াও, প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি পি.এন.হাকসার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে.আর.গণেশ, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি ও মোহন কুমার মঙ্গলম এবং কংগ্রেসনেত্রী নন্দিনী সৎপথী'র (পরে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১১] মধ্যপ্রদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিদলে ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম, ড. অজয় রায় এবং অধ্যাপক সামসুল আলম সাঈদ। জুলাই মাসে প্রেরিত এ দলটি জব্বলপুর, ভূপাল, উজ্জয়িনী, রেয়া, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে।[১২] সেপ্টেম্বর মাসে প্রেরিত মহারাষ্ট্র প্রতিনিধিদলে ছিলেন ড. এ আর মল্লিক ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্সান; সহায়ক সমিতির পক্ষে ছিলেন সুবিমল মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁরা বোম্বেসহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় বক্তৃতা দেন, তাঁরা এবং মহারাষ্ট্রের গভর্নর নবাব আলী ইয়ার জঙ্গের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।[১৩] ব্যাঙ্গালোরে গান্ধী স্মারকনিধির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি গঠিত হয়, এটি বাংলাদেশের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করে।[১৪] একই মাসে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম কেরালা ভ্রমণ করেন। এ ছাড়াও শিক্ষক সমিতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব প্রতিনিধিদল বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক সুধীজনের সংশয় ও দ্বিধা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতিসংঘে প্রেরিত প্রতিনিধিদলে সমিতির সভাপতি ড. এ আর মল্লিক অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে 'সহায়ক সমিতি'র সক্রিয় সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। দুই সমিতির পক্ষ থেকে শিবনাথ ব্যানার্জী আফগানিস্তান, বংশীভাই মেহতা ও সুশীলা মেহতা ইউরোপ, এবং পুর্ণেন্দু নারায়ণ রায় ইউরোপ-আমেরিকায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধান ফাদার পি ফালোঁ ভ্যাটিকান শহরে মহামান্য পোপের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন, জাস্টিস অরুণচন্দ্র দাস লন্ডনে, ইলা মিত্র মস্কোতে বাংলাদেশে পরিচালিত সামরিক গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সমিতি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকদের অস্থায়ী পুনর্বাসন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে যায়। এসব প্রকল্পের মধ্যে শরণার্থী শিবিরসমূহে ক্যাম্প স্কুল প্রকল্প, শরণার্থী পুনর্বাসন

---

[১০] এ প্রতিনিধি দলটি ১০ জুন যাত্রা করে এং ২৭ জুন কলকাতা প্রত্যাবর্তন করে। – তদেব, পৃ. ১০৯।

[১১] তদেব, পৃ. ৯৯-১০৯।

[১২] অজয় রায়, পৃ. ৪৯৭।

[১৩] আনিসুজ্জামান, পৃ.১৫৪।

[১৪] সাক্ষাৎকার: সৈয়দ আলী আহসান, *দলিলপত্র*, খণ্ড- ১৫,পৃ. ৪৭১।

প্রকল্প, শরণার্থী ও যুবশিবিরসমূহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তা প্রকল্প, বাংলাদেশে স্কুল ও কলেজ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদান সমস্যা প্রকল্প, শরণার্থী শিবিরসমূহ থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ প্রকল্প ইত্যাদি ছিল অন্যতম।

১. শরণার্থী শিবির ক্যাম্প স্কুল প্রকল্প: শরণার্থী শিবিরসমূহে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। শরণার্থী শিশু-কিশোররা যাতে বিপথগামী না হয় সেজন্য সমিতি 'ক্যাম্প স্কুল' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব স্কুলে শরণার্থী শিক্ষকদের পুনর্বাসন করাও সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। অক্টোবর মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরগুলোতে ৫১টি ক্যাম্প স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এসব স্কুলে ৭১৪ জন শরণার্থী শিক্ষককে নিয়োগ দান করা হয়।[১৫]

২. শরণার্থী পুনর্বাসন প্রকল্প: এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল শরণার্থীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ শেষে শরণার্থীদের দ্রুত পুনর্বাসনের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ। এ প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন প্রফেসর মোশাররফ হোসেন। ড. মল্লিকের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক শরণার্থী পুনর্বাসন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।[১৬]

৩. শরণার্থী ও যুবশিবিরসমূহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তা (Sociocultural Dynamics): এর পরিচালক ছিলেন ড. এ আর মল্লিক এবং উপ-পরিচালক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড.অনুপম সেন।

৪. বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকারের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন ড. অজয় রায়। এ প্রকল্পের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

৫. শরণার্থী শিবিরসমূহ থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ, এ প্রকল্পের পরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সরকারের প্লানিং সেলের সহযোগিতায় এসব প্রকল্প তৈরী করা হয়। সমিতি এসব প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী শিক্ষকদের পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। সহায়ক সমিতি ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC),[১৭] 'পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি', মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় শাখা এসব কর্মসূচিতে অর্থ ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করে।[১৮]

---

[১৫] Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report, April-December,1971. *দলিলপত্র*, খণ্ড ১২, পৃ.৩৬৭। এ প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন কামরুজ্জামান। এছাড়া প্রতি এলাকায় একজন করে উপ-পরিচালক ছিলেন। সার্বিক দায়িত্ব ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি ছিল যার সদস্য ছিলেন : ড. অজয় রায়, নুর মোহাম্মদ মিঞা এবং চন্দ্রিমা রায়। – অজয় রায়, পৃ. ৪৯৭।

[১৬] শামসুল হুদা চৌধুরী, 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি', মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, খণ্ড ৩, (ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৫৯।

[১৭] IRC 'র স্থানীয় প্রতিনিধি তরুণ মিত্র, জয় বিকাশ নারায়ণ প্রমুখ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন।

[১৮] অজয় রায়, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮।

শিক্ষক সমিতি 'সহায়ক সমিতি'র সহযোগিতায় ভারতের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে নিযুক্তিতে সহায়তা করে।[১৯] শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রেরিত বেশকিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষক মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করে।

শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতসহ বৈশ্বিক জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক প্রকাশনা বের করে এবং অন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১. *Bangladesh: A Reality*, ২. *Report on Bangladesh*, ৩. *মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি* – (এ তিনটি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত), ৪. *Bangladesh—The Truth*, ৫. *Conflict in East Pakistan*, ৬. *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, ৭. *আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী* – শেখ মুজিবুর রহমান, ৮. *Bangladesh—Throse of A New Life*, ৯. *Pakistanism and Bengali Culture*, ১০. *Bangladesh—Through the Lens*, ১১. *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ১২. *Bleeding Bangladesh* (এ ক'টি 'সহায়ক সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত), ১৩. *Bangladesh: The Background* (পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত), ১৪. *রক্তাক্ত বাংলা* (মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ) কর্তৃক প্রকাশিত), ১৫. *জাগ্রত বাংলাদেশ* - আহমদ ছফা (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত), ১৬. *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* - গাজিউল হক (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং কোলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত)। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সমিতি বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি ও গণহত্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন দেশের নেতা-নেত্রী, সাংসদ এবং বিদেশী সংবাদপত্রে পাঠানো হয়। এই তৎপরতার ফলে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে।[২০]

শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য 'বাংলাদেশ আর্কাইভস' গঠন করে।[২১] তাছাড়া 'সহায়ক সমিতি' ভারত ও

---

[১৯] নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন: পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শামসুল হক(পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম (বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), হিমাচল প্রদেশের ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে ড.এ এ জিয়াউদ্দিন আহমদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শহিদুল ইসলাম, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে সুব্রত মজুমদার প্রমুখ। – অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৩; আনিসুজ্জামান, পৃ. ৮০।

[২০] অজয় রায়, পৃ. ৪৯৮; Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report – *দলিলপত্র*, খণ্ড ১২, পৃ. ৫১৩, ৫১৮, ৫২৪; অমর সাহা, পৃ. ৪৪।

[২১] এর পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোহাম্মদ আবু জাফর, ড. সফর আলী আখন্দ, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, শামসুল আলম সাঈদ প্রমুখ। – আনিসুজ্জামান, পৃ. ৭৪।

বহির্ভারতের সংবাদপত্র, জার্নাল প্রভৃতি থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য 'বাংলাদেশ তথ্য ব্যাংক' গঠন করে।[২২]

শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন সহযোগী সহায়ক সংগঠনের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ক. সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অনুদান, খ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কম্বল, শীতবস্ত্র, পোশাক, জুতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গন ও যুবশিবিরে প্রেরণ করা, গ. যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ। শিক্ষক সমিতি এবং 'বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর' [২৩] যৌথভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'সহায়ক সমিতি'র উদ্যোগে গঠিত 'মেডিকেল ইউনিট' এ ব্যাপারে সমিতিকে সর্বাধিক সহায়তা করে।[২৪]

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক লতিফ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি' বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অর্থ মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক সমিতির সাথে যোগাযোগ করে। উক্ত সংগঠনের একজন প্রতিনিধিকে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে দেওয়া হয়। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভারতীয় জাতীয় কমিটির কার্যকরী সম্পাদক শ্রী ভি. এন. থিয়াগ রাজন মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য সমিতির সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করে দেয়া হয়।[২৫]

উপরোক্ত তৎপরতা ও প্রচেষ্টায় 'সহায়ক সমিতি' ছাড়াও-'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি', 'বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি', 'ন্যাশনাল কো- অর্ডিনেশন কমিটি ফর

---

[২২] প্রথমে এর পরিচালক ছিলেন জামিল চৌধুরী পরে ড. এ.আর. মজুমদারকে এ দায়িত্ব.দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল। এ প্রকল্পে প্রবীণ ভারতীয় সাংবাদিক দুর্গাদাস তরফদার এবং রাম রায় সহযোগিতা করেন। যুদ্ধশেষে তথ্য ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত সমগ্র তথ্যাবলী ঢাকা যাদুঘরকে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্কাইভস কর্তৃক সংগৃহীত কাগজ-পত্রাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। – অজয় রায়, পৃ. ৪১৯।

এ আর্কাইভস সম্পর্কিত কোন দলিলপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। 'বাংলাদেশ আর্কাইভস'এর সম্পাদক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর। 'বাংলাদেশ আর্কাইভস'র দলিলপত্র সম্পর্কে তিনি এ প্রবন্ধকারকে বলেন যে দলিলপত্রগুলো তিনি ড, মাহমুদ শাহ কোরেশীকে দিয়েছিলেন। ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী সেগুলো স্বাধীনতার দলিলপত্রে ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে দলিলপত্রগুলোর লেনদেন হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয়।

[২৩] 'বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর' এর পরিচালক ও উপ-পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে আমীর উল ইসলাম ও মামুনুর রশীদ। ড.আনিসুজ্জামান বলেন যে আমীর উল ইসলামের কারণে এটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিদেশি আনুকূল্য লাভ করেছিল। – *আমার একাত্তর*, পৃ. ৭৫।

[২৪] এ কার্যক্রমে নিত্যগোপাল সাহা, সুকুমার বিশ্বাস, ইমরুল কায়সার প্রমুখ নিরলসভাবে কাজ করেন। 'সহায়ক সমিতি'র মেডিকেল ইউনিট ভারতীয় রেডক্রসের সহযোগিতায় এবং শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অব্যাহতভাবে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।– অজয় রায়, পৃ. ৫০০।

[২৫] অজয় রায়, পৃ. ৫০০।

বাংলাদেশ', শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিচালিত 'বাংলাদেশ এইড কমিটি' সমিতিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে।

শিক্ষক সমিতি যুব শিবির কর্মাধ্যক্ষদের অনুরোধে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষককে যুব শিবিরে প্রেরণ করে। নিযুক্ত শিক্ষকগণ নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। সমিতির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজও করেছেন। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক আবদুল হাকিম ও সম্পাদক অজয় রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও প্রচারণা কাজেও সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। এ কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ড. বেলায়েত হোসেন।[২৬]

বাংলাদেশ সরকার সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনায় সহায়তা দেয়ার জন্য প্ল্যানিং সেল গঠন করে। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণার্থী শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই এ সেল পরিচালিত হয়। এ সেলের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী। অন্যান্য সসদ্যরা হলেন: অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন (অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আনিসুজ্জামান (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড. এস আর বোস। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় রায় বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্লানিং সেলের শিক্ষা বিভাগের সাথে সংযুক্ত ছিলেন।[২৭]

আগস্ট মাসের শুরুতে রাষ্ট্রদ্রোহ, প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে পাকিস্তানের কারাগারে অবরুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার করার সংবাদ প্রচারিত হয়। আশঙ্কা করা হয় যে বিচারের প্রহসন করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করাই পাকিস্তানি শাসকচক্রের উদ্দেশ্য। শিক্ষক সমিতি এবং 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া' যৌথভাবে ১৩ই আগস্ট কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের সামনে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। বিক্ষোভ মিছিল শহরের বেশ কিছু অংশ প্রদক্ষিণ করে। এই বিচার প্রহসন বন্ধ করা এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে কলকাতার সকল বিদেশি দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এর পর পরই পৃথিবীর নানা স্থানে বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে এবং বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ হতে থাকে।

সিনেটর এড্ওয়ার্ড কেনেডি আগস্ট মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শরণার্থীদের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন। ড. এ আর মল্লিকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ৪৪ জন শরণার্থী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের অবস্থা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের সমর্থন কামনা করা হয়। এই স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে প্রেরণ করা হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার জুলাই মাসে দিল্লী সফরে আসেন। সমিতির প্রতিনিধি ড. মযহারুল ইসলাম দিল্লীতে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তনের দাবিতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। কিন্তু তারপরও মার্কিন সরকারের

---

[২৬] তদেব, পৃ.৫০১।

[২৭] তদেব, পৃ. ৫০২।

বাংলাদেশ বিরোধী নীতি এবং পাকিস্তান সরকারকে নানাভাবে সহায়তা দান অব্যাহত থাকে। এই নীতির প্রতিবাদে সমিতির পক্ষ থেকে পুনরায় কলকাতাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে নিক্সন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[২৮]

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকার শরণার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য আহ্বান জানান। শ্রীমতী গান্ধী যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আশ্বাস দেন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসব্যাপী অনেক বিদেশি হিতৈষী এবং বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক পরিদর্শক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নানাভাবে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। জুন মাসে আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটির (IRC) পক্ষে অ্যাম্বাস্যাডার অ্যাঞ্জিয়ার বিড্‌ল ডিউক, মর্টন হামবুর্গ (General Counsel-IRC), মিসেস লী থ (Director, IRC), ড. দানিয়েল এল. ওয়াডনার (Prof. of Surgery, Albert Finst College of Medicine N.Y), এবং সাহিত্যিক টমাস ডব্লিউ ফিপস প্রমুখ সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। IRC সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পে বিশেষ করে ক্যাম্প-স্কুল প্রকল্প, আর্কাইভস সংক্রান্ত প্রকল্প, লোক সাহিত্য প্রকল্পসহ সমিতি ও শরণার্থী শিক্ষকদের নিজস্ব প্রকল্পে সহায়তাদান করে।

জাপানের 'বাংলাদেশ সলিডারিটি ফ্রন্ট'র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সেৎসুরে সুরুসিমা, 'জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ অ্যাসোসিয়েশন'র কার্যকরী সংসদের সদস্য টি, সুশুকি এবং টিভি ক্যামেরাম্যান তেমিসুকা সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ.এল.বাসাম জুন মাসে সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন এবং তাঁকে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন।

জেনেভা ভিত্তিক 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' এর সভাপতি অধ্যাপক ন্যুড নেইলসন এর জ্যাক ল্যাকশির্ক সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদেরকে কয়েকটি শরণার্থী শিবির ঘুরিয়ে দেখানো হয়।

স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলির কয়েকজন সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাঁদেরকে মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।[২৯]

নিউজিল্যান্ড ইয়্যুথ ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সম্পাদক ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে অ্যালভিন এফ. আর্নল্ড ও ট্রেভন জে. ওয়াল্টন ৩০ নভেম্বর সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের একাত্মতা প্রকাশ করেন।

---

[২৮] তদেব।

[২৯] এঁদের মধ্যে স্টকহোমের এস এ নেলসন, ডেনমার্কের এ, এম স্কিপার ও ভি এস বি বলকার্ট, সুইডেনের এম.আই.ওজহা প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। – অজয় রায়, পৃ. ৪০৩-৪০৪।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় গঠিত Friends of the Bangladesh Movement-এর পক্ষ থেকে মিসেস এভলিন চৈৎকিন কলকাতায় এলে তাঁকে বিভিন্ন ক্যাম্প স্কুল ঘুরিয়ে দেখানো হয়। তিনি এই প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ব্যাপী অনেক সহায়ক সংগঠন শিক্ষক সমিতিকে নানাভাবে সহযোগিতা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের গ্রেফতারের সংবাদে সমিতির নেতৃবৃন্দ বিচলিত হয়ে পড়েন। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির (IRC)[৩০] মাধ্যমে, বিভিন্ন দূতাবাসে ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে (জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলসহ) জরুরি বার্তা পাঠিয়ে ঢাকা কর্তৃপক্ষকে চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে গ্রেফতার হওয়া শিক্ষকদের জীবন যেন নিরাপদ থাকে।

শরণার্থী প্রায় সকল শিল্পীই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শরণার্থী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকরা এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। বেশ কিছু শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, এঁদের অনেকে শহীদও হয়েছেন।[৩১]

---

[৩০] ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির (IRC) স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী তরুণ মিত্রের সঙ্গে আমেরিকান মহলের বেশ জানাশুনা ছিল। তাঁকে দিয়ে (IRC) এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ঢাকা কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে- অন্তত তাদের জীবন যেন নিরাপদ থাকে।

[৩১] প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান, কমার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আবুল কালাম আজাদ, সমাজ বিজ্ঞান, ঢা.বি.; গৌরাঙ্গ মিত্র, নটরডেম কলেজ; নুরুন্নবী, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোয়াজ্জেম হোসেন, বাগেরহাট পি. সি. কলেজ; আবু বকর সিদ্দিকী, আয়ুব ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী; হামিদুল হক, কুচুয়া হাই স্কুল, অধ্যাপক হান্নান। এঁদের মধ্যে মোয়াজ্জেম হোসেন ও আবু বকর সিদ্দিকী শাহাদৎবরণ করেন। (অজয় রায়, পৃ. ৫০১।) আতিয়ুর রহমান, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; মোহাম্মদ মিঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এস.এম.আনোয়ারুজ্জামান প্রধান শিক্ষক, লোহাগড়া হাই স্কুল, যশোর; হেমায়েত উদ্দিন, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর; জিল্লুর রহমান, কামারগ্রাম, ফরিদপুর; নূরুল আরেফীন; আবদুল মালেক, ফরিদপুর; আমিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক, ইতনা হাই স্কুল, যশোর; হীরু মাস্টার, শিক্ষক, ইতনা হাই স্কুল, যশোর; লুৎফর রহমান, কোলা, যশোর; শাহজাহান মিঞা, খুলনা; কাজী আবদুল হাফিজ, প্রধান শিক্ষক, তেরখাদা হাই স্কুল, খুলনা; বোরহান উদ্দিন, শিক্ষক, তেরখাদা হাই স্কুল, খুলনা; আবদুস সাত্তার, নোয়াপাড়া হাই স্কুল, যশোর; আবদুস সালাম, কালিয়া হাই স্কুল, যশোর; মোশারফ হোসেন, গ্রাজুয়েট হাই স্কুল, ঢাকা; ওয়াহিদুর রহমান, অধ্যক্ষ, লোহাগড়া কলেজ, যশোর; আবু সুফিয়ান, অধ্যাপক দৌলতপুর কলেজ, খুলনা; আবুল কালাম আজাদ, তৎকালীন সভাপতি, প্রাইমারী শিক্ষক সমিতি (বাংলাদেশ); আইয়ুবুর রহমান, অধ্যাপক রামদিয়া কলেজ, ফরিদপুর; দেবদাস ঘোষাল, জুবিলী হাই স্কুল, ঢাকা; শ্রী অমল ব্যানার্জি, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা, মোসলেম উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুল। – শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ. ৬০-৬১।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন ও 'দৈনিক ইত্তেফাক'

মো. আনোয়ারুল ইসলাম*

Abstract: The Six-point Movement in 1966 is very important in the history of Bangladesh. The Awami League started six point movement under the Leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The *Daily Ittefaq* popularized the movement among the general people of the then East Pakistan. This article throws light on the above aspect of the *Daily Ittefaq* in the movement regional autonomy.

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অনীহা এবং এ অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি নানা ধরনের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি অপ্রকাশিত হলেও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পর থেকে তা ক্রমশ দৃশ্যমান হতে থাকে। এ পর্যায়ে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে নিজেদের চরম অবহেলিত হিসাবে বিবেচনা করতে থাকে। বাস্তবিক অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যমূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি দেখা যায়।[১] এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং তা নিরসনে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করে। বাঙালিরা এ সময় থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, পাকিস্তানের বাজেটের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বরাদ্দ করে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চাকুরি, শিল্প, কল কারখানা ইত্যাদির অর্থনৈতিক সুবিধা কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে।[২] অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ ক্রমান্বয়ে বাঙালির মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এই সময়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো ক্রমশ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ফাতেমা জিন্নার অনুকূলে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণা চালান। তিনি জনগণের মধ্যে আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র ও সরকারবিরোধী মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচারণা কাজে লাগান।[৩] এছাড়াও

---

*ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম', সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ভাষণে এ তথ্য দেওয়া হয়। উদ্ধৃত, নীলিমা ইব্রাহীম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *মুক্তি সংগ্রাম* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২), পৃ. ৯৭।

[২] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ৬৫।

[৩] মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ১৭৮।

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের মধ্যেও ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। আওয়ামী লীগ তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পূর্বেকার অবস্থান বজায় রেখে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করে।[৪] মওদুদ আহমদ যথার্থই লিখেছেন: 'এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি ঘরে ঘরে আলোচিত হতে থাকে। ... পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার ছিল আলোচনা ও ক্ষোভের প্রধান বিষয়বস্তু'।[৫] আর এই অর্থনৈতিক বৈষম্যই আইয়ুবী শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল কারণ যা স্বায়ত্তশাসনের দাবির পক্ষে অবস্থানকারী রাজনীতিবিদদের অবস্থান শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচার করার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। বস্তুত আওয়ামী লীগের এই ছয় দফাকে বাংলার জনগণ তাদের 'প্রাণের দাবি বা বাঁচার দাবি' হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফার মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:[৬]

১নং দফা

এই দফা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়ার কথা বলা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন-সভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২নং দফা

এই দফায় প্রস্তাব করা হয় যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকবে।

৩নং দফা

এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অলটারনেটিভ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪নং দফা

এই দফায় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক

---

[৪] লেলিন আজাদ, *উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান: রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি*,(ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৭), পৃ. ৪৩৭।

[৫] মওদুদ আহমদ, পৃ. ৬৫।

[৬] . মোঃ মাহবুবর রহমান, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যাল জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতমূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫নং দফা

এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে,

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে,

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হতে হবে,

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলবে,

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সমন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশ ট্রেড শিন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬নং দফা

এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী সুপারিশ করা হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে ও আত্মনির্ভর করতে হবে।[৭]

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকটি। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক ইনসাফ ও দৈনিক সংবাদ*। পত্রিকাগুলো কোনো না কোনোভাবে মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল। ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সূচনালগ্নে আওয়ামী মুসলিম লীগের সমর্থক কোনো পত্রিকা ছিল না। বরং এই দলের বিরুদ্ধে লেখার পত্রিকাই ছিল বেশি। তাই মওলানা ভাসানী *ইত্তেফাক* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন।[৮] ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে এক ঘরোয়া সভায় মওলানা ভাসানী পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন। পত্রিকার তহবিল গঠন করার জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যদের কাছে থেকে চারশত টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। পরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আরো চাঁদা আদায় করা হয়। বস্তুত এই টাকা দিয়েই ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* আত্মপ্রকাশ করে। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সরকারি নিবন্ধন নং ছিল ১৭৯। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এর অফিস ছিল ৭৭ নং মালিটোলা, পরে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিস থেকেই পত্রিকাটি বের হত। শুরুতে মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি বের করেন। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের* শুরুতে সম্পাদক ও

---

[৭] মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

[৮] ইত্তেফাক শব্দের অভিধানিক অর্থ মিল, ঐক্য, একতা, সম্প্রীতি।

প্রকাশক ছিলেন মওলানা ভাসানী। কিছুকাল পরে প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। সবশেষে এর সম্পাদক নিযুক্ত হন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।[৯]

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশ তদানীন্তন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রার সংযোজন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন লিয়াকত আলী খান অথবা খাজা নাজিমুদ্দীনকে দেশ পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেন, *ইত্তেফাক* সেই বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে, পরিসংখ্যান দিয়ে সাবলীল করে তুলত। প্রথাগত সাংবাদিকতার গণ্ডি ডিঙিয়ে *ইত্তেফাক* নতুন মাত্রা যোগ করে। উক্ত পত্রিকায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া লিখতেন মুসাফির ছদ্মনামে নিজস্ব কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ' রাজনৈতিক কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে উল্লিখিত রচনা বা প্রতিবেদন ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের* এই দ্রুত জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কে জি মুস্তাফা বলেছেন:

সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের শুধু 'পাঠক' ছিল এমন নয়, শ্রোতাও ছিল। হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, মাতবরের বাড়ির দাওয়ায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বহু সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে জোরে জোরে পড়া হত। নিরক্ষর শ্রোতারা গভীর মনোনিবেশ সহকারে খবর, তার বিশ্লেষণ, মওলানা ভাসানীর আগুনঝরা ভাষণ, হোসেন সোহরাওয়ার্দীর চুলচেরা বিশ্লেষণে সরকারের মুখোশ উন্মোচন এসবই পাঠক ও শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। মানিক মিঞার রাজনৈতিক মঞ্চে চয়ন করা বিশেষ বিশেষ শব্দ গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করত, তাদের চিন্তার খোরাক যোগাত।[১০]

এর মধ্যে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা উজ্জীবনের পুরোধা এই সাপ্তাহিকীটিকে পালন করতে হচ্ছিল এমন এক দায়িত্ব যেটা কোনো সাপ্তাহিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। অবশেষে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সার্বিক দায়িত্ব ও সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।[১১] *দৈনিক ইত্তেফাক* তার আত্মপ্রকাশ কালেই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ধারক হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেফাকের* 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল:

"*দৈনিক ইত্তেফাক* বাহির হইল। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের* মাধ্যমে আমাদের যে ক্ষুদ্র উদ্যম এই দেশের অগণিত মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল আজ উহারই দৈনিক সংস্করণ। মানুষের জীবন জীবিকা ও আজাদী সংগ্রামের নিশানাদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল। আমরা বহুবার বলিয়াছি উদ্যম যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, শক্তি যতই খণ্ড হউক না কেন, সেই খণ্ড ক্ষুদ্রও শক্তির আধার হইতে পারে যদি উহা প্রকৃতপক্ষেই গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের এই আত্মপ্রত্যয়, আমরা সার্থক করিতে পারিয়াছি কিনা গোটা দেশই তাহা বিচার করিবে। কিন্তু আমরা আমাদের চলার পথে যে সকল শুভানুধ্যায়ীর শুভাশিস পাইয়াছি আজ এই মুহূর্তে আমরা উহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। আর স্মরণ করিতেছি সেই অগণিত নির্যাতিত মানুষকে যাহাদের মৌন ভাষা মুখর হইয়া আমাদিগকে শক্তি দিয়াছে, যাহাদের বজ্র কঠোর দাবি

---

[৯] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা ভাসানী* (ঢাকা: এস,এ, মাহমুদ, ১৯৮৬), পৃ.৭৩।

[১০] কে জি মুস্তাফা, "বিরোধী দলীয় রাজনীতির বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা", *বিশেষ বক্তৃতামালা*, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ৭-৮।

[১১] এম আর আখতার মুকুল, "চার দশকের স্মৃতি", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৯৩।

আমাদের চলার পথে জালেমদের হামলাকে হারাম করিয়া আমাদের বাহুকে দৃঢ় করিয়াছে তাই আজ আমাদের নতুন শপথ বঞ্চিতের বঞ্চনার ব্যর্থ ক্ষোভ নহে—নির্যাতিত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।[১২]

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে। যার নেপথ্যে প্রচারণার এক বিশাল দায়িত্ব পালন করে *দৈনিক ইত্তেফাক*। বলা বাহুল্য, ১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলা থেকে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মুসলিম লীগ বিরোধী দলীয় পত্রিকা হিসেবে জনসাধারণ ইত্তেফাক পত্রিকাকেই বুঝত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন একমাত্র মালিক সম্পাদক যিনি সম্মুখ সমরে লড়েছেন সংবাদপত্রের স্বাধিনতা, গণতন্ত্র ও বাঙালি জনসাধারণের স্বাধিকার আন্দোলনের স্বপক্ষে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে *দৈনিক ইত্তেফাকের* অবদান ছিল অপরিসীম। ৬ দফার প্রচারণা সম্পর্কে ইত্তেফাক ও এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার অবদান সর্ম্পকে যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেছেন, " ... ১৯৬৬ সাল। ৬ দফা আন্দোলনের প্রবল জোয়ারকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে আইয়ুব সরকার আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। এর কিছুদিন পর মানিক ভাইও জেলে এসে মিলিত হলেন আমার সাথে। ৬ দফা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁকেও আটক করা হয়েছে; বাজেয়াফত করা হয়েছে ইত্তেফাকের ছাপাখানা।[১৩] সংবাদপত্র যে জাতীয় জাগরণের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ইত্তেফাক সেটাই প্রমাণ করেছে।

ছয় দফা ও *দৈনিক ইত্তেফাক*

আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হলে সংবাদপত্রগুলোর ক্ষেত্রেও একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। মুসলিম লীগ সমর্থক এবং ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন পত্রিকাগুলো এই দাবি উত্থাপনকে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে খণ্ডে পরিণত করার কৌশল বলে মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের দিকে যখন ছয় দফার দাবিতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন *দৈনিক আজাদ* তার 'রাজনৈতিক গোলক ধাঁধা' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য বলেছিল:"অবস্থাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া হইতেছে যে, মনে হইতেছে কয়েকটি প্রশ্নের আশু মীমাংসা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সে প্রশ্ন গুলি হইতেছে: ১। পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে, না খণ্ডিত হইয়া পড়িবে। ২। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে, না আঞ্চলিক বিচ্ছন্নতার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। ৩। পাকিস্তান অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইবে, না গৃহযুদ্ধের অশুভ পথে নামিয়া পড়িবে। ... যে কোনো পক্ষ হইতে দেশের অবস্থা সম্পর্কে এ ধরণের প্রশ্ন তুলিয়া ধরা হইলে তাহা চরম বিপজ্জনক অবস্থা বলিয়া বিবেচিত না হইয়া পারে না।"[১৪] সরকার সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* 'Time for Action' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছিল: "All right thinking

---

[১২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।

[১৩] শেখ মুজিবুর রহমান, "আমার মানিক ভাই", *দৈনিক ইত্তেফাক*, তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৭৩, পৃ. ৩।

[১৪] *দৈনিক আজাদ*, ৯ এপ্রিল, ১৯৬৬। আরো দেখুন, সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৮১-৯২।

persons will join resident Ayub Khan in his call to fight against those who want to disrupt national unity for their personal end."[১৫]

কিন্তু ছয় দফা দাবিকে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রথম থেকেই সমর্থন জানায়। এজন্য আন্দোলনকে জোরালো করার জন্য জনমত সৃষ্টির ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। এমরান জাহানের মতে, "পরবর্তী সময়ে তফাজ্জল হোসেন এবং *দৈনিক ইত্তেফাক* ছয় দফার একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হন। দৈনিক ইত্তেফাকের ধারাবাহিক প্রচারের ফলেই ছয় দফার পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে।"[১৬]

১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রচারণায় *দৈনিক ইত্তেফাক* ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মুখপত্র। এ প্রসঙ্গে জনৈক সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন:

"বিরোধী দল সমূহের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন একটি মাইল ফলক। ... এই সময় থেকে শেখ মুজিব সারা প্রদেশে ঝটিকা সফর করে ৬ দফা জনপ্রিয় করে তুলতে ব্রতী হন। শেখ মুজবিের প্রতিটি সভার রিপোর্ট *ইত্তেফাকে* সবিস্তারে প্রকাশিত হয় এবং পাঠক সেগুলি তুমুল উদ্দীপনার মধ্যে পাঠ করতে থাকে। অন্যান্য পত্রপত্রিকাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শেখ মুজিবের খবর প্রকাশ করে, কিন্তু *ইত্তেফাক* তার নিজস্ব ভঙ্গীতে দলীয় সভাপতির ভাষণ ও গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী যেভাবে পরিবেশন করতে থাকে তেমনভাবে অন্য কোনো পত্রিকা করেনি।"[১৭]

বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিক্রিয়া পরিপ্রেক্ষিতে ছয় দফার সারবত্তা প্রমাণ করার জন্য ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার বিবরণ *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকাতে বিশাল গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে।[১৮] ওই সাংবাদিক সম্মেলন সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* মন্তব্য করেছিল:

"... রাজনীতিতে মধ্যপন্থা বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ৬-দফা কোনো রাজনৈতিক দর-কষাকষি নয়, কোনো রাজনৈতিক চালবাজীও নয়- এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত।"[১৯]

দৈনিক ইত্তেফাক ছয় দফার প্রচারণার বিষয়টিকে প্রথম থেকেই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিল। রাজনৈতিকভাবে ছয় দফা দাবিকে ইতোমধ্যে একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান একটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যার ফলে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সারাদেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের ২০ শে মার্চ থেকে ৮ই মে তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৫০ দিনে তাঁকে ৩২টি জনসভায় ভাষণ দিতে হয়। আওয়ামী লীগের জনসভার বিজ্ঞপ্তি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকাতে ফলাও করে প্রচার করা হয়। এমন কি সময় সময় বক্স আকারে প্রথম পাতার মাঝামাঝি তা ছাপা হতো। যেমন ১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখের জনসভার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল এভাবে: অদ্য রবিবার

---

[১৫] *মর্নিং নিউজ*, ২১ এপ্রিল ১৯৬৬।

[১৬] এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৭৫।

[১৭] কে জি মুস্তাফা, পৃ. ১৭।

[১৮] আওয়ামী লীগের ১৫ নং পুরানা পল্টন অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়।

[১৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ছয় দফার দাবিতে বিরাট জনসভা—স্থান: পল্টন ময়দান—সময়: বৈকাল ৪ ঘটিকা, বক্তৃতা করিবেন: শাহ আজিজুর রহমান, মেসার্স জহিরুদ্দীন, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, তাজউদ্দীন আহমদ, রফিকুল হোসেন প্রমুখ।"[২০] ছয় দফার পক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রচারণা সম্পর্কে এমরান জাহান মন্তব্য করেছেন, "শুধু এক সপ্তাহের (২১ থেকে ২৬ তারিখ) প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠার নিউজ আইটেমগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তা একমাত্র ছয় দফা এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়েছে।"[২১] এ সময় ছয় দফার দাবি দাওয়াকে কোনো কোনো প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিরোধিতা করে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাদের উদ্দেশ্যে *দৈনিক ইত্তেফাক* তার এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিল:

"আমরা আর নেতাদের ঐক্যে বিশ্বাস করি না। আমরা জনগণের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং জনগণের ঐক্য কায়েমের প্রত্যাশী। আমরা চাই, তথাকথিত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটুক এবং রাজনীতি মানুষের অধিকারে আসুক। বিবেকের দংশন যিনি অনুভব করেন, আসুন আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে সমুন্নত করিয়া তুলুন।"[২২]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছয় দফার বিরোধিতার যুক্তি খণ্ডন করে মুসাফির তাঁর রাজনৈতিক মঞ্চ কলামে লিখেছিলেন:

"... লক্ষ্য করিলাম যে, সরকারি তরফের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হইবার পূর্বে কতিপয় বিরোধী দল ৬ দফা প্রোগ্রামের প্রতি আক্রমণ শুরু করিলেন। ... ৬ দফার যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের প্রধান দুর্বলতা হইল যে তাঁরা ৬ দফার বিষয় বস্তু লইয়া আলোচনা করিতেও ভয় পান, তাঁদের মুখে একটি শ্লোগান যে, ইহা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবে। কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যালোচকেরা লক্ষ্য করিতেছেন যে, ৬ দফা প্রোগ্রামে অপর কাহারও প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় আচরণের কিংবা অন্য কাহারও ন্যায্য স্বার্থে হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রস্তাব নাই।"[২৩]

ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে আইয়ুব খান রাজনৈতিক ভাবে দমননীতির প্রয়োগ শুরু করেন এমনকি জেলে প্রেরণের হুমকি দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু ছয় দফার প্রবর্তক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ্যে জনসভায় আইয়ূব খানের জবাব দেন।[২৪] ছয় দফা দাবিকে বেগবান করে তোলার জন্য ১৯৬৬ সালের ২৬ শে এপ্রিল তারিখের *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় মুসাফির তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে মন্তব্য করেন:

"জনতার কাফেলা চলিবেই। আজ দেশ ব্যাপী এমন নেতৃত্ব চায় যাহারা নির্যাতন ও হয়রানীতে হতোদ্যম এবং জনতার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আগাইয়া নিতে পিছপাও

---

[২০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ এপ্রিল ১৯৬৬।

[২১] এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৭৬-১৭৭।

[২২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

[২৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মার্চ ১৯৬৬, উদ্ধৃত, এমরান জাহান, পৃ. ২৪৩।

[২৪] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৩১৭।

হইবেন না। বরং জনদাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেল জুলুম নির্যাতন হয়রানিকে দেশ সেবার সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।[২৫]

ইতোমধ্যে ছয় দফা দাবিকে একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান একটি গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যার ফলে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সারা দেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ থেকে ৮ই মে তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৫০ দিনে তাঁকে ৩২টি জনসভায় ভাষণ দিতে হয়। এই সময় সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ছয় দফার পক্ষে যে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন, তা সত্যিই এক অকল্পনীয় ব্যাপার।[২৬] ছয় দফার জনপ্রিয়তায় আইয়ুব খান ভীত হয়ে পড়েন এবং শেখ মুজিবুর রহমান যাতে জনসভা করতে না পারেন এজন হয়রানি ও নির্যাতনের পথ বেছে নিলেন। সর্বোপরি সরকারি নির্যাতন উপেক্ষা করে এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দান করেন। ওই দিনই ভাষণশেষে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।[২৭] শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হলে *দৈনিক ইত্তেফাক* ১৯৬৬ সালে ১০ই মে তারিখে মুসাফির তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লিখলেন:

> ৬ দফা যে বিপুল জনসমর্থন রহিয়াছে, সেই প্রশ্ন এখানে না তুলিয়াও বলা চলে যে, নির্যাতনের পথে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না, বরং জটিল হয়। যাহারা রাজনৈতিক কারণে বিশেষতঃ জনগণের দাবি-দাওয়া ভুলিয়া গিয়া নির্যাতিত, নিগৃহীত হইতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিল জাতির জন্য কোনো ত্যাগই বৃথা যায় না, ইহাই আজিকার সান্ত্বনা ও প্রেরণা।[২৮]

শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহকর্মীদের কারাগারে প্রেরণের ফলে আওয়ামী লীগ ৭ই জুন সারা প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালনের ডাক দেন। জনগণ তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানের হরতালে নাগরিক জীবন অচল হয়ে পড়ে। হরতাল চলাকালে নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। ধর্মঘটে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে এগারো জন নিহত হয় এবং এ ছাড়াও প্রায় আটশত লোককে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি প্রেসনোটে দশ জনের নিহত হওয়ার কথা সরকার স্বীকার করে। সরকার ৭ই জুনের হরতালের প্রকৃত খবর যাতে জনগণ জানতে না পারে এজন্য শুধুমাত্র সরকারি প্রেস নোট ছাড়া অন্য কোনো খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্য ৮ই জুন তারিখে কোনো সংবাদ প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এজন্য পত্রিকাগুলোতে অনিবার্য কারণবশত স্টাফ রিপোর্টারদের হরতাল সংক্রান্ত বিবরণ ছাপানো সম্ভব হলো না

---

[২৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

[২৬] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), এবং আরো দেখুন মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, পৃ. ১৮৯।

[২৭] শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনের ৩২ (১) ক ধারার বিধানবলে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মীসহ গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন: খোন্দকার মোশতাক আহমদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), এম. এ আজিজ (চট্টগ্রাম)।

[২৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ই মে ১৯৬৬।

কথাগুলি মুদ্রিত করা হয়।[২৯] আর এ কারণেই প্রতিটি পত্রিকায় প্রথম পাতাতে বড় বড় হরফে ছাপা হলো সরকারি প্রেসনোট। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকাতে সরকারি প্রেসনোটটির যে হুবহু অনুলিপি পাওয়া যায় তাতেও ৭ই জুনের হরতালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক প্রচারিত *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে ছয় দফা আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন করে রাজনৈতিক মঞ্চ কলাম লেখার কারণে ১৫ই জুন তারিখ গ্রেফতার করা হয়।[৩০] শুধু তাই নয়, বাঙালির অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর *দৈনিক ইত্তেফাক* যাতে আর প্রকাশিত না হতে পারে এজন্য ১৬ই জুন তারিখে *দৈনিক ইত্তেফাকের* প্রেস, ১ নং রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থ নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৩১]

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল প্রসঙ্গে *পাকিস্তান অবজারভার* 'Ittefaq's Press Forfeited' শিরোনামে সম্পদকীয়তে মন্তব্য করেছিল:

> Ittefaq a Bengala daily, on Friday ceased Publication following the fortified of the Nation Printing press to the Government under orders of the East Pakistan Governor. The action was taken under sub-rule two of rule 52 of the Defence of Pakistan Rules for alleged violation of the restrictive orders. ... The Newspaper was charged with alleged contravention of prohibitory order in baging published reports, comments, views and statements which were likely or intended to infringe the sovereignty of the State of Pakistan or undermineits integrity. It was also alleged that the newspaper had carried such material as was likely of intended to create feelings of enmity of hatred between diffent classes of citizens. Other charges related to publication of material, concerning. Students' strike, agitation, inrest etc. and observance of protest day by Awami League in June 7 last.[৩২]

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেস ক্লাবে এর প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করে এবং এক বিবৃতি প্রদান করে। তারা অবিলম্বে *দৈনিক ইত্তেফাকের* প্রকাশনা চালু করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচির ঘোষণা দান করে। সংবাদপত্রের উপর সরকারের এই নিগৃহীত নিপীড়নের প্রতিবাদে উল্লেখ করা হয়েছিল:

---

[২৯] অবশ্য ১৯৬৬ সালের ৯ই জুন তারিখে সংবাদ পত্রিকাতে আমাদের নীরব প্রতিবাদ শিরোনামে এক খবরে বলা হয়, "যে মর্মান্তিক বেদনার ভাষা দেওয়া যায় না, সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য সংবাদ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরাও শরীক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি। কর্মাধ্যক্ষ, *সংবাদ*।"

[৩০] মোনায়েম খানের নির্দেশে পুলিশ পাকিস্তান দেশ রক্ষা বিধির ৩২ (১) 'খ' ধারা অনুযায়ী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। "রাজনৈতিক মঞ্চ" কলাম লেখার কারণে এই আটকাদেশ ছিল তৃতীয়বার।

[৩১] *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৮ জুন ১৯৯৬।

[৩২] The Executive Ciuncil of The East Pakistan Union of Journalists.-এর বিবৃতি তারিখ: ১৭ জুন ১৯৬৬।

> The meeting condemned the drastic Government measure in the strongest possible terms and demanded that the forfeiture order served on the New Nation Prininting Press berescinded forth with. The meeting was of the consistent by the Government of the freedom of the press under the Defence of Pakistan Rules obviating there course to even the special press laws which were put under moratorium under the so-called "Gentlemen's Agreement" between the Government and the newspaper propritors and the editors are attacks directed against all section of the Newspaper industry—the working journalists, the press workers, the editors and the newsaper proprietors.[৩৩]

এছাড়াও সরকারের এই ঘোষণার প্রতিবাদে ১৮ই জুন তারিখে পূর্ব পাকিস্তান গণ পরিষদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ একটি মুলতবি প্রস্তাব এবং একটি অধিকার প্রস্তাব আনয়ন করলে স্পিকার সেটা বাতিল করেন। ফলে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ স্বল্পকালের জন্য ওয়াক আউট করেন।[৩৪] পরবর্তীতে ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায়ে সরকার কর্তৃক পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৫২ (৫২) (খ) দফা বলে *ইত্তেফাকের* মুদ্রাণালয় নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত কারণকে অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন ঘোষণা করেন। যার ফলে *ইত্তেফাক* পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকলেও একই বছরের ২৭ জুলাই তারিখে পুনরায় প্রাদেশিক সরকার এক বিশেষ নির্দেশ জারি করে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৬৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকাকে আর প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি।[৩৫]

উপসংহার

বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ প্রণীত ছয় দফা দাবি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় মুক্তির সনদ। যাকে আমরা ব্রিটিশ ইতিহাসের ম্যাগনাকাটা ও অধিকার বিল, ফরাসি বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতা এবং আমেরিকার গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের বিকাশ যেভাবে ঘটেছিল , তার সাথে তুলনা করতে পারি। *দৈনিক ইত্তেফাক* পূর্ব বাংলার মানুষের দাবি ছয় দফাকে অত্যন্ত যৌক্তিক ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিকে *দৈনিক ইত্তেফাক* বাঙালির ' প্রাণের দাবি বা বাঁচার দাবি' হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে ১৯৭০ এর নির্বাচনের সময়েও *দৈনিক ইত্তেফাক* ছয় দফা কেন্দ্রিক প্রচার চালায়। শুধু তাই নয় আওয়ামী লীগ প্রণীত ছয় দফা দাবি এবং দলটির বিজয় ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে *দৈনিক ইত্তেফাক* এই নির্বাচনকে কাজে লাগায়। এসব আন্দোলনে গণমাধ্যম হিসেবে *দৈনিক ইত্তেফাক* বাঙালিদের মনে সঞ্চয় করে এক বলিষ্ঠ মন্ত্রশক্তি। মূলত এর মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালির ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। শত প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও বুদ্ধিজীবীরা শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধেও শক্তির ইন্ধন যুগিয়েছিলেন।

---

৩৩. উদ্ধৃত: মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩২৯।

৩৪. সুব্রত শংকর ধর, পৃ. ৮৪।

৩৫. লেলিন আজাদ, পৃ. ৫৫৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন : বৈধতার স্বরূপ সন্ধান

ড. এস. এম. এক্রাম উল্যাহ*
মো. সুলতান মাহমুদ**

Abstract: This paper attempts to analyze the acceptance or legitimacy of such elections, which took place in Bangladesh in the last thirty-nine years. In this paper the authors tried to find out the elections irregularities, which are used more or less in every election. On the contrary, the paper also highlighted some possible suggestions, which can be taken by related body or institutions for future development of Jatiya Sangsad election in Bangladesh.

ভূমিকা

রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের প্রধান পথ বা উপায় হলো নির্বাচন। সাধারণভাবে যে পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ নিজেদের পছন্দমত প্রার্থী মনোনীত ও বাছাই করে তাকেই বলা হয় নির্বাচন। স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সরকার। আর এটাই হলো গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। বাস্তবিক পক্ষে নির্বাচন হলো: Lifeline of democracy।[১] নির্বাচন হলো নিয়ম নীতি দ্বারা স্বীকৃত এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ কর্তৃত্ব করার জন্য তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে, বিভিন্ন ইস্যু নির্ধারণ করে এবং সরকারের স্বরূপ নির্ধারণ ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে থাকে। এ ব্যবস্থাতে প্রতিটি সরকারই জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রতিটি নির্বাচন জনগণের মতামত প্রকাশের পথকে প্রসারিত করে। তবে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় জনগণ মতামত প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় । একটি জাতির রাজনৈতিক উন্নতি, তার সরকার ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে জাতির গণতান্ত্রিক বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন একটি বৈধ ও উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে, যার দ্বারা ক্ষমতার পট পরিবর্তনের একটি মসৃণ পথ তৈরি করা যায়। এ প্রসঙ্গে একজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতামত হলো:

> Electoral politics of a nation allows an interesting window to assess the configuration of alignment of political forces and issues,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
** প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

[১] *The Daily Star*, 9 March 2001.

> but only when a free and fair election takes place and a smooth transition of power is guaranteed।[২]

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তসমূহ জনগণের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করার একটি সুশৃঙ্খল পন্থা হলো নির্বাচন। এই প্রক্রিয়া জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন করে। এর পরবর্তী এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর, '৭২ সালের মধ্যে সরকার বাঙালি জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। ১৯৭২'র সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গিকার, মৌলিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হলো নির্বাচন। আর এই নির্বাচন বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা, উপ-ধারা যেমন: সংবিধানের ৬৬ নং ও ১১৯ নং ধারায় নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের আবতারণা করা হয়েছে।[৩] নির্বাচনী অধ্যাদেশ বলে গত ৩৯ বছরে বাংলাদেশে ৯টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য নিবন্ধটিতে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো জনগণের মাঝে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছে তার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন: গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতার বিশ্লেষণ

১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বমোট ৮টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সরকারের অধীনে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সামরিক শাসনের অধীনে। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। কেবলমাত্র ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত খালেদা সরকারে অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এসব নির্বাচন দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে কতটুকু আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল তা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের মন্তব্য ও প্রতিবেদন, দেশি-বিদেশি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মন্তব্য, NGO প্রতিনিধিদের বক্তব্য, দেশের সুশীল সমাজের মন্তব্য এবং নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে লেখা বিভিন্ন পুস্তক ও নিবন্ধে উল্লেখিত মন্তব্য বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশে গত ৩৯ বছরে অনুষ্ঠিত ৯টি সংসদ নির্বাচনের বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো :

---

[২] Enayetur Rahim, "Electoral Politics in Bangladesh 1975-88", Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh* (New Delhi: South Asain Publishers, 1990), p. 107.

[৩] বিস্তারিত নির্বাচনী আইনের জন্য দেখুন, Farooque Mohiddin and Rizwana Hasan, *Essential Election Laws and Their Loopholes in Handbook on Election Reporting* (Dhaka: Society for Environment and Human Development,1995), p. 158.

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩

বাংলাদেশে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে ৭ই মার্চ তারিখে। আওয়ামী লীগ সহ মোট ১৪টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৫.৬২% এবং আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৭৩.২০% পেয়ে ২৮৯টি আসনের মধ্যে ২৮২টি লাভ করে।[৪] এ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো, বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ, দেশি-বিদেশি পত্রিকা ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করেছে। সেসব মন্তেব্যের ভিত্তিতে '৭৩ এর নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা নিচে প্রদান করা হলো:

বিরোধী দলগুলো যাদের অধিকাংশই ৭৩ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে অভিযোগ করে যে, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি এবং তাতে জনগণের প্রকৃত রায়ের প্রতিফলন ঘটেনি। তাদের মতে, আওয়ামী লীগ ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, জাল ভোট প্রদান, গণনার কারচুপি ইত্যাদি অসৎ উপায়ে জয়লাভ করে।[৫] ন্যাপ (ভাসানি) নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে তামাসা বলে আখ্যায়িত করেন এবং তা বাতিল কারার জন্য গণআন্দোলনের আহ্বান জানান।[৬] আতাউর রহমান খান বলেন, এটা ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অসৎ নির্বাচন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচন বাতিল করার জন্য গণআন্দোলনের সম্ভাব্যতা বাতিল করে দেন।[৭] জাসদ নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচনকে একটি প্রতারণা বলে উল্লেখ করেন এবং সতর্ক করে দেন যে, নির্বাচনের ফলাফল মেহনতি জনগণের বিপ্লবী অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারবে না।[৮] কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিং) ও ন্যাপ (মুজাফফর)-এর মতে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কিছু আসনে অগণতান্ত্রিক ও অসৎ উপায় অবলম্বন করে। তবে তাঁরা নির্বাচনের ফলাফলকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সুষ্ঠু রায় বলে মেনে নেয়।[৯] এনায়েতুল্লাহ খান নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, একটা সৎ নির্বাচন হলেও ফলাফলের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ হেরফের হতোনা, বিরোধী পক্ষ খুব বেশি হলে আর দশটি আসনে জয়লাভ করত।[১০]

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেসব বিদেশি পর্যবেক্ষক এসেছিলেন তাঁরা বলেন, কিছু সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ বলপ্রয়োগ ও ভোট জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে।[১১] গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিনিধি ওয়াল্টার শোর্জ বলেন, জাতিসংঘের পরিচালনায় এবং রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল অনায়াসে জয়লাভ করতেন।[১২] Marcus Franda বলেন, এটা ছিল "অপ্রয়োজনীয় এবং প্রকাশ্য জালিয়াতি"।[১৩] নির্বাচনের পূর্বে দুটি নির্বাচনী এলাকায় একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রওনক জাহান বলেন যে, ভোটারগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাক নির্বাচনী পছন্দ

---

[৪] G.W. Chodhury, *Last Days of Pakistan* (London: C. Hurst Company, 1974), p. 128.

[৫] *The Bangladesh Observer*, 10 March 1973.

[৬] Ibid.

[৭] *নয়াযুগ*, ১৬ মার্চ ১৯৭৩।

[৮] *গণকণ্ঠ*, ১০ ও ১১ মার্চ ১৯৭৩।

[৯] *পূর্বদেশ*, ১১ মার্চ ১৯৭৩; *The Bangladesh Observer*, 10 March 1973.

[১০] *Holiday*, 11 March 1973.

[১১] *The Wave*, 31 March 1973.

[১২] Ibid.

[১৩] Marcus Franda, *Bangladesh: The First Decade* (New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd.,1982), p.54.

(Choice) এবং প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন অসামঞ্জস্য নেই।[১৪] নির্বাচন সম্পর্কে *London Times* পত্রিকার মন্তব্য হলো, "বাংলাদেশের নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিজয় কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। তবে পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে।[১৫]

মূলত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনের রাজনৈতিক সরকারের অধীনে। এ সময়ে কেবল মাত্র চরমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য সবগুলো রাজনৈতিক দল নির্বচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচন সম্পর্কে একমাত্র রাজনৈতিক দল ন্যাপ (ভাসানী) নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানায়। বাকি অন্যান্য রাজনৈতিক দল কঠোর সমালোচনা করলেও জনগণের রায় হিসেবে নির্বচনের ফলাফলকে মেনে নেয়। দেশি এবং বিদেশি পর্যবেক্ষক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, নির্বাচনে ২/১ টি কারচুপি হলেও নির্বাচনের রায় সম্পর্কে তেমন কোন দ্বিমত প্রকাশ করেননি। তারপরেও একথা বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর মত একজন ক্যারিজমেটিক নেতার অধীনে কোন নির্বাচনে এ ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি এদেশের জনগণ সেসময় প্রত্যাশা করেননি।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় এসেই জেনারেল জিয়া নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করেন এবং যারা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করেন।[১৬] জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর সরকারের বৈধতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল অন্যতম।

এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনের ব্যাপারে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সকল প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে প্রায় ৫১% ভোটার ভোট প্রদান করে। জিয়ার বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের ৪১% লাভ করে। আওয়ামী লীগ প্রায় ২৫% ভোট পায়, কিন্তু আসন পায় মাত্র ৩৯টি।[১৭] অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যারা ৫৪টি আসন লাভ করে এবং যাদের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ছিল ৩৪%।[১৮] নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা, রাজনৈতিক দল ও বিদেশি পর্যবেক্ষণ সংস্থা এবং রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে নীচে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল নির্বাচনে "অভূতপূর্ব" কারচুপির অভিযোগ করে। তাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, সরকার কোন দলকে ক'টা আসন দিবে তার একটা নীল-নকশা

---

[১৪] Rounaq Zahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues* (Dhaka: Univesity Press Ltd.,1980), pp.183-85.

[১৫] *The Bangladesh Observer,* 10 March 1973.

[১৬] Nizam Ahmed, "From Monopoly to Cometition: Party Politics in the Bangladesh Parliament (1973-2001)," *Pacific Affairs,* 76: 1, 2003, p.56.

[১৭] *Dhaka Courier*, 14-18 February 1991.

[১৮] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর: টাউন ষ্টোর্স, ১৯৯২), পৃ. ১৯৯।

আগেই তৈরি করে এবং তারা সেই নীল-নকশার শিকার হয়েছে । তারা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণসহ বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরে যে, BNP প্রার্থীগণ ও সরকারি কর্মকর্তারা এ নির্বাচনে দুর্নীতি, অনিয়ম ও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেন।[১৯] একজন বাংলাদেশী রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেন যে, নির্বাচনটি সম্পূর্ণ সামরিক শাসনের তত্ত্বধানে অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তাকে পাশ কাটানো হয়েছে।[২০] নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণ মনে কারেন যে, এসব অভিযোগের মধ্যে সত্যতা ছিল । তবে তা সত্ত্বেও BNP এর বিজয়কে অস্বীকার করা যায় না । BNP প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। মাত্র ১০টি আসনে BNP প্রার্থী ১০০০ ভোটের কম ব্যবধানে জয়লাভ করেন (একটা এলাকায় ব্যবধান ছিল মাত্র তিন), অন্য ৪০টি নির্বাচনী এলাকায় এই ব্যবধান ছিল ১০০০ থেকে ৫০০০ এর মধ্যে।[২১]

প্রকৃতপক্ষে ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণরূপে সামরিক শাসনের অধীনে । নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোসহ দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক মহলের কাছে এ নির্বাচন তেমন কোন প্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি, জেনারেল জিয়া তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং তার শাসনকে বেসামরিক রূপ দেয়ার জন্যই মূলত এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে । নির্বাচনটিতে সন্ত্রাস, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই , ভুয়া ভোট প্রদান ইত্যাদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের উৎসাহকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল ।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতাগ্রহণের পর এরশাদ সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং সংবিধান স্থগিত করেন। সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল সামরিক আইন ও সামরিক আদালত পূনর্বহাল করেন। এরশাদ তার পূর্বসূরি জেনারেল জিয়ার ন্যায় তাঁর শাসনের বৈধতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রায় একই রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । এসবের মধ্যে তৃতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল অন্যতম। ১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় পার্টির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন । নির্বাচনে মোট ২৮টি দল অংশ নেয় এবং ৪৫৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংসদ নির্বাচনে সরকার সমর্থিত জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন লাভ করে । দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত ৮টি দল সম্মিলিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তারা মোট ৯৭ আসন লাভ করে।[২২]

---

[১৯] বিভিন্ন দলের নির্বাচনের সাংবাদিক সম্মেলন দেখুন: *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* ২১, ২৫, ২৭ ও ২৮ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯; *বিচিত্রা*, ২ মার্চ ১৯৭৯।

[২০] M. Abdul Mannan, *Election and Democracy in Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2005), p. 78.

[২১] এ সংখ্যাগুলো নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে।

[২২] যে ৫টি দল নির্বাচন বর্জন করে ও ১৫ দলীয় জোট ত্যাগ করে সেগুলো হলো জাসন (ইনু), বাসদ (মাহবুব), বাসদ (খালেকুজ্জামান), ওয়াকার্স পার্টি মেনন) ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বললে খুব কম বলা হবে , এটা ছিল একটা "ভোট ডাকাতি" ও 'মিডিয়া ক্যু'। সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ।[২৩] তৎকালীন জামায়াত এর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বিবৃতি দেন যে, এ নির্বাচন জাতিকে হতাশ করেছে । কারণ এতে নজিরবিহীন সন্ত্রাস ও ভোট কারচুপির ঘটনা ঘটেছে।[২৪] ৭ দলীয় ও ৫ দলীয় জোটের মতে, এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ও ৮ দলীয় জোটের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয়েছিল ।[২৫]

Enayetur Rahim বলেন যে, এ নির্বাচন জনগণের নিকট উৎসাহ কিংবা উত্তেজনা কোনটাই সৃষ্টি করতে পারেনি।[২৬] *The Far Eastern Economic Review* তে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনকে আইনবিবর্জিত, নজিরবিহীন ও সহিংস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[২৭] অপর একটি নিরপেক্ষ সূত্র উল্লেখ করে যে, এ নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সরকার যা দাবি করেছে তার সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি । প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের সাধারণ মাত্রার চেয়ে অনেক নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষণীয় ।[২৮]

দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ বলেন, নির্বাচনে সন্ত্রাস, ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভুয়া ভোট প্রদান ইত্যাদি ঘটনা ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয় এবং এজন্যে ক্ষমতাসীন দলই দায়ী। ভোট গ্রহণের দিন ব্যাপক হাঙ্গামায় অন্তত ১৫ ব্যক্তি নিহত ও ৬৭০০ ব্যক্তি আহত হয় এবং ২৮৪টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয় । একটি ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক দল এই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের জন্য এক বিয়োগান্তক ঘটনা (Tragedy) বলে বর্ণনা করেন ।[২৯] *BBC, The Guardian, The Times, The Financial Times, VOA,* এবং কিছু সংখ্যক বিদেশি পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রয়োগ ঘটেছে। নির্বাচনকালীন সময়ে মাস্তানদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম, সরকারি দলের লোকজন কর্তৃক ভোট -কেন্দ্র দখল, ভুয়া ভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনা লক্ষণীয় ছিল। এমনকি সরকারি কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর লোকজনকেও নির্বাচন কার্যক্রমে ক্ষমতার অপব্যাবহার করতে দেখা যায় ।[৩০]

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮

ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকেই এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে । ১৯৮৭ সালে বিরোধী দলগুলো আন্দেলনকে আরো বেগবান করে তুলে । ব্যাপক আন্দোলনের মুখে এরশাদ

---

[২৩] *সংবাদ*,৮ মে; *একতা*, ৯ মে; *বিচিত্রা*, ১৬ মে ১৯৮৬।

[২৪] *Bangladesh Observer*, 8 May 1986.

[২৫] Moudud Ahmed, *Democracy and the Challenge of Development: A Study of Politics and Military Interventions in Banghladesh* (Dhaka: University Press Limited, 1995), pp. 382-383.

[২৬] Enayetur Rahim, p. 107.

[২৭] *The Far Eastern Economic Review*, 22 May 1986; *The Daily Telegraph*, 8 May 1986; *and the Times*, 8 May 1986.

[২৮] *Abdul Mannan*, p. 96

[২৯] *সংবাদ*, ৮ মে, *সচিত্র সন্ধানী*, ১১ মে; বিচিত্রা, ১৬ মে, ১৯৮৬ ও *Asia Week*, খণ্ড ১২, সংখ্যা ২০, ১৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ২৪।

[৩০] *BBC Commentry*, 8 May 1986.

১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এরশাদ চর্তুথ সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে । কিন্তু ২টি বড় দল আওয়ামী লীগ ও BNP সহ বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট করে । নির্বাচনে আ,স,ম, আব্দুর রবের নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত বিরোধী দলের জন্ম হয়। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন এবং মোট ভোটের ৬৯.৪৪% পায় । বাকি আসনগুলোর মধ্যে সম্মিলিত বিরোধী দল পায় ১৯টি , জাসদ (সিরাজ) ৩টি, ফ্রিডম পার্টি ২টি ও স্বতন্ত্ররা ২৫টি।

শক্তিশালী বিরোধীদলগুলো ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনকে প্রতারণা বলে প্রত্যাখান করেন। তারা দাবি করেন যে, তাদের ডাকে সাধারণ ভোটারগণ নির্বাচন বর্জন করেছে। সুতরাং অবৈধ এরশাদ সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে ।[৩১] জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন এ নির্বাচন সরকারি ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।[৩২] বিরোধী দল ও জোটসমূহ নির্বাচনের কঠোর সমালোচনা করা অব্যাহত রাখে। ৮ দলীয় জোট নেত্রী অভিযোগ করে বলেন যে, কাগুজে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। সে কারণে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দেলন অব্যাহত থাকবে।[৩৩] ৭ দলীয় জোট নেত্রী ৩রা মার্চের নির্বাচনকে প্রহসনমূলক আখ্যায়িত করে চলমান আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে জনগণকে আহ্বান জানান ।[৩৪]

Enayetur Rahim বলেন, এটা সত্য যে, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ১% এরও কম ভোটার ভোট দানে অংশগ্রহণ করে । যদিও সরকার দাবি করে যে, মোট ৫৩% ভোটার ভোট দান করেছে । নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই অপরিচিত এবং জনজীবনে যাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা ।[৩৫] Abdul Mannan বলেন যে, ১৯৮৮ সালের নির্বাচন ছিল সরকারি দলের মাসলমেন কর্তৃক নির্বাচনী অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারে পরিপূর্ণ । ভোট কারচুপি, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভুয়া ভোট প্রদান, ভুয়া ভোট গণনা এবং ভোট কেন্দ্র দখল এ নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।[৩৬] জিল্লুর রহমান খান নির্বাচন কারচুপির একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ করে বলেন, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান যিনি বিরোধী দলের একজন প্রার্থী ছিলেন, তাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনী ফলাফলে তার এলাকা থেকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় । কিন্তু পরবর্তীতে ভোট পূনর্গণনা করে তাকে বিজিত প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । এ ধরনের কর্মকাণ্ড ছিল নেহাতই প্রশ্নবিদ্ধ।[৩৭] কিছু সংখ্যক বিদেশি উৎস, যারা নির্বাচন পূর্ববর্তী, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর দৃষ্টি আরোপ করেছিলেন, তারাও নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা স্বীকার করেছিলেন।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করেনি। এরশাদের

---

[৩১] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪), পৃ.. ৩১৭-৩১৮।

[৩২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মার্চ ১৯৮৮।

[৩৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ১৯৮৮।

[৩৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মার্চ ১৯৮৮।

[৩৫] Enayetur Rahim,, p. 109.

[৩৬] M. Abdul Mannan, p. 96.

[৩৭] Zillur R. Khan, *Leadership Crisis in Bangladesh: Marital Law to Marital Law* (Dhaka: University Prerss Limited, 1984), p. 193.

[৩৮] M. Abdul Mannan, p. 78.

অধীনে সংঘটিত নির্বাচন দুটিতে ব্যাপক মাত্রায় নির্বাচনী অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। এসবের মধ্যে ছিল নির্বাচনের নামে প্রহসন, সরকারি দল ও প্রশাসন কর্তৃক সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভোট কেন্দ্র দখল ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, মিডিয়া ক্যু ইত্যাদি। এসব কারণে দেশের অভ্যন্তরে এবং আর্ন্তজাতিক মহলে কোন ক্ষেত্রেই এ নির্বাচন কোন প্রকার আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি এবং গ্রহণযোগ্যতাও পায়নি ।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পতন হলে সেদিনই তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ এর অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এ সরকারের প্রধান কাজ ছিল একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বচনের ব্যবস্থা করা। সে অনুয়ায়ী ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি দেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। BNP ৩০.৮১% ভোট ও ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভুত হয়। আওয়ামী লীগ ৩০.০৮% ভোট পেলেও মাত্র ৮৮টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত। পর্যবেক্ষণগণ পূর্বাভাস দেন যে, আওয়ামী লীগই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে ।[৩৯] উক্ত নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে এবং তা এদেশের জনগণের নিকট বা সারা বিশ্বের কতটুকু সমাদৃত হয়েছিল তা যাচাই করার জন্য কতকগুলো মতামত তুলে ধরা হলো:

৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ এনে বলেন, নির্বাচনের ফলকে প্রভাবিত করতে অশুভ শক্তি সফল হয়েছে এবং নির্বাচনের প্রত্যাশিত ফলকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৪০] বাকশালের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আহমেদ তাঁর মন্তব্যে বলেন, এ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বাকশালের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে অভিনন্দন জানানো হয়।[৪১] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে। এ দলটি আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়।[৪২] নির্বাচন সম্পর্কে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমেদ বলেন, সঠিক ও সুন্দর ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় আমরা গর্বিত। এই নির্বাচনের স্বচ্ছতার জন্য সরকারের চেয়ে বাংলাদেশের জনগণ বেশি প্রশংসার দাবিদার।[৪৩] তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনে ভোট চুরির মন্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, এটা নির্বাচনের সংশ্লিষ্টদের অসাধারণ সাফল্যই শুধু নয় "বাংলাদেশের জনগণের বিজয়" ।[৪৪]

ভোটের দিন ৩০০টি ভোট কেন্দ্র ও ৬০টির বেশি নির্বাচনী এলাকা পর্যবেক্ষণ করে Commonwealth Group মন্তব্য করে যে, সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচন বাংলদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করতে সাহায্য করবে এবং এটা একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম

---

[৩৯] আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।
[৪০] আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, *গণতন্ত্রের অন্বেষায় বাংলাদেশ* (ঢাকা: পান্ডুলিপি, ১৯৯৩), পৃ. ১১৪।
[৪১] *দৈনিক খবর*, ২ মার্চ ১৯৯১।
[৪২] *দৈনিক বাংলা*, ৫ মার্চ ১৯৯১।
[৪৩] আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।
[৪৪] *দৈনিক বাংলা*, ১ মার্চ ১৯৯১।

করবে।[৪৫] এ গ্রুপের সভাপতি দাতো কেপত্মানাভন বলেন, এ নির্বাচন সামগ্রিকভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন কমিশনের আশা পূরণ হয়েছে। তবে এ কথা ঠিক যে, ভোটার লিস্টে কিছু অনিয়ম ছিল, কিন্তু তা নির্বাচনের ফলাফলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি।[৪৬] জাপানি সংসদীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ নির্বাচন চেয়েছিল এটি তারই প্রমাণ। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনকে তারা সঠিক বলে মেনে নেন।[৪৭] ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক গ্রুপের সদস্য পিটার শোর বলেন, একটি নিখুঁত ভোটার তালিকা থাকলে ভাল হত। তবে অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকশিত এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি উন্মোচনে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।[৪৮]

চারটি সার্ক দেশের ৩০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারি পর্যবেক্ষক দল ২৮৮টি ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে, নির্বাচনে ভোটারগণ তাদের ইচ্ছা সঠিক ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের মানুষ ও প্রশাসন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতি সংকল্প ও অঙ্গীকারের যে মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছে, তা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ অনুসরণ করতে পারে।[৪৯] *Mainstream*, New Delhi পত্রিকার বিখ্যাত কলামিষ্ট ও সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তী বলেন যে, ৫ম সংসদ নির্বাচন এমন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, তা সার্কের অন্যান্য দেশ উদাহরণ হিসেবে অনুসরণ করতে পারে।[৫০] বাংলাদেশের মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মতে, দেশের সর্বত্রই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫১]

বস্তুত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রায়কে আওয়ামী লীগ ব্যতিরেকে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল জনরায় হিসেবে মেনে নেয়। দু'-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন মোটামুটি অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দেশ এবং বিদেশের সকল ক্ষেত্রেই এ নির্বাচন ছিল ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ইতিপূর্বে এতো সুন্দর, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কোনো সময়ই অনুষ্ঠিত হয়নি বলে সবাই মতামত ব্যক্ত করেন।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

সরকার-বিরোধী তীব্র আন্দোলনের পর্যায়ে বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে সরকার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে বিএনপি সরকার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়।

প্রধান বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনের ৪৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তারা সকলেই ছিলেন শাসক দল BNP মনোনীত প্রার্থী। নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর প্রতিরোধের কারণে ১০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২৪১টি আসনের ভোটগ্রহণ করা হয়। এই ২৪১টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ভোটার ভোট দান করেন বলে নির্বাচন

---

[৪৫] Fakhruddin Ahmed, p. 91.
[৪৬] *দৈনিক খবর*, ২ মার্চ ১৯৯১।
[৪৭] Fakhruddin Ahmed,, p. 92.
[৪৮] *দৈনিক খবর*, ২ মার্চ ১৯৯১।
[৪৯] Fakhruddin Ahmed, pp. 90-91.
[50] Ibid., pp.91-92.
[৫১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়। সে হিসেবে প্রদত্ত ভোটে হার ছিল মাত্র ২৬.৫৪%, যা ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। উক্ত ২৪১টি আসনের মধ্যে মাত্র ১টি পায় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স নামক একটি উপদল, ১০টি পান নির্দলীয় প্রার্থীগণ এবং অবশিষ্টগুলো পান BNP দলীয় প্রার্থীগণ।[৫২] বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, ১৫ই ফেব্রুয়ারি কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। যা হয়েছে তা হল- নির্বাচনী জালিয়াতি, প্রতারণা ও ভোটচুরি। তিনি নির্বাচন বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, এর মাধ্যমেই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির যৌক্তিকতা ও যথার্থতা আরও একবার প্রমানিত হয়।[৫৩] জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে সরকার গঠন করে। এই সংগঠনটির সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, দু একটি ম্যানেজ করা কেন্দ্র ছাড়া সারাদেশে গড় ভোটদানের শতকারা হার ছিল ১ ভাগেরও কম। তিনি BNP সরকারকে অবৈধ, অনির্ধারিত, অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ও জনগণ দ্বারা প্রত্যাখাত সরকার বলে অভিহিত করেন এবং বি.এন.পি.'র দেশ পরিচালনায় কোন সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকার নেই বলে উল্লেখ করে এই নির্বাচনের ফল বাতিল করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট দাবি জানান।[৫৪] বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন ১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে এদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে ভোটারবিহীন এই নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন যে, সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচন করলেই কেবল সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা পেতে পারে।[৫৫] বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সম্বলিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির একটি কপিতে আগুন লাগান।[৫৬]

দেশের সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতির হার খুব কম এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার আনুমানিক ১৪-১৬ শতাংশ ছিল বলে মন্তব্য করে। আরও বলা হয় যে, মানুষ ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ থেকে স্পষ্টভাবে দূরে অবস্থান করে এটা মানুষের ইচ্ছা না নির্বাচন-বিরোধী শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট বাধ্যকর থমথমে পরিবেশ তা নির্ধারণ করা কঠিন। তারা এ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী ছিল না।[৫৭] *সাপ্তাহিক যায়যায় দিন*-এর সম্পাদকীয়তে নির্বাচনের দিন পল্লী অঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত থমথমে ও সংঘর্ষপূর্ণ ছিল বলে দাবি করা হয়।[৫৮] Rounaq Jahan ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ভোটারবিহীন নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৯] বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা ADAB, BRAC, FEMA এবং

---

[৫২] তদেব।
[৫৩] *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
[৫৪] *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
[৫৫] *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
[৫৬] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
[৫৭] Father R.W. Timm, USC (ed.), *Election Observation Report*, BMSP (Dhaka: CCHRB, 30 June 1996), p. 33.
[৫৮] Ibid., pp. 33-34.
[৫৯] Rounaq Jahan, "Political Development" in A.M. Chowdhury and Fakrul Alam, *Bangaldesh on the Threshold of the Twenty First Century*, eds., (Dhhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), pp. 53-54.

FBCCI প্রভৃতি সংগঠন নির্বাচন সম্পর্কে বলে যে, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে এবং সরকার তার বৈধতা হারিয়েছে।[৬০]

১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন সম্পর্কে প্রধান বিদেশি দৈনিক গুলোতে কম ভোটার উপস্থিতি (প্রায় ১০%-১৬%) নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনিয়ম, ভোট কর্মকর্তা ও প্রার্থীদের অপহরণ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, নির্বাচন-বিরোধী শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়। এসব বিদেশি দৈনিকগুলো হলো *The Financial Time of London, The Times of India, The Dwan, The New York Times* ইত্যাদি।[৬১]

প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত খালেদা সরকারের অধীনে প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ ব্যাতিরেকে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংগত কারণেই এ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। বিএনপি ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনের ফলাফলকে সরাসরি প্রত্যাখান করেন। দেশ-বিদেশি সকল পত্রিকা ও পর্যবেক্ষক মহলের নিকট এ নির্বাচন কোন প্রকার আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অনিয়মে পরিপূর্ণ এ নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যাশা করেননি। কার্যত এ নির্বাচন গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছিল।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে ১২ই জুন তারিখে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ৩৭.৪৪% ভোট ও ১৪৬টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৩৩.৬১% ভোট ও ১১৬টি আসন লাভ করে, জাতীয় পার্টি পায় ১৬.৩৯% ভোট ও ৩২টি আসন, জামায়াতে ইসলামী পায় ৮.৬১% ভোট ও ৩টি আসন, ইসলামী ঐক্যজোট পায় ১.০৮% ভোট ও ১টি আসন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব) পায় ০.২৩% ভোট ও ১টি আসন এবং নির্দলীয় প্রার্থী পায় ১টি আসন।[৬২]

সকল রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন পত্রিকা, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ইত্যাদির মূল্যায়ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নির্বাচন দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সমাদৃত হয়েছিল কতটুকু তা আলোচনা করা হলো:

বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেন, এবারের নির্বাচনের সূক্ষ্ম কারচুপি নয় পুকুর চুরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।[৬৩] তৎকালীন জামায়াতের আমীর গোলাম আযম বলেন, জালভোট, কারচুপি, পরিকল্পিত সন্ত্রাস, ভীত প্রদর্শন, দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে নির্বাচনের ব্যাপারে কতিপয় এনজিও'র রাজনৈতিক ভূমিকা, কালো টাকার ছাড়াছড়ি ও প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বলতা নির্বাচনের নিপেক্ষতাকে দারুণ ব্যাহত করেছে।[৬৪]

---

[৬০] Ibid.
[৬১] Father R.W. Timm, p. 34.
[৬২] Ibid. p.236.
[৬৩] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ জুন ১৯৯৬।
[৬৪] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২১ জুন ১৯৯৬।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আগত বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ ১২ জুনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধও নিরপেক্ষ বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ইনস্টিটিউট ও জাপানি পার্লামেন্টারি পর্যবেক্ষক গ্রুপের সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ আখ্যায়িত করে অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়।[৬৫] যুক্তরাষ্ট্রের National Democratic Institute (NDI) এর অন্তর্বর্তী রিপোর্টে, অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও জনগণকে অভিনন্দন জানানো হয়। নির্বাচন সম্পর্কে BNP কর্তৃক ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ২/১টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও নির্বাচনের ফলাফলে কোন হেরফের হবার কিছু নেই।[৬৬] দক্ষিণ এশীয় পর্যবেক্ষক গ্রুপ ১২ই জুন নির্বাচন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ফলে এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে।[৬৭] ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক কমিশন সদস্যরা দেশব্যাপী ১৭০টি ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে। তাদের মতে ১২ জুনের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। কারচুপি বা অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে সামান্য। এই সামান্য ঘটনাবলি নির্বাচন প্রক্রিয়ার কোন বিরূপ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে নির্বাচনী ফলাফলে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।[৬৮]

সিসিএইচআরবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস. পেরেইরা বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী আচরণবিধির কঠোর প্রয়োগের ফলে এবং নির্বাচনের দিন যান্ত্রিক যান চলাচল একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে।[৬৯]

FEMA'র ২৫ হাজার পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। এর রিপোর্টে বলা হয় যে, এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তাৎপর্যপূর্ণ নয় এবং কয়েকটি ঘটনা ছাড়া সর্বত্রই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৭০]

বস্তুত সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশি-বিদেশি অসংখ্য পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। তাদের মতে, নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ। তবে নির্বাচনের লক্ষণীয় দিক ছিল এই যে, ১৯৯১ সালের আওয়ামী লীগের মত বি.এন.পিও প্রধান বিরোধী প্রতিপক্ষ হিসেবে এবং পরাজিত শক্তি হিসেবে নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নেয়নি কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, এ নির্বাচন সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার দীর্ঘ পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার পর ২০০১ সালে সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে । বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১লা অক্টোবর ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত

---

[৬৫] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুন ১৯৯৬।
[৬৬] তদেব।
[৬৭] তদেব ।
[৬৮] *The Daily Star*, 15 June 1996.
[৬৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জুন ১৯৯৬।
[৭০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জুন ১৯৯৬।

হয়। এই নির্বাচনকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্র উন্নয়নের তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । BNP'র নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২১৬টি আসন লাভ করে এবং ৪ দলীয় জোট জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে । BNP এবং এর শরিক দল মিলে ৪৭.১৩% ভোট পান যা আওয়ামী লীগ থেকে ৬.৯৫% (আওয়ামী লীগ-৪০.১৮) বেশি। আর্শ্চযের বিষয় হলো এই যে, BNP ৪০.৮৩% ভোট পেয়ে ৬৪.৩৩% আসন লাভ করে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ৪০.২১% ভোট পেয়ে মাত্র ২০.৬৭% আসন লাভ করে ।[৭১] নিচে নির্বাচন সম্পর্কিত মতামত গুলো বিশ্লেষণপূর্বক নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরা হলো :

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সভনেত্রী শেখ হাসিনা বলেন,"সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নির্বাচনে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি।" তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সুকৌশলে BNP এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের অনুকূলে কাজ করেছে।[৭২] আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে জনগণের বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন চারদলের পক্ষে কারচুপিতে সহায়তা করেছে।[৭৩] নির্বাচন সম্পর্কে জাসদ ও ১১ দলের মন্তব্য ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা প্রকৃতির। জাসদ এ নির্বাচন সম্পর্কে বলে, সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল অগ্রহণযোগ্য নয়। জনগণের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎসব মুখর পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ত্রুটি ও অনিয়ম সত্ত্বেও ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ছিল।[৭৪] ১১ দলীয় জোটের বক্তব্যে বলা হয় যে, এবারের নির্বাচনের ফলাফল সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং পরিবর্তনের পক্ষে জনগণের রায়। নির্বাচনে জনগণের সব অংশের মানুষের রায়ের প্রতিফলন ঘটেছে।[৭৫]

FEMA'র চেয়ারম্যান আবুল আহসান চৌধুরী বলেন এবারের নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য একটি মাইলফলক। ২টি নির্বাচনের তুলনায় এবার সারাদেশে সবচেয়ে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ব্রতির প্রধান নির্বাহী বলেন, অনিয়ম এবং কোনো কোনো এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটদানের বাধা প্রদান করা ছাড়া অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন জনগণের বিপুল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।[৭৬] Bangladesh Labour Research Foundation'র রিপোর্টে কিছু কিছু এলাকায় অনিয়ম এবং অনেক এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে না দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়। তবে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে মোটামুটি অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে মন্তব্য করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণকেন্দ্র এবং আরো কয়েকটি সংস্থার পর্যবেক্ষকরা মোটামুটি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু বলে মন্তব্য করে বলেন, ভোট কেন্দ্রে কারচুপি, জালিয়াতি বা বড় ধরনের কোনো গোলযোগ পরিলক্ষিত হয়নি এবং ভোটারদের উপস্থিতি ছিল নজিরবিহীন।[৭৭] বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ১লা অক্টোবরের

---

[৭১] M. Abdul Mannan,. *p.* 174.
[৭২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ অক্টোবর ২০০১।
[৭৩] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ অক্টোবর ২০০১।
[৭৪] *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ অক্টোবর ২০০১।
[৭৫] তদেব।
[৭৬] *আজকের কাগজ*, ৪ অক্টোবর ২০০১।
[৭৭] আজকের *কাগজ*, ৩ অক্টোবর ২০০১।

নির্বাচনকে ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ ও নজিরবিহীন।[৭৮] Vote Observation for Transparency Empowerment (VOTE) এর আহবায়ক রোকেয়া কবীর নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান করে। বিভিন্ন স্থানে ২/১টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তবে নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। গণতন্ত্রের স্বার্থের এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[৭৯]

নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিপপের আহ্বায়ক বলেন, আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারাদেশে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। ভোট কেন্দ্রগুলোতে বিপুল সংখ্যক মহিলা ভোটারের আগমন ঘটে তবে কোথাও কোথাও সংখ্যালঘু ভোটারগণকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হলেও সামগ্রিক বিচারে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও ব্যাপক অংশগ্রহণ ভিত্তিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যা বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নজিরবিহীন।[৮০] দেশের সুশীল সমাজ মন্তব্য করেন যে, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তারা নির্বাচনে শেখ হাসিনার "স্থূল কারচুপির" অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তাকে অমূলক ও ভিত্তিহীন বলে অভিমত পোষণ করেন।[৮১]

জাপান বাংলাদেশে পার্লামেন্টারিয়ান এসোসিয়েশন ইলেকশন গ্রুপ সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মন্তব্য করেন।[৮২] সুইডিশ প্রতিনিধি দলের মতে, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৮৩] এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনের প্রধান ডামাসো ম্যাক বুয়াল বলেন, নির্বাচনে ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি নজরকাড়ার মতো। তিনি আরও বলেন, এবারের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে একটি জটিল পরিস্থিতি অতিক্রম করে।[৮৪] জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়তা সচিবালয়ের সমন্বয়কারী টনী রেইস নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়ার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহবান জানান। তারা বলেন, বিক্ষিপ্ত এবং দুঃখজনক কিছু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলেও নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক উপস্থিতি বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করে তোলে।[৮৫]

বস্তুত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। কেবলমাত্র নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ২য় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে স্থূল কারচুপির অভিযোগ করে। অবশিষ্ট সকল রাজনৈতিক দল, দেশি ও বিদেশি, পর্যবেক্ষক মহল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকাসমূহ এ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও

---

[৭৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ অক্টোবর ২০০১।
[৭৯] *আজকের কাগজ*, ৩ অক্টোবর ২০০১।
[৮০] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ অক্টোবর ২০০১।
[৮১] বিচারপতি লতিফুর রহমান, *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা* (ঢাকা: দি লেমিনেটরস, ২০০২), পৃ. ২৫১।
[৮২] তদেব, পৃ. ২৫১।
[৮৩] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২ অক্টোবর ২০০১।
[৮৪] *নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন*, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অক্টোবর ২০০১, আশা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯৯।
[৮৫] তদেব।

নিরপেক্ষ বলে মনে করেন যা ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ১৯৯১ সালের ও ১৯৯৬ এর ১২ জুনের নির্বাচনের মত মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

অষ্টম জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫বছর পূর্ণ হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তন ও সংস্কার উদ্যেগের ফলে প্রায় ২৬ মাস অতিবাহিত হয়ে যায় একটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান। প্রথমে ২২শে জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষিত হলেও নানাবিধ জটিলতার কারণে এ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ পূনর্নির্ধারণ হয়। ৩৮ টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[৮৬] আওয়ামী লীগের নেতৃত্ত্বাধীন মহাজোট ৫৫.৮৫% ভোট পেয়ে ২৬২ টি আসন লাভ করে। আওয়ামীলীগ একক ভাবে ৪৮.২৯% ভোট পেয়ে ২৩০ টি আসনে জয় লাভ করে। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্ত্বাধীন ৪ দলীয় জোট ৩৮.২৩% ভোট পেয়ে ৩৩টি আসন লাভ করে। এছাড়াও ড. কর্ণেল (অব:) অলি আহমেদ ০.২৮% ভোট পেয়ে ১টি আসন লাভ করে। ১৪৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪টি আসন লাভ করে।[৮৭]

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য প্রদান করেন। এসব মন্তব্যের ভিত্তিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা ও গস্থহণযোগ্যতার বিষয়টি নিচে আলোকপাত করা হলো।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা জানিয়েছেন, ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনপর্ব সম্পন্ন হয়েছে। ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি ও ভোট দেওয়ার শান্তিপূর্ণ দৃশ্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেরছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা। দেশের ৩২টি পর্যবেক্ষক সংগঠনের মোর্চা ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপও ভোটের দিন রাতে তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে।[৮৮]

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, জালিয়াতি ও কারচুপির অভিযোগ করেছে বিএনপি। এ দলের দপ্তর সম্পাদক রুহুল কবির রিজভী ৭২ টি আসনের ২২০ টি কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ করেন। এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তিনি জানান।[৮৯]

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মেশনের উপ-প্রধান গ্রাহাম এলসন ও কমনওয়েলথের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রধান মরিসাসের সাবেক প্রেসিডেন্ট কাসাম উতিম বলেন ২৯শে ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তাই এ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।[৯০]

---

[৮৬] Abul Fazl Huq, *The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis,*(Dhaka:Sudipata Printers and Packagers Ltd., 2009), p.6

[৮৭] Report of Election Commission, Election Commission, Dhaka.

[৮৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮।

[৮৯] *The Daily Star,* 1 January 2009.

[৯০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০০৯।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সংস্থাটির মহাসচিব বান কি মুনও নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামগ্রিক বিচারে এ নির্বাচনকে তিনি আন্তর্জাতিক মানের বলে উল্লেখ করেছেন। বিএনপি নির্বাচনে কারচুপির যে অভিযোগ করেছে, সে সম্পর্কে এই সংস্থার পর্যবেক্ষকেরা বলেছেন, এ ধরনের অভিযোগের কোনো ভিত্তি তাঁরা খুঁজে পাননি।[৯১]

কমনওয়েলথ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বলেছেন, নির্বাচনে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। এ ধরনের একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে অনেক নম্বর দেওয়া যায় বলে তাঁরা মত দিয়েছেন।[৯২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র বিএনপি এবং চারদলীয় জোট নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাকী অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এ নির্বাচনকে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক মানের বলে উল্লেখ করেছেন। এসবের ভিত্তিতে বলা যায় যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে একটি বৈধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন।

দোষ-ত্রুটি

স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ এই ৩৬ বছর বয়সে বাংলাদেশে নয়টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রথমটি আওয়ামী লীগের অধীনে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থটি যথাক্রমে জেনারেল জিয়া ও এরশাদের সামরিক সরকারের অধীনে। কেবলমাত্র ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এসব নির্বাচন পর্যালোচনা করে কতকগুলো দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। দোষ-ত্রুটি গুলো নিম্নরূপ:

ক. ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে অথবা রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সাধারণ ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন; খ. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা; গ. জালভোট প্রদান অর্থাৎ একজনের ভোট অন্যজনের দেওয়া; ঘ. ভোট গণনার ক্ষেত্রে কারচুপি ও অসৎ উপায় অবলম্বন করা; ঙ. ভোটকেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সন্ত্রাস ও সহিংসতা সৃষ্টি করা; চ. ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা; ছ. ব্যালট পেপার ছিনতাই করা; জ. শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ভোট কেন্দ্র দখল করা; ঝ. মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করা; ঞ. কালোটাকার ছড়াছড়ি; ট. প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং বিরোধী প্রার্থীদের অপহরণ করা; ঠ. সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া বা হুমকি প্রদান করা; ড. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে নির্বাচনকে কলুষিত করা, এবং ঢ. সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে দমিত করা।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ৯টি নির্বাচনেই কম বেশি লক্ষণীয়। তবে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচন তুলনামূলকভাবে এসব দোষ-ত্রুটি থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল।

---

[৯১] *দৈনিক যুগান্তর*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮।
[৯২] *দৈনিক সমকাল*, ১ জানুয়ারি ২০০৯; *The Daily Star*, 1 January 2009.

সুপারিশ

বাংলাদশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করা গেছে সেগুলোকে দূরীভূত করে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; ২. একটি কঠোর নির্বাচন আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে; ৩. নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে; ৪.ছবি সংবলিত পরিচয়পত্র পদান করতে হবে; ৫. দলনিরপেক্ষ পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ প্রদান করতে হবে; ৬. জালভোট প্রদান রোধ এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; ৭. একাধিকবার ভোট গণনার ব্যবস্থা করতে হবে; ৮. প্রচলিত ভোটিং পদ্ধতির পরিবর্তে ভোটিং মেশিনের প্রচলন করতে হবে; ৯. ভোটাররা যাতে অর্থের দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেজন্য নির্বাচনী ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে; ১০. নির্বাচনী ব্যয় যাতে হ্রাস পায় সেজন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পোস্টার/লিফলেট প্রকাশ প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজন করতে হবে; ১১. সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে; ১২. নির্বাচন সংক্রান্ত সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে; ১৩. নির্বাচনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করতে হলে কালো টাকার মালিক, পেশি শক্তির অধিকারী, বিল ও ঋণ খেলাপি এবং দাগি অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের মনোনয়ন প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে; ১৪. দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কার আনতে হবে। নুনতম তিন বছরের জন্য দলীয় সক্রিয় সদস্যপদ এবং মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগত ভূমিকা প্রদান হতে পারে এমন সংস্কারের অংশ। বিত্তশালীরা টাকার বিনিময়ে যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রয় করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে; ১৫. নির্বাচন কমিশনের জন্য স্বাধীন সচিবালয় স্থাপন, এর আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান ও এতে সৎ, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ এবং সাহসী ব্যক্তিদের মনোনয়ন প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী; ১৬. রাজনৈতিক দলসমূহের সংস্কার এবং রাজনীতিবিদদের সদাচরণ করতে হবে; ১৭. রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে এবং স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, দলবাজি, কায়দাবাজি, ও উগ্রবাদের অবসান এবং দুর্বৃত্তদের লালন পালন ও মানোনয়ন প্রদান বন্ধ করার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।[৯৩]

উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন সহ অন্যান্য নির্বাচনকে আরো অধিক মাত্রায় সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করা সম্ভব বলে আশা করা যায়। দেশে বিদেশে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এ সুপারিশগুলো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। সর্বোপরি নির্বাচনকে সুন্দর, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে হলে সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ জনগণকে গণতান্ত্রিক মনোভাবাসম্পন্ন হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে । কেবলমাত্র এভাবেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে এবং দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা আরো অধিকতর বিকাশ লাভ করতে পারে ।

---

[৯৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫।

উপসংহার

একটি জাতির রাজনৈতিক উন্নতি, তার সরকার ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে এর গণতান্ত্রিক বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন একটি বৈধ ও উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ মতকে বিবেচনায় এনেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার নিমিত্তে ১৯৭২ সালের সংবিধানে নির্বাচনকে একটি উপযুক্ত পথ হিসেবে বেছে নেওয়া হয় । বাংলদেশের ৩৯ বছরের ইতহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে মোট ৯টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচনের মধ্যে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটিতে সীমিত আকারের অনিয়মের পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা তৎকালীন রাজনৈতিক সরকারের মর্যাদাকে অনেকাংশেই খর্ব করেছিল । পরবর্তীতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারেনি । অবাধ ও নিরপেক্ষতার পরিবর্তে নির্বাচনী অনিয়ম ও দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ফলে গণতন্ত্র হয়েছে কলুষিত। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে অনেকাংশেই ছিল সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ। ফলে গণতন্ত্রের আশার বাণী সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। তবে এ সময়ের মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যা গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো বাদ দিয়ে বাকি নির্বাচনগুলো রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারগুলো নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার নিমিত্ত পরিচালনা করেছে এবং সেগুলোতে নির্বাচনী অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

৯টি সংসদ নির্বাচনের উপাত্ত থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এ নির্বাচনগুলোতে বলপ্রয়োগ, জালভোট প্রদান, ভোট গণনায় কারচুপি ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও সহিংসতা, ব্যালেট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভোট কেন্দ্র দখল, কালোটাকার ব্যবহার, পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসারদের অপহরণ করা, সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে না দেয়া, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং মিডিয়া ক্যু সহ অন্যান্য অনিয়ম লক্ষণীয় ছিল। বর্ণিত সুপারিশের আলোকে নির্বাচন সম্পন্ন করা গেলে অনেকাংশেই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করা যায়। যা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে আরো বিকশিত করবে এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

কুমিল্লার সাময়িকপত্রে রাষ্ট্রভাষা-চিন্তা

মামুন সিদ্দিকী*

Abstract: The great thinking flows about the Mother and State-Language of Bengalee during the nineteenth and earlier stage of twentyth century. This thinking is the elaborated form of former current during before and after the creation of Pakistan. Then magazines and periodicals were published mainly from Kolkata. Five essays are found from the district town Comilla of East-Bengal about State-Language in *Comilla Victoria College Magazine* and *Joyonti* (The Jubilee) on this context. These are the important materials on the history of State-Language thinking. What thinking are flourished in centrally simultaneously locally are reflected on this essays. For this, the demand of Bengali as State-Language got a strong foundation. The importance analysis is the aim of this essay uttering the background of State-Language thinking of East-Bengal presenting those essays.

১.

মাতৃভাষা-প্রীতি বাঙালি মননের বিশিষ্ট দিক। বাঙালির মানস-জগতে বাংলা ভাষার রয়েছে শাশ্বত ও পবিত্রতম স্থান। কিন্তু কী করে এই চেতনা রাষ্ট্রভাষা চেতনায় সমৃদ্ধ হয়? এ জিজ্ঞাসার মাঝে লুকিয়ে আছে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা চেতনার বিভিন্ন পর্যায়। উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলিম লেখকদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে নানামুখী দ্বিধা-সঙ্কট, সন্দেহ-সংশয় কাজ করেছে। তৎকালীন সাময়িকপত্রে এর পরিচয় স্পষ্টরূপে দেখা যায়। সময়ের দোলাচলে তা আরও স্বচ্ছতা লাভ করে। এই স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে সংবাদ-সাময়িকপত্র। সংবাদ-সাময়িকপত্রেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়, বাংলা ভাষার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মননশীল ও বিতর্কমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ পেতে থাকে। বলতে গেলে এটাই ভাষা আন্দোলনের বীজতলা। তা কাল পরিক্রমায় পরিণতি লাভ করে রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করে।

২.

কুমিল্লা জেলা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িকপত্রে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধের খোঁজ পাওয়া যায়। ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের এসব মত ও মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এগুলোর বিষয়-আশয় ও যুক্তিতর্ক বোঝার জন্য ভাষা আন্দোলনের পটভূমির দিকে চোখ ফেরাতে হয় যে কোন প্রেক্ষাপটে এই প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো রচিত হয়েছিল।

---

* মামুন সিদ্দিকী: গবেষণা কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; এম ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আনিসুজ্জামান রসিকতা করে বলেছেন: 'রামের জন্মের আগে রামায়ণ-এর মত পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বির্তক শুরু হয়'।[১] ১৯২০ সালের দিকে ভারতের সাধারণ ভাষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। তখন শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভারতের সাধারণ ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন: 'যদি নিতান্ত ইংরাজী ছাড়িতে হয় তবে সাধারণ ভাষা হইবার পক্ষে দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পরে উর্দ্দুর দাবী অগ্রগণ্য। তারপর বাঙ্গালা, তারপর হিন্দী।' তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে বলেছেন: 'সাহিত্যের শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে একটি মাত্র ভাষা সাধারণ ভাষার দাবী করিতে পারে তাহা বাঙ্গালা ভাষা।[২] বলা যায়, এখান থেকেই বাঙালি মননে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। অবশ্য তার কারণও ছিল। কারণ পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় ইতোমধ্যে রাজনৈতিকভাবে বেশ সচেতন হয়ে ওঠে। এবং তার প্রতিফলন ভাষা নিয়ে পরিকল্পনার মাঝে লক্ষ্য করা যায়। 'অনেক আগে থেকেই কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রশস্তি নির্দেশক বেশ কিছু লেখা শুরু হলেও সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক বির্তকে ১৯৩৭ সালের দিকেই সম্ভবত বাংলা ভাষার দাবী উত্থাপিত হয়। ...লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার আগে যখন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে হিন্দীকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জোর প্রচেষ্টা ও তৎপরতা চলে তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।'[৩] 'হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা দাবী হিসেবে ভারতের মুসলমানদের পক্ষ হতে উর্দুকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা ও দাবী উত্থাপিত হয় অত্যন্ত জোরালোভাবে।'[৪]

সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হিন্দি ও উর্দু ভাষার সপক্ষে জোর বিতর্ক চলার প্রভাবে যখন ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যেকার প্রধান দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করছে, ঠিক সেই সময় বঙ্গদেশ থেকে হিন্দী ও উর্দুর বিপরীতে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবী পেশ করা হয়।'[৫] এভাবেই প্রথমত মাতৃভাষা-প্রীতি এবং তারপর তা রাষ্ট্রভাষা চেতনায় পরিণত হয়। এবং পূর্ববঙ্গের জনগণের চাওয়া-পাওয়া, স্বকীয়তা এবং স্বাদেশিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য 'বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হলেও বাংলা ভাষার সপক্ষে প্রকৃত আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের শেষের দিক থেকে।'[৬] ১৯৪৭ সালের ১৯ মে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত ১৭ মে হায়দারাবাদ থেকে প্রেরিত এক সংবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জামান মজলিশ-এ-ইত্তেহাদুল মোছলেমীনের বার্ষিক অধিবেশনে বলেন যে, 'উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে বলে জাতীয় ভাষায় প্রশ্ন বর্তমানে একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে এবং হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত

---

[১] আনিসুজ্জামান, ভাষা বিতর্ক- প্রথম পর্যায় (ঢাকা: দৈনিক ভোরের কাগজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)

[২] বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৯-১৯০

[৩] আতিউর রহমান/লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০) পৃ. ৩৪।

[৪] মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন– সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৭), পৃ. ২-৩ ।

[৫] *ভাষা আন্দোলন- সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, পৃ. ৩।

[৬] *ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, পৃ. ৩৭।

করার কংগ্রেসীরা যে সোরগোল তুলিয়াছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।' বশীর আল হেলাল এ ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন : 'মনে হয় ১৯৪৭ এর জুন মাস থেকেই বাঙালি মুসলমান লেখক-চিন্তাবিদরা পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা নিয়ে লিখতে শুরু করেন, ওই সংবাদটি বা অনুরূপ আরো কোন সংবাদ তার কারণ।'[৭] তা আরও ঘনীভূত হয় ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ ঘোষণার পর- যখন বোঝা গেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। জুলাই মাসে ঢাকায় গণআজাদীলীগ নামক একটি সংগঠনের ঘোষণায় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করা হয়।[৮] তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ যে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পক্ষে অভিমত দেন– তা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই প্রতিবাদে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ দৈনিক আজাদে প্রকাশ করেন।[৯] তার আগে আবদুল হক 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব', 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে', এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক চারটি প্রবন্ধ লিখেন দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক আজাদ ও বেগম-এ। মাহবুব জামাল জাহেদী 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধ লিখেন ইত্তেহাদে। ফররুখ আহমদ সওগাত-এ লিখেন 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ। মুহম্মদ এনামুল হক নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্টি' মাসিকপত্রে লিখেন 'পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধ।[১০]

ঠিক এই সময়ই বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্রে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলতে থাকে। শুধু জাতীয় পত্রিকায়ই নয় আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায়ও তা বেশ সাড়া জাগায়। সিলেটের সাপ্তাহিক নওবেলাল, মাসিক আল-ইসলাহ, যুগভেরী, আসাম হেরাল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় ভাষা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর- আর অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভর করে শিক্ষার ওপর- আর এ শিক্ষা অবশ্যই নির্ভর করে তার ভাষার উপর এবং এই ভাষা অবশ্যই তার মাতৃভাষা। এ কারণেই লক্ষ করা যায়, যে-আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালে, বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় সময়ের আবর্তে রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করে একটি পূর্ণাঙ্গ চেতনায় পরিণত হয় এবং তার প্রভাব একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সংবাদ-সাময়িকপত্রে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়ে যায়। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সেই সময় ছিল রাষ্ট্রভাষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার, গভীরভাবে অভিনিবেশের। একটি নবীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একটি জাতির একটি দেশের সংস্কৃতির পরিচয়- জনমানুষের অস্তিত্বের সুক্ষ্মতর দিক একথা তৎকালীন লেখকসমাজ গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তারা অত্যন্ত জোরালোভাবে রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর একটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ (প্রতিষ্ঠা: ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা– বাংলা না উর্দু?'

---

[৭] *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ১৯১-১৯২

[৮] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* প্রথম খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৭-১৮

[৯] *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯

[১০] আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬)

নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে, আবুল কাসেমের সম্পাদনায়। পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা', আবুল মনসুর আহমদ 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' এবং আবুল কাসেমের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই সময়ই। এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক ও অসন্তোষ দেখা দেয়।[১১] শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ ডিসেম্বর ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা চিন্তা শুধু সংবাদ-সাময়িকপত্রে নয়, রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে রাজপথে চলে আসে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ যেমন কবি গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক মুজিবুর রহমান খাঁ, আকরাম খাঁ, সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই এসময় যেমন বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে অব্যাহত ধারায় বিভিন্নজনের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে, তেমনি বিপরীত স্রোতের লেখকদের উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষেও রচনাদি প্রকাশ পেতে থাকে।[১২]

বলা যায়, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল, স্বাভাবিক গতিধারায় সুচিন্তিত বিতর্কের মাধ্যমে, বাংলা-বিরোধীদের অপতৎপরতার বিপরীতে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। এর প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক ফল হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি।

৩.

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে পূর্ববঙ্গ যখন মুখর- সংবাদ-সাময়িকপত্র যখন রাষ্ট্রভাষা নিয়ে চিন্তামগ্ন তখন কুমিল্লার জনমানসে এর প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল তা এত বছর পর জানা খুব কঠিন। তখন কুমিল্লা থেকে উল্লেখযোগ্য কোন পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। যদিও বিশ শতকের প্রথম ও শেষ দিকে কুমিল্লা সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রকাশনা গৌরবোজ্জ্বল। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-চাঁদপুর অর্থাৎ তৎকালীন ত্রিপুরা জেলা থেকে প্রকাশিত সমকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে *ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ* (কর্মাধ্যক্ষ: ললিতকুমার চক্রবর্তী, ১৮৭৯), *ত্রিপুরা হিতৈষী* (গুরুদয়াল সিংহ, ১৮৯৬), *ত্রিপুরা* (শঙ্করীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৩২), *ত্রিপুরা গাইড* (কাদম্বরী গুপ্তা, ১৯৩৪), *জনমত* (ননী গোপাল চ্যাটার্জী, ১৯৪০), *তওহিদ* (মোহাম্মদ হাসান ইমাম), *কশাঘাত* (ধীরেন সেন, ১৯৪০), *হিন্দু* (অমলা দাস, ১৯৪১), *প্রতিনিধি* (রজতনাথ নন্দী); পাক্ষিক পত্রিকার মধ্যে *প্রজাবন্ধু* (পূর্ণচন্দ চক্রবর্তী, ১৯২০), *নাজাত* (মোহাম্মদ সেকান্দর আলী, ১৯২৬), *দরদী* (১৯৩৮), *সন্তান* (রামকানাই দত্ত); মাসিক পত্রিকার মধ্যে *ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারণী* (কৈলাশচন্দ্র সরকার, ১৮৬০), *ঊষা* (অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৮৯৩), *হীরা* (অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৮৯৪), *সবুজ বাংলা* (খানসাহেব ওসমান আলী, ১৯০০), *প্রতিনিধি* (রজনীনাথ নন্দী, ১৯০৩), *যোগী সম্মিলনী* (রাধা গোবিন্দনাথ, ১৯১২), *পল্লী প্রদীপ* (রমনী মোহন চক্রবর্তী, ১৯২০), *আল*

---

[১১] *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১।

[১২] আবদুল মতিন/ আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ৩৩।

বুশরা (সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ, ১৯২১), *রবি* (মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মন, ১৯২৪), *চুন্টা প্রকাশ* (অপূর্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯২৬), *ত্রিপুরা* (অমিয় চক্রবর্তী, ১৯৩০), *পূর্ব্বাশা* (অজয় ভট্টাচার্য ও অজিত কুমার গুহ), *ত্রিপুরা লক্ষী* (ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৯৩৫), *বাংলাদেশ* (কানু সেন, ১৯৩৮), *নিউ এ্যকুয়িটি* (কামিনী মোহন পাল, ১৯৩৯), *জয়ন্তী* (বীরেশ্বর ভট্টাচার্য ও শচীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৩৯), *সন্তান* (জীতেন্দ্রনাথ দত্ত), *নবযুগ* (অপূর্ব কাঞ্চন দত্ত), *কল্যাণী* (ক্ষীরোদ বিহারী চক্রবর্তী, ১৯৩৯) উল্লেখযোগ্য।[১৩]

এ প্রসঙ্গে *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ম্যাগাজিন* ও *জয়ন্তী* পত্রিকার যৎসামান্য পরিচয় তুলে ধরা যায়। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) কুমিল্ল জেলা তথা সন্নিহিত অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে কলেজ সাহিত্যপত্রের গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত সংখ্যা বের হতো, কখনও কখনও ইংরেজি মাধ্যমে। চল্লিশের দশক, এমনকি পঞ্চাশের দশকেও সাহিত্যপত্র প্রকাশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিল। এগুলি একেক সময় একেক নামে নামাঙ্কিত হতো, যেমন– ক্রণিকল, সাহিত্যপত্র, ম্যাগাজিন। এগুলিকে যে কোনো উন্নত সাময়িকপত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতো।[১৪] *জয়ন্তী* ছিল অত্যন্ত মানসম্পন্ন সাহিত্যপত্রিকা। ১৩৪৬ সালের বৈশাখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রী বীরেশ্বর ভট্টাচার্য ও শ্রী শচীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। আঙ্গিকশৈলী, বিষয়-বৈচিত্র্য ও রুচিমানে *জয়ন্তী* ছিল অনন্য। পত্রিকাটি মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক হলেও তাতে রাজনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, দর্শন, ইতিহাস, রম্য রচনা, নাটক, একাঙ্কিকা, সমকালীন সংবাদ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হতো, যা তার সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল।[১৫]

তবু এখানে ভাষা বিতর্কে সূচনাপর্ব থেকে পরিণতি পর্ব পর্যন্ত কতিপয় চিন্তাভাবনা তুলে ধরা যায়, যাতে এই অঞ্চলের মানুষের মতামত স্পষ্ট হয়; স্বচ্ছ হয় তাদের সংস্কৃতি, জীবনাচারণ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ।

১৯৩৬ সালের দিকে প্রাদেশিক ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু নিখিল ভারতের সাধারণ ভাষার প্রশ্নে যখন হিন্দীকে নির্বাচন করার প্রচেষ্টা চলে তখন *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ম্যাগাজিন* ১৯৩৬-এর সম্পাদকীয়ের একাংশ 'আমাদের সমস্যা'য় বলা হয়:

> 'প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে প্রত্যেক প্রদেশেই যদি প্রাদেশিক ভাষার শিক্ষা দান করা হয় তবে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ভাবের প্রদানের ব্যাঘাত জমিতে পারে। এইজন্য সর্ব্বভারতের জন্য একটী Linguafranca নির্ব্বাচন করিবার আন্দোলন চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কয়েকজন হিন্দিকে নিখিল ভারতীয় ভাষায় পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা হিন্দী ভাষার এই দাবী মানিয়া লইতে নারাজ। ভারত বর্ষের সমস্ত ভাষার মধ্যে আজ বাংলা ভাষা

---

[১৩] মামুন সিদ্দিকী (সম্পা.), *রজতনাথ নন্দী : জীবনী ও সাংবাদিকতা* (ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ১৭।

[১৪] তিতাশ চৌধুরী, *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ১৫৬, ১৬০।

[১৫] তিতাশ চৌধুরী, *কুমিল্লার সংবাদপত্র ও সাময়িকী* (কুমিল্লা: ভিনাস প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ.৭৫-৮৪।

> শ্রেষ্ঠ। সেইদিন মহাত্মা গান্ধীকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে যে রত্নরাজী দান করিয়াছেন তাহা অন্য ভাষায় নাই। এইসব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বাংলা ভাষার দাবী সবচে বেশী বলিয়া মনে হয়।'

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর পূর্ব বাংলার মানুষের মনে ভাষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন *জয়ন্তী* পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪৭ এর সম্পাদকীয় বক্তব্য 'বঙ্গভাষা'য় বলা হয়:

> আজ গৃহে ও প্রবাসে বাঙ্গালীর মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যে প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহা সত্যই ভরসার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বঙ্গভাষাকে ভারতের গৌরবের জন্যই রাষ্ট্রভাষায় উন্নীত করিতে হইবে।

১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরও মানুষ ভাবতে পারেনি ভারত বিভাগ হতে যাচ্ছে। এর আগে যে ভারতের সাধারণ ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায়, তা চল্লিশে এসেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ছিল অকুণ্ঠ। *জয়ন্তী* দ্বিতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা মাঘ ১৩৪৭-এর সম্পাদকীয় 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা'তে বলা হয়:

> 'পাটনায় অনুষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের (১৭শ) অধিবেশনে ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিমত জ্ঞাপন করেন হিন্দী ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া সমীচীন। কারণ হিন্দী ভাষায় ভারতের ১৬ কোটি লোক কথা বলে। কাজেই বাজার চলতির দিক দিয়া হিন্দী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে যুগান্তর মন্তব্য করিয়াছে যে- এইরূপ বিধানে সকলকেই তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; স্বীয় প্রাদেশিক মাতৃভাষা, হিন্দী ভাষা ও ইংরেজী। কারণ ইংরেজী ভাষাও (বৈদেশিক ভাব সংযোগের জন্য) অপরিহার্য বিশেষত ইংরেজী ভাষার শিকড় আমাদের সংস্কৃতির অন্তস্থল পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট আর ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগে আত্মস্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই এবং বাঞ্চনীয়ও নহে- কাজেই ইংরেজী ভাষা অপরিহার্য্য। হিন্দী সম্বন্ধে যুগান্তর (২৫শে মাঘ) বলেন যে, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলে বাংলা, বিহার, আসাম এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অসুবিধা হইবে, কেবল হিন্দী ভাষীদের উহাতে সুবিধা হইবে। কাজেই যুগান্তরের অভিমত ইংরেজী ভাষা দৃষ্টত জাতীয়তা বিরোধী হইলেও তাহাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযোগী। এ সম্বন্ধে যুগান্তর ডাঃ প্রসাদকে আরও বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানান।
>
> বাজার চলতির দিক দিয়া ডাক্তার প্রসাদ হিন্দী ভাষাই সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সুবিধাজনক মনে করিয়াছেন সত্য কিন্তু উহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে গোলযোগ উঠিবে না ত? পাকিস্তান পরিকল্পীগণ সর্ব্বভারতে এক ভাষা চলিতে পারে উহা স্বীকার করিবেন ত? না উর্দ্দু প্রশ্ন উঠিবে? অন্তত পাকিস্তানের জন্য মুসলিম সংস্কৃতির দোহাই দিয়া তাহারা একথা উত্থাপন করিবেন না ত? মুসলমান আমলে যখন সেদিনও অখণ্ড ভারতে মুসলমানী ভাষাতেই কাজ চলিয়াছে আজও তাহাই চলিবে? আবার অন্যদিক হইতে বীর বিনায়ক সাভারই করপন্থীগণ হয়তো বলিবেন, আসমুদ্র হিমাচল এবং আবঙ্গ গুর্জ্জরকে সংস্কৃত ভাষার অনুশাসনেই চলিতে হইবে। ডাক্তার প্রসাদের মন্তব্য দেখিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের নিয়ন্তাগণ হয়তো মনে করিতেছেন, বাজার চলতি প্রসার দ্বারা ত ভাষা নির্ব্বাচন চলিবেই না- কারণ শিক্ষার প্রসার তাঁহাদের মতে 'Precarions'-তাহারা বলেন শিক্ষার প্রসার

কমাইয়া উহার তুঙ্গতা বৃদ্ধিই সমীচীন অর্থাৎ শিক্ষারূপ স্তম্ভের বিস্তৃত ভিটার ইটগুলি চারদিক হইতে খুলিয়া লইয়া (উহাতে ভিত্তি শুরু হউক ক্ষতি নাই) একেবারে চূড়ায় লাগাইয়া দিয়া উহার উচ্চতা সম্পাদন করিতে হইবে। যেন আজিকার এই শিক্ষা ক্ষেত্রের ভূকম্পনের দিনেও উহাই নিরাপদ।

মোটের উপর এইরূপ ধারণাধারীগণ কেবল প্রসার দেখিয়া হিন্দী-ভাষাকে সমর্থন করিতে পারে না। ইহাই ধারণা করা উচিৎ। এই ধরণের বিরোধিতাস্থলে একভাবে যুগান্তরের মন্তব্যকে একেবারে অবহেলা করা যায় না : কারণ জাতীয়তা রক্ষা করিতে গিয়া যেখানে চুলাচুলি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা যায় সেখানে বরং পূর্ব্ব প্রচলিত বিজাতীয় তৃতীয় পক্ষই ভাল। আর ভাষার প্রসার অপেক্ষা ভাষার সম্পর্কেই যদি রাষ্ট্রভাষার অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন মূল্য থাকে অথচ একান্তভাবে কোন ভারতীয় ভাষাই গ্রহণযোগ্য হয় তবে আমরা বলিব একমাত্র বঙ্গভাষাই এই দিক দিয়া রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযোগী। কেননা, পাশ্চাত্য ভাবধারাকে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাণীকে জগতে বহন করিয়াছে বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বৃটিশ রাজত্বের প্রথম হইতে অদ্যাবধি বঙ্গভাষার ভিতর দিয়াই পাশ্চাত্য ভাব তরঙ্গ বিশেষভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

(৭ই ফাল্গুন) আনন্দবাজারের একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে : '১৯৪১ সালেও বাঙ্গলার চিন্তা সাধনা কর্ম্ম ক্ষমতা পৃথিবীর আলোচনার বস্তু। বিংশ শতাব্দীর প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা বাঙ্গালী ভারতকে বাড়িয়ে চলেছি।' বাঙালী ভাষা যেমন সম্পন্ন, প্রাচ্যের ভাবধারার সহিত ইহার যোগসূত্রও তেমনি ঘনিষ্ঠ, আবার উহা জীবন্তও ঠিক তেমনি; কাজেই এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রভাষাকে অনুপযুক্ত নির্ব্বাচন বলিবার কিছু নাই। দ্বিতীয়ত সমগ্র ভারতের পক্ষে ১৬ কোটি লোকের ভাষাও বিশেষ কিছু নয়। বাংলা ভাষার প্রসার অপেক্ষাকৃত কম একথা সত্য, কিন্তু সমৃদ্ধির দিক দিয়া এবং বৈদেশিক ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়া হিন্দী অপেক্ষা ইহা অনেক উন্নত; বিশেষত একটা রাষ্ট্রীয় ভাষার নির্ব্বাচন উহার সাহিত্যিক সম্পদ না দেখিয়া করা রাষ্ট্রের পক্ষেও গৌরবের বিষয় নহে- নির্ব্বাচকের পক্ষেও গৌরবের নহে।'

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সংবাদ-সাময়িকপত্রে ব্যাপক চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বাংলা ভাষার পক্ষে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তখন ১৯৪৭ সালে *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ম্যাগাজিন* এর সম্পাদকীয় একাংশ 'উর্দ্দু-বাংলা বিরোধ' এ বলা হয়:

> উর্দ্দু ও বাঙ্গলা ভাষার বিবাদ নিয়া অনর্থক রক্ত ক্ষয়ের পরিবর্ত্তে সুবিবেচক, বুদ্ধিমান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সুনির্দিষ্ট মতামতেরই বিশেষ প্রয়োজন– কারণ আত্ম-কলহে জাতির স্বাধীনতার অন্তরালে গড়িয়া উঠে বিষাক্ত গ্লানি– যাহা পরাধীনতার নামান্তর।'

রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক আরো ঘন হয়ে ওঠে- পুরো পাকিস্তানের সচেতন মহলে একটি প্রসঙ্গ সবার মুখে সবার মননে। এই ভাষার প্রশ্ন কেবল ভাষার জন্যই, এর পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। ঠিক সেই সময়ে *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ম্যাগাজিন* ডিসেম্বর ১৯৪৭ (প্রকাশ ১৯৪৮) এ হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মূল্যবান প্রবন্ধ 'রাষ্ট্রভাষা' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে বলা হয় :

> পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে বেশ জল্পনা-কল্পনা চলছে। একদল বলছেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়াই উচিত। আর একদল বলছেন যে, না উর্দ্দু হতে হবে। অবশ্য যারা উর্দ্দুর পক্ষপাতী তাদের মধ্যে বাঙ্গালী কয়জন আছেন তা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিবেচনা হবে আগামী গণপরিষদের অধিবেশনে। কিন্তু

গণপরিষদে যখন এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে তখন হয়ত বা দেখা যাবে যে উর্দ্দুই রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেছে। যারা সেখানে প্রভাবশালী যত হোক তার প্রায় সবই ঐ অঞ্চলের অর্থাৎ যারা উর্দ্দুরই পক্ষপাতী। আর পাকিস্তান মন্ত্রীমণ্ডলীতে বাঙ্গালী যদিও আছে কিন্তু সেখানে বাঙ্গালীর প্রভাব কতটুকু তা অবশ্যই বিবেচনা সাপেক্ষ। শিক্ষা-মন্ত্রীর কিছুদিন আগেকার এক বিবৃতিতে দেখা যায় যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে উর্দ্দুর পক্ষপাতী।

যাহা হউক, রাষ্ট্রভাষা কোনটা হবে- না হবে সেটা নিশ্চিত করে বর্তমানে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত কোনটা রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের দেশের এবং দেশের কল্যাণ হবে। উর্দ্দু ভাষার সম্পদ এবং বাংলা ভাষার সম্পদের মধ্যে তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, উর্দ্দুও ভারতের একটা প্রাচীন এবং উন্নত ভাষা, ঐ ভাষারও সাহিত্য আছে, উপন্যাস আছে, সমালোচনা সাহিত্য আছে, দর্শনশাস্ত্র আছে, কিন্তু বাংলা ভাষার তুলনায় তার সম্পদ কতটুকু সেটাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। উর্দ্দু ত দূরের কথা, হিন্দি ভাষা না জানা থাকলে সমগ্র ভারত ঘুরে আসা যায় না। কিন্তু তার সাহিত্যিক সম্পদও বাংলা ভাষার কাছে ম্লান হয়ে যায়। বর্ত্তমান জগতের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই শাসন ব্যবস্থা চালান হয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা। অর্থাৎ অধিক সংখ্যক জনসাধারণ যাকে ভাল মনে করে, শাসন ক্ষমতা তার হাতেই দেওয়া হয়। সেই দিক দিয়ে যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা এবং উর্দ্দুর মধ্যে কোনটাকে অধিকাংশ লোক চায় তার একটা হিসাব নেওয়া হয়, তা হলে বাংলা ভাষার দিকেই অধিকাংশ জনসাধারণের সহানুভূতি থাকার সম্ভাবনাই অধিক, কেন না পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক, এই দিক দিয়ে বিচার করলেও বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের ভাষার উৎকর্ষ তার উন্নতির একটা প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বিশ্বসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করুক। এ বিষয়ে বাংলা ভাষা পূর্ব হতেই তার স্থান করে ফেলেছে। উর্দ্দু ভাষার সে স্থান অধিকার করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। সেই সময়টা যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির প্রতি নিয়োগ করি তা হলে সেটা কি বাংলা ভাষাকে আরও উপরে উঠাবে না? বিশ্ব-সাহিত্যে তার আসন আরও উঠবার আশা কি আমরা করতে পারি না? না সেটা দুরাশা করা হয়? যদি তাই হয় তা'হলে ত কথাই নেই, কিন্তু যদি তা না হয় তবে কেন আমরা জগতের সামনে আমাদের ন্যায্য আসন অন্তত কিছুদিন খালি রাখব, আমাদের সুন্দর, সবল এবং সুস্থ বাংলা ভাষা, বর্ত্তমানে যার সাধনা করলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত স্থলে পৌছতে পারব। অবশ্য কথা উঠতে পারে, উর্দ্দুকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তার সাধনা করা হয় তা হলে উর্দ্দুও কি বাংলার সমান মর্যাদা পেতে পারে না? পারে, কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ। একটা ভাষাকে উন্নত করতে হলে যথেষ্ট সময় দরকার। সেই সময়টা অতিবাহিত করবার পূর্বে যা পাওয়ার তা পেতে পারি, যদি আমরা বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিই।

অন্য একটা বিষয়ও বিবেচনা করবার রয়ে গেছে। তা হচ্ছে বাংলাকে যদি পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা হলে আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের খুব সুবিধে হবে, কেন না আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের বাংলা শেখা একটা মহা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠবে। আর উর্দ্দুকে প্রাধান্য দেওয়া হলে হবে ঠিক তার উল্টো। এই দিক দিয়ে অবশ্য বলা

যেতে পারে যে রাষ্ট্রভাষা দুই ভাগের জন্য দুটো করা হোক। কিন্তু সেখানেও আবার কিছুটা অসুবিধার কারণ আছে কেননা যদি প্রয়োজনবোধে এখান থেকে লোক সেখানে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে সাময়িকভাবে নেবার প্রয়োজন হয় তা হলে এখানকার লোক সেখানে গিয়ে কাজ চালাতে পারবে না। আবার সেখান থেকে এখানে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে যদি সরকারী কর্মচারী স্থানান্তরিত করা যায় তবে তাদের বেশ অসুবিধাই হবে। অসুবিধা কেন, কাজই চালাতে পারবে না। এই যদি হয় তা হলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান ভাষার দিক দিয়ে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যায়। আর করা যেতে পারে উভয় পাকিস্তানের অধিবাসীরাই বাংলা এবং উর্দ্দু উভয় ভাষাই পড়বে। তাতেও অসুবিধার অন্ত নেই; কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দ্দু ছাড়া আরও কয়েকটা ভাষা আছে। সেই সকল ভাষাভাষীরা তাদের মাতৃভাষা শিখবে, উর্দ্দু শিখবে আবার বাংলাও শিখবে। তার উপর মুসলমানগণ মনে করবে আরবিটাও পড়া দরকার, তা না হলে কোরাণ পড়া যাবে না। আর হিন্দুরা মনে করবে যে সংস্কৃত পড়া দরকার, তা না হলে ধর্মশাস্ত্রগুলো পড়া যাবে না। এই হলে যাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা বাংলা নয় তাদের মোট চার ভাষা শিখতে হবে। তদুপরি ইংরাজীটাও শেখা দরকার। এই করতে গেলে আমাদের একটা ভাষাও ভালভাবে শেখা হবে না। আর তার উপর অন্যান্য বিষয় পড়ার সময়ই আমরা পাব না। বর্ত্তমানে এক ইংরাজীর চাপেই অন্য দিকে মন দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তার উপর যদি আরও দুটো ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তা হলে ত আরও হবে না। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে 'ইংরাজীও বিদেশী ভাষা'? কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট উর্দ্দু বা পাঞ্জাবীর নিকট বাংলা বিদেশী ভাষা নয় কি?

ঐ সকল বাদ দিয়ে আমরা যদি বাংলা ভাষার উৎকর্ষ কতটুকু তা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে বলা যেতে পারে যে বর্ত্তমানে বাংলা ভাষার যা উন্নতি তার প্রকৃত উন্নতি যতটা হওয়া উচিত ছিল তার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কারণ আমাদের শতকরা দশ জন লোক মাত্র শিক্ষিত। এই দশজনের চেষ্টায় বাংলা ভাষার এতটুকু উন্নতি হয়েছে। আর বাকী শতকরা নব্বই জন যাদের সাহায্য পাওয়া যায় নাই বা বর্ত্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের সাহায্য যদি পাওয়া যেত তা'হলে বাংলা ভাষা আরও দশগুণ বেশী না হোক অন্তত কয়েকগুণ উন্নত হ'ত নিশ্চয়ই। এই বিরাট জনসাধারণের সাহায্য যদি আমরা ভাষার উন্নতির জন্য পেতে চাই তবে আমাদের প্রয়োজন- আমাদের মাতৃভাষাকে আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা এবং শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করা। আমরা যদি রাষ্ট্রভাষার স্থানে বাংলাকে বসাতে চাই তা হলে আমাদের উচিত দেশের সর্বত্র হতে এই দাবী তোলা যে বাংলা আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হতেই হবে। তা' না হলে চলবে না। কারণ ইংরাজী স্থলে যদি আমরা উর্দ্দুকে বসাই তবে ইংরাজীর খাটুনি আমাদের দিতে হবে উর্দ্দুর দিকে। অবশ্য ইংরাজীর তুলনায় কিছুটা কম হতে পারে, কিন্তু সে আসে যায় না, প্রায় একই কথা, যার ফলে আমাদের সার্ব্বজনীন শিক্ষা যা ইংরাজীর কৃপায় এতদিন পর্য্যন্ত শহরের আনাচে-কানাচেই সীমাবদ্ধ ছিল তা আবার বন্ধ হয়ে যাবে উর্দ্দুর কৃপায়। সেই জন্যেই আমাদের 'সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করে তুলতে হলে বাংলাকে আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে পাওয়া দরকার। আমার কথা হচ্ছে এই যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদিকে কিছুটা নজর দিয়াছেন। আর জনসাধারণও এদিকে কিছুটা বুঝেছেন। কিন্তু শুধু এতেই চলবে না বাংলাকে আমরা পাকিস্তানের অন্তত পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে চাই-ই, কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি

অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করছে। ভাষার ভিতর দিয়ে আমরা গড়ে তুলব আমাদের জাতিকে, জ্ঞানবান করে তুলব আমাদের অজ্ঞ জনসাধারণকে।'

লক্ষণীয়, লাহোর প্রস্তাবের অব্যবহিত পরে উর্দুর পক্ষাবলম্বন করা হলেও উপর্যুক্ত রচনাগুলিতে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষের স্বকীয়তার ভিত্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সঙ্গে একটি সমীকরণও দাঁড় করানো যায় : ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ মনে-প্রাণে পাকিস্তান রাষ্ট্র কামনা করেছে। আবার তাই এক সময় স্পষ্ট হয়ে বাংলাদেশের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। হিন্দীর বিরুদ্ধে উর্দুর সমর্থন ধর্মীয় চেতনাজাত কিন্তু উর্দু থেকে বাংলাকে সমর্থন অস্তিত্বের কারণে, বিকাশের প্রশ্নে।

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার প্রভাব ভাষা আন্দোলনেও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের উভয় পর্যায়ে কুমিল্লার জনসমাজ পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। একদিকে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের লীলাভূমি, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, অন্যদিকে নব্য মধ্যবিত্তের বিকাশের পটভূমিতে কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন ভাষা-সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য।[১৬] আবার একুশে ফেব্রুয়ারির অব্যবহিত কালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এই সম্মেলন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট পর্যায়। এ সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস আছে যে, আমার দেশের মৃত্যু নাই। আমার দেশের আত্মা যে জনগণ, তারও মৃত্যু নাই। তেমনই অমর আমার এই বাঙ্গালা ভাষা।' সম্মেলনে সংস্কৃতির যে রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার মূলধারা আজও সেদিকে প্রবহমান।[১৭] আর এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার রয়েছে গভীর সম্পৃক্তি ও আত্মীয়তা।

৪.

সংকলিত রচনাগুলিতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নের যে বিবেচনা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছে, যে যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রধান প্রধান সংবাদপত্র তখন প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে। সেই সব সংবাদপত্রে আমরা নানাজনের মননশীল ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রবন্ধ পাই বটে, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে তার কিরূপ প্রভাব পড়েছিল, সচেতন মহল এই বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল তার দলিল খুব কমই আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ম্যাগাজিন* ও *জয়ন্তী*র পাঁচটি রচনা ইতিহাসের তাৎপর্যে মূল্যায়নের দাবী রাখে। কারণ এখানে পাওয়া যায় এই অঞ্চলের মানুষের মেজাজ, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাদের মত-অমত, নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তান ও তার ভবিষ্যত নিয়ে স্বপ্ন এবং প্রবল মাতৃভাষা-প্রীতি। সাতচল্লিশের তুমুল ভাষা বিতর্কের আগেও ভারতের সাধারণ ভাষার জিজ্ঞাসা নিয়ে যে মতামত তাও এক্ষেত্রে সমধিক বিবেচ্য। জনমানসে রাষ্ট্রভাষার জিজ্ঞাসা তখন থেকেই উত্থিত এবং এই জিজ্ঞাসা তার বিকাশের প্রশ্নে বাংলা ভাষার পক্ষে যায়। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি তার চূড়ান্ত পরিণতি।

---

[১৬] মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন* (কুমিল্লা: মাসুম মাজহার, ২০০৪), পৃ. ৭১-৮০।

[১৭] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০১), পৃ. ১০০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

বাংলাদেশে নাট্য-ব্যবস্থাপনা : সাংগঠনিক কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন

মলয় কুমার ভৌমিক*

Abstract : Theatre activities cannot be performed individually, it requires collective effort. Probably, the motivating force contributing to the success in the field of theatre is progressive—ideology based organizational management and efficient leadership. In this article, attempts were made to investigate the nature and characteristics of organizational structure and leadership style of theatre groups. It was observed that the nature of organizational structure, democratic attitude and informal character of leaders and firm commitment of the theatre workers reached the theatre activities of Bangladesh at an international standard level.

ভূমিকা

বাংলাদেশে আধুনিক থিয়েটার বা নবনাট্যের যাত্রা শুরু হয় স্বাধীনতা-উত্তর কালে।[১] ধারাবাহিক নাট্যচর্চা ও মঞ্চায়ন, নাট্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও রীতি-কৌশলের ব্যবহার, দর্শনির বিনিময়ে নাট্য মঞ্চায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পৃথক ডিসিপ্লিন হিসেবে নাট্যের পাঠদান ও ডিগ্রি প্রদান, জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা—এসবও ঘটেছে স্বাধীনতাপরবর্তী কালেই। অন্যকথায় বলা যায় এদেশে নাট্যকে পৃথক শিল্প হয়ে উঠবার জন্য স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।[২] স্বাধীনতাপূর্বকালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে নাট্যচর্চা ছিল না এমন নয়, তবে সে নাট্যচর্চা ধারাবাহিক ছিল না; ছিল সৌখিন এবং অনিয়মিত।[৩]

অবিভক্ত ভারতে কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা 'ওল্ড প্লে-হাউস' অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে ওঠে। ১৭৭৫ সালে 'দি নিউ প্লে-হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশ-পর্যটক হেরাসিম লিয়েবেদেফ কলকাতার ডোমতলায় আর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা

---

*সহযোগী অধ্যাপক (প্রেষণে), নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] আবু বকর, এস.এম., *অনুশীলন : উজান যাত্রার ৩০ বছর*, এস.এম. আবু বকর সম্পাদিত, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অনুশীলন নাট্যদল, ২০০৯) পৃ. ১১।

[২] ঐ, পৃ. ১১।

[৩] হাঁসান আজিজুল হক, *অনুশীলন : উজান যাত্রার ৩০ বছর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

করেন ১৭৯৫ সালে।[৪] ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ধাচের নাট্যচর্চার যাত্রা শুরু হয় এই সময় থেকেই।[৫] বাংলার নিজস্ব নাট্য বা লোকনাট্যের ইতিহাস অবশ্য অনেক প্রাচীন। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারে নিজস্ব নাট্যের এই ধারাটির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। 'যাত্রা পালা' নামে এর একটি ধারা ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলে দাঁড়িয়ে গেলেও গোটা ব্রিটিশ আমল জুড়ে নাগরিক সমাজকে প্রধানত ইউরোপীয় নাট্য-ধারাকেই আঁকড়ে ধরতে দেখা যায়। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'-এর নাট্য-অভিযাত্রার মাধ্যমে।[৬] স্বাধীন ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ-বর্জন ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নাগরিক নাট্য একটা নিজস্ব চেহারা নিতে থাকে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে সে সুযোগ ছিল না। বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাতে হয়েছে ক্রমাগত; পৃথকভাবে নাট্যের বিকাশে নজর দেওয়ার সময় তখন ছিল না। ফলে এই সময়ে 'ড্রামা সার্কেল' (১৯৫৫), 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' (১৯৬৮)-এর মতো দু'একটি সংগঠনের বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগ ছাড়া সামগ্রিক কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এর মধ্যে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় তো কেবল বেতার-টেলিভিশনকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা করতো। স্বাধীনতার পর রাজধানী ঢাকা, বিভিন্ন জেলা শহর, এমন কি থানা পর্যায়ে একে একে নাট্য-সংগঠন গড়ে ওঠে। বর্তমানে দেশে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান'-এর অন্তর্ভুক্ত সক্রিয় নাট্যদলের সংখ্যাই ২২৫-এর ওপরে।[৭] এর বাইরেও দেশে অনেক নাট্যসংগঠন রয়েছে। ফেডারেশানভুক্ত দলগুলোর মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ-ভাগেরও বেশি দল গড়ে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন নাট্যচর্চা করে আসছে। এর মধ্যে উন্নত প্রযোজনা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় অনেক দল আন্তর্জাতিক মান অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। নাট্যে দেশের অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি সম্প্রতি মিলেছে—'ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট'-এর বিশ্বসভার সভাপতি বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে।[৮]

থিয়েটার বা নাট্য হলো যৌগিক শিল্প। সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা, আলো, পোশাক, রূপসজ্জা, অভিনয় ও নির্দেশনা কৌশল ইত্যাদি নানা উপাদান দক্ষতার সাথে সমন্বয় করে নাট্যকে দাঁড় করানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। স্বাধীনতার পর থিয়েটার যেভাবে বিকশিত হবার কথা ছিল তা না হলেও শত বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশের নাট্য যেভাবে দাঁড়িয়েছে তা বিস্ময়কর বৈকি। ব্যাপক অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, আর্থিক সংকট এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলাদেশের নাট্যের এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে কী কারণ কাজ করেছে তা অনুসন্ধান ও

---

[৪] দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯), পৃ. ৪৪ ও ৬২।

[৫] অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, পৃ. ১৯।

[৬] বিজন ভট্টাচার্য, *শতাব্দীর নাট্যচিন্তা*, দেবাশিস মজুমদার ও শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত (কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০), পৃ. ৩৪৩-৩৪৮।

[৭] ম. হামিদ সম্পাদিত, *বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান, ২০০৫), পৃ. ১।

[৮] ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কেন্দ্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও নাট্যোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০১০। স্পেনের মাদ্রিদে ২০০৮ সালের ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের (আইটিআই) ৩২তম বিশ্ব কংগ্রেসে বাংলাদেশের নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার আইটিআই বিশ্বসভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

বিশ্লেষণের দাবি রাখে। অনুমান করা যায়, বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ব্যাপক (সকল নাট্যসংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) সাফল্যের পেছনে অন্যান্য কারণের সাথে দলগুলোর সাংগঠনিক সক্ষমতা ও নেতৃত্বের দক্ষতা তথা ব্যবস্থাপনা-কৌশল ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে নাট্য-ব্যবস্থাপনার পেশাদারি দক্ষতা অর্জন বা সফলতার পেছনের কারণ অনুসন্ধান অথবা সাধারণভাবে নাট্য-সংগঠনগুলোর ব্যবস্থাপনা-কৌশল বিষয়ে তেমন কোনো অনুসন্ধান প্রচেষ্টার কথা জানা যায় না। বক্ষমান নিবন্ধে সাধারণভাবে দেশের নাট্য-সংগঠনগুলোর ব্যবস্থাপনা-কৌশল বিষয়ে একটি ধারণা পাবার জন্য মূলত নাট্য-ব্যবস্থাপনা তথা নাট্য-সংগঠনের কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্র ও বিভিন্ন নাট্য-সংগঠনের প্রকাশিত দলিলাদি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে এই নিবন্ধ।

বাংলাদেশে নাট্য-সংগঠন

বাংলাদেশে নাট্য-সংগঠনগুলো প্রধানত দুই ধারায় বিভক্ত। এগুলো হলো, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ এবং গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের আওতা বহির্ভূত দলসমূহ। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের আওতাভুক্ত দলগুলোই বাংলাদেশে নাট্য-সংগঠনের মূলধারা। নিবন্ধে মূলধারার নাট্য-সংগঠনগুলোই আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে। এর বাইরে অবশ্য আরো একটি ক্ষয়িষ্ণু ধারা রয়েছে। ধারাটি হলো লোকধারার অন্তর্ভুক্ত যাত্রা দল। তবে লোকধারার যাত্রা দলসমূহের অধিকাংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও এতে আধুনিক সাংগঠনিক কাঠামোর অস্তিত্ব নেই। এই জন্য দলগুলোকে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের হিসেব অনুযায়ী ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশে ফেডারেশানভুক্ত সক্রিয় নাট্য-সংগঠন ছিল ২২৫টি। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে অবস্থিত নাট্যদলের সংখ্যা ৫৮টি, ঢাকা বিভাগে (মহানগর ব্যতীত) মোট দল ২৮টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭টি, সিলেট বিভাগে ১৪টি, রাজশাহী বিভাগে ৪১টি, খুলনা বিভাগে ৩৪টি এবং বরিশাল বিভাগে নাট্যদলের সংখ্যা ছিল ১৩টি।[৯] গত ৫ বছরে দেশে সক্রিয় নাট্যদলের সংখ্যা আরো বেড়েছে বলে ফেডারেশানের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন।

ফেডারেশনভুক্ত দলগুলোর প্রকৃতি

আমেরিকায় মঞ্চনাটকের মূলধারা পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে।[১০] ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশেও মূলধারার নাট্য বাণিজ্যিকভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অবিভক্ত ভারতের কলকাতায় ১৮৮৮ সালে 'স্টার থিয়েটার', ১৮৯১ সালে 'সিটি থিয়েটার' ও ১৮৯৩ সালে 'মিনার্ভা থিয়েটার' স্থাপিত হয়েছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।[১১] একই উদ্দেশ্যে 'ক্লাসিক থিয়েটার', 'অরোরা থিয়েটার', 'কোহিনুর থিয়েটার' প্রভৃতিও স্থাপিত হতে দেখা যায়। মূলধারার অন্তর্ভুক্ত না হলেও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় এখনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই ধারার নাট্য-সংগঠন সক্রিয়।

---

[৯] বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা, পূর্বোক্ত।

[১০] F. Bernard Dukore, *The American Theater*, Edited by Alan S. Downer, (Washington: Voice of America, United States Information Agency, 1975), p. 171.

[১১] দর্শন চৌধুরী, পৃ. ২০২, ২৩৮ ও ২৪৩।

বাংলাদেশে মূলধারার নাট্য এখনো পরিচালিত হচ্ছে অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। তবে এই ধারার নাট্য-সংগঠনগুলোর পেশাদারি দক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে ষোল আনা। ফেডারেশানভুক্ত দলগুলো গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ লালন করে। এছাড়া এসব সংগঠনের রয়েছে নিজস্ব সামাজিক অঙ্গীকার। ফলে দর্শনীর বিনিময়ে নাট্য মঞ্চায়ন করে প্রযোজনা ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা থাকলেও নাট্য-সংগঠনগুলো এখনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের নাট্য নির্মাণ করছে না। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন নাট্যদল প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, মানুষকে অধিকার সচেতন, শিক্ষিত ও বিবেকবান, রাজনীতি সচেতন, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক, তথা সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়েই প্রধানত বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। নাটকের বিষয়বস্তুও নির্বাচন করা হয় সেভাবে। এদিক থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাট্য-সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে আরো দেখা যায়, এদেশের নাট্যদলগুলো নিয়মিত নাট্য মঞ্চায়ন ছাড়াও নানা রাজনৈতিক-সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সামাজিক অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য দেশে কোনো কোনো সংগঠন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মঞ্চনাটককে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই প্রচেষ্টা বাস্তবতার মুখ দেখতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে অনেক নাট্যসংগঠনেরই পেশাদারি দক্ষতা রয়েছে। আর এই দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতভাবেই সম্ভব হয়েছে নাট্য-সংগঠনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে কোনো দলের একটি ভালো নাট্য নির্মাণের জন্য যে দক্ষতা ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন পড়ে, তাতে আপনাআপনিই আধুনিক ব্যবস্থাপনা-কৌশলের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে নাট্য-সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো

যে কোনো আনুষ্ঠানিক সংগঠনে দলীয় কর্মীদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।[১২] আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের এই প্রভাব ইতিবাচক হতে পারে, হতে পারে নেতিবাচকও। সংগঠন যেহেতু মানুষকে নিয়ে সেহেতু মানুষের পারস্পরিক অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ককে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এ কারণেই অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের উপাদানটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হয় এবং এই সম্পর্ককে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের পথে ইতিবাচকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়।

বড় বড় সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক অনেক সময় উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করে। সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে এই কোন্দল বড় বাধা হয়েও দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত ছোট সংগঠনে এই ধরনের কোন্দল অনেকটা কম। অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক যেসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার মধ্যে অন্যতম হলো সম-আদর্শ।[১৩] সংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন আর্দশের কারণে কর্মীদের মধ্যে ছোট ছোট উপদলের সৃষ্টি হতে পারে। তবে যেসব সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে একই আদর্শের প্রতি আস্থা রয়েছে, সেসব সংগঠনে দলীয় ঐক্য অটুট থাকে এবং সংগঠনের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

---

[১২] দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, *কারবারের ব্যবস্থাপনা*, (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৯৯), পৃ. ১৯৬।

[১৩] দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, *কারবারের ব্যবস্থাপনা*, পৃ. ২০১।

বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনসমূহ এদিক থেকে এখনো সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। প্রথমত, এই সংগঠনগুলোর আকার বেশ ছোট। গড়ে ২৫ থেকে ৫০ জনের এক একটি কর্মীদল নিয়ে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে নাট্য-সংগঠনগুলো। দ্বিতীয়ত, শুরুতেই সম-আদর্শের ভিত্তিতে বা সমমনা ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে এই নাট্য-সংগঠনগুলো। ফলে এদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোর কাঠামো একটি নির্দিষ্ট আদর্শকেন্দ্রিক অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোতে প্রধানত তিন থেকে পাঁচ বা ছয় স্তরের তিন প্রকারের সাংগঠনিক কাঠামো দেখা যায়। প্রায় সকল সংগঠনেই রয়েছে দুই ধরনের পরিষদ। এর একটি সাধারণ পরিষদ এবং অন্যটি নির্বাহী পরিষদ। সাধারণ পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারণভাবে এক থেকে দুই বছর) সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত নির্বাহী পরিষদই দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহ করে থাকে। নির্বাহী পরিষদ গড়ে ৯ থেকে ১৫ সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এবং এই পরিষদের শীর্ষ পদাধিকারীগণ সাধারণ পরিষদেও নেতৃত্ব দেন। নির্বাহী পরিষদকে সাধারণ পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

১. সভাপতি–সাধারণ সম্পাদক ধরনের কাঠামো : সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষস্তরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদসহ পাঁচ স্তরবিশিষ্ট যে সাংগঠনিক কাঠামো তাতে সভাপতি সংগঠনের আনুষ্ঠানিক প্রধান। এ ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোতে নির্বাহী প্রধান হলো সাধারণ সম্পাদক। শীর্ষ থেকে নিচের দিকে সাধারণ সম্পাদকের পরের ধাপে রয়েছে সম্পাদকমণ্ডলী। সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে সম্পাদক অর্থ, সম্পাদক সাংগঠনিক, সম্পাদক প্রচার—এভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। নিচের দিকে এর পরের ধাপে রয়েছে নির্বাহী সদস্য পদ।

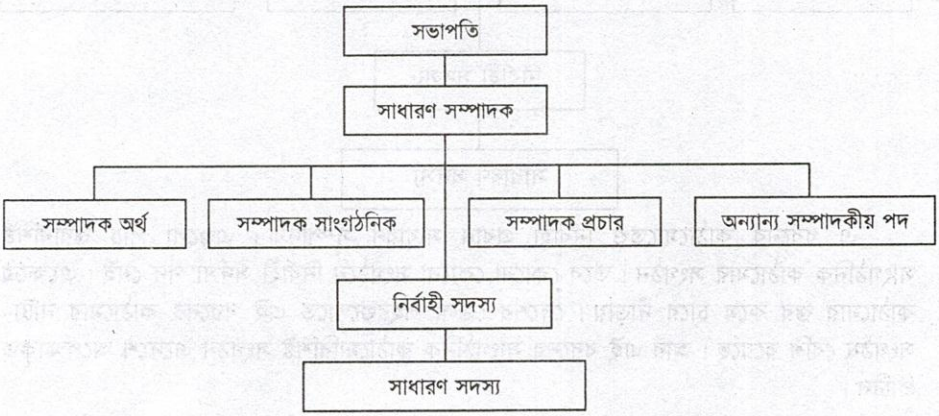

তিন থেকে সাতজনের এই নির্বাহী সদস্যদের অবস্থান অর্গানোগ্রামে নিচের দিকে দেখানো হলেও মর্যাদার দিক থেকে তাদের অবস্থান মোটেই নিচের দিকে নয়। কোনো কোনো সংগঠনে অবশ্য নির্বাহী সদস্য পদ নেই। এক্ষেত্রে পাঁচ স্তরের পরিবর্তে নির্বাহী পরিষদ চার স্তর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অর্গানোগ্রামে সব থেকে নিচে রয়েছে সাধারণ সদস্যদের অবস্থান; যদিও সাধারণ পরিষদে সাধারণ সদস্যদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সংগঠনে এই ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো দেখা যায়। ঢাকা মহানগর ও ঢাকা

বিভাগের নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা পদাতিক, সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়, ঐকিক থিয়েটার (নারায়ণগঞ্জ), বৈশাখী নাট্য গোষ্ঠী (ফরিদপুর), রাজশাহী বিভাগের অনুশীলন নাট্যদল, সমকাল নাট্যচক্র, রাজশাহী থিয়েটার, চট্টগ্রামের অরিন্দম, তীর্যক নাট্য গোষ্ঠী, লক্ষ্মীপুর থিয়েটার, অনন্যা থিয়েটার (চাঁদপুর), বরিশাল বিভাগের খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার, প্রতীক নাট্য গোষ্ঠী (ঝালোকাঠি), নাট্যচক্র (পিরোজপুর), খুলনা বিভাগের খুলনা থিয়েটার, বিবর্তন (যশোর), চুয়াডাঙ্গা থিয়েটার, সিলেট বিভাগের মনু থিয়েটার (মৌলভীবাজার), সন্ধানী নাট্যচক্র (সিলেট), জীবনসংকেত নাট্য গোষ্ঠী (হবিগঞ্জ) প্রভৃতি সংগঠনে রয়েছে এ ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো।[১৪]

২. সভাপতি–সাধারণ সম্পাদক–উপদেষ্টা ধরনের কাঠামো : শীর্ষ স্তরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি উপদেষ্টামণ্ডলী রেখে গড়ে উঠেছে অনেক নাট্য-সংগঠন। দেশের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ সংগঠনে রয়েছে এমন উপদেষ্টামণ্ডলী বা উপদেষ্টা পরিষদ।[১৫] তবে এই উপদেষ্টামণ্ডলীর কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই।

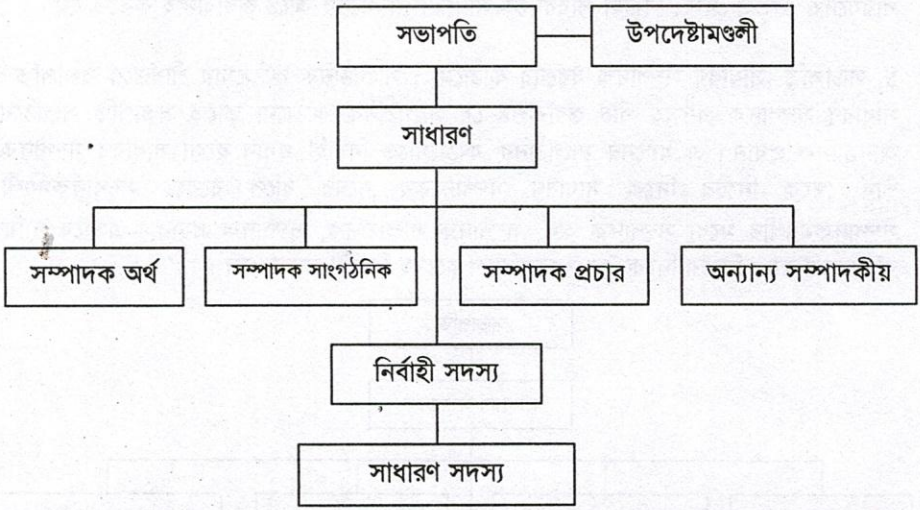

এ ধরনের কাঠামোতেও নির্বাহী প্রধান সাধারণ সম্পাদক। এগুলো পাঁচ স্তরবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর সংগঠন। তবে কোনো কোনো সংগঠনে নির্বাহী সদস্য পদ নেই। এক্ষেত্রে কাঠামোর স্তর কমে চারে দাঁড়ায়। দেশের জেলা শহরগুলোতে এই ধরনের কাঠামোর নাট্য-সংগঠন বেশি রয়েছে। আর এই ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোবিশিষ্ট সংগঠন এদেশে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

---

[১৪] বাংলাদেশের বিভিন্ন নাট্য-সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত তথ্যসমূহ বিশিষ্ট নাট্যতথ্য সংগ্রাহক ও নাট্যগবেষক বাবুল বিশ্বাস (ওয়াটার ফ্লাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা), বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ সেনগুপ্ত ও সানোয়ার আলম খান দুলু-এর সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

[১৫] তদেব।

ওপরের ১ ও ২ এই উভয় ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোবিশিষ্ট সংগঠনের কোনো কোনোটিতে কোষাধ্যক্ষ পদকে কেন্দ্র করে আরও একটি স্তর রয়েছে। কোনো সংগঠনে কোষাধ্যক্ষ পদের অবস্থান সাধারণ সম্পাদকের ওপরে আবার কোনোটিতে নিচে। যেসব সংগঠনে কোষাধ্যক্ষ পদ রয়েছে সেসব সংগঠন অপেক্ষাকৃত পুরনো। আবার কোনো কোনো সংগঠনে সহ-সভাপতি, সহ-সাধারণ সম্পাদক, সহ-অর্থ সম্পাদক—এমন ধরনের সহকারী পদও রয়েছে। কিন্তু এসব পদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা মূল পদগুলোর অনুরূপ হওয়ায় পৃথক স্তরে এই পদগুলোকে উপস্থাপনের সুযোগ নেই।

৩. শীর্ষ স্তরে প্রধান সম্পাদক, নির্বাহী প্রধান বা দলীয় প্রধান ধরনের কাঠামো : দেশে বেশ কিছু নাট্য-সংগঠনে রয়েছে তিন স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো। এ ধরনের সংগঠনের শতকরা হার প্রায় ১৫ ভাগ। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক নাট্য-সংগঠন তাদের পূর্বের কাঠামো পরিবর্তন করে এই ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোকে গ্রহণ করছে। অবশ্য এই ধরনের কাঠামো নিয়ে শুরুতেই যাত্রা শুরু করেছিল বেশ কিছু সংগঠন।

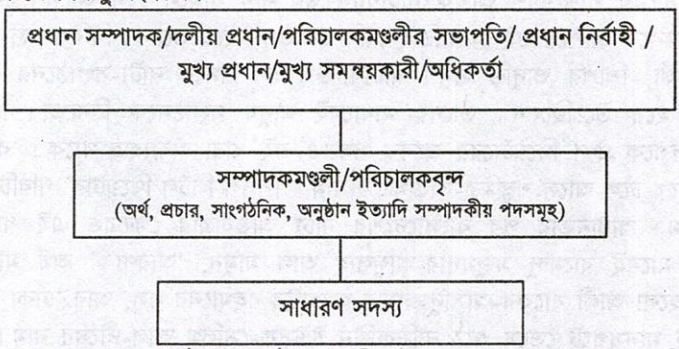

তিন স্তরবিশিষ্ট এই সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছে প্রধান সম্পাদক, নির্বাহী প্রধান, দলীয় প্রধান বা পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি প্রভৃতি ধরনের পদ এবং শীর্ষের এই পদটিই নির্বাহী প্রধানের পদ। এর নিচেই রয়েছে সম্পাদকমণ্ডলী বা পরিচালকমণ্ডলীর পদ এবং সব শেষ ধাপে রয়েছে সাধারণ সদস্যগণ। ওপর থেকে দ্বিতীয় স্তরের সম্পাদকমণ্ডলী বা পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে অর্থ, প্রচার, জনসংযোগ, সাংগঠনিক, অনুষ্ঠান—এভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়ে থাকে। ঢাকার আরণ্যক নাট্যদল, সুবচন নাট্য সংসদ, পদাতিক নাট্য সংসদ, নাট্যচক্র, থিয়েটার (বেইলি রোড), নাট্যকেন্দ্র, ঢাকা থিয়েটার, লোক নাট্যদল, দেশ নাটক, বহুরূপী (ময়মনসিংহ), চট্টগ্রামের তীর্যক নাট্যদল, গণায়ন, উত্তরাধিকার, নান্দিমুখ প্রভৃতি দলে এ ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে।[১৬]

সাংগঠনিক কাঠামোর প্রচলিত যে শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে সে আলোকে বিচার করলে ওপরে বর্ণিত বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোর কাঠামো বিন্যাসকে 'সরলরৈখিক সংগঠন (Line Organisation)' এবং 'সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন (Line and Staff Organisation)' বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোর জন্য পৃথক পেশাদারি কোনো ব্যবস্থাপনা কাঠামো নেই। এখানে নাট্যকর্মে দক্ষ ব্যক্তিবর্গই সংগঠনের বিভিন্ন

---

[১৬] তদেব।

নির্বাহী পদে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। (নির্বাহী পদাধিকারীগণ-এর জন্য কোনো বেতনও পান না।) এদিক থেকে এই সংগঠনগুলোর প্রকৃতি 'কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional Organisation)'-এর অনুরূপ। অর্থাৎ নাট্যকর্মে নিয়োজিত নাট্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গই এসব সংগঠনে একই সাথে ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করেন।

এদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে নির্বাহী পরিষদের নিচের থেকে ক্রমান্বয়ে শীর্ষ অভিমুখে কয়েকটি ধাপ বা স্তর থাকলেও তা ঠিক ম্যাক্স ওয়েবার বর্ণিত আমলাতান্ত্রিক পদসোপান (hierarchy)-এর মত নয়।[১৭] এখানে উর্ধ্বতন ও অধস্তনের সম্পর্ক অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক এবং গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক।

বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনে নেতৃত্বের ধরন

উনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের পর থেকেই নাট্য-সংগঠনের নামের পাশাপাশি অনেক নাট্যব্যক্তিত্বের নাম সামনে চলে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগঠনকে ছাপিয়ে ওইসব ব্যক্তিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব সে সময়ে নাট্য-সংগঠনের চেয়েও বেশি আলোচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ সংগঠনকে চিনতো। বিংশ-শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের জন্মের সময়ও এই ধারা অব্যাহত থাকে। 'বহুরূপী'র নাম এলেই সম্মুখে চলে আসে শম্ভুমিত্র-তৃপ্তিমিত্র'র নাম। 'পিপল লিটল থিয়েটার' পরিচিত হয় উৎপল দত্ত'র নামে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাট্য অভিযাত্রার ক্ষেত্রেও এই ধারা লক্ষণীয়। 'থিয়েটার' মানেই রামেন্দু মজুমদার-আব্দুল্লাহ আল মামুন, 'আরণ্যক' অর্থ মামুনুর রশীদ', 'নাগরিক' হলো আলী যাকের-আসাদুজ্জামান-আতাউর রহমানের দল, আর 'ঢাকা থিয়েটার'-এর নাম এলেই মানসপটে ভেসে ওঠে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ-সেলিম আল-দীনের নাম। দেশের প্রায় সকল নাট্য-সংগঠনের ক্ষেত্রেই এমনটা লক্ষ করা যায়। হয় কোনো নাট্য ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে কোনো সংগঠনের জন্ম হয়েছে অথবা কোনো সংগঠন গড়ে ওঠার পর কিছুদিনের মধ্যেই এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম সংগঠনকে ছাপিয়ে সামনে চলে এসেছে। নাট্য-সংগঠন মানেই কোনো না কোনো বিশেষ ব্যক্তি—এমন ধারণা ও বিশ্বাস যে কেবল মনস্তাত্ত্বিক, তা নয় ; এর পেছনে রয়েছে যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণেই এমনটা ঘটেছে। কেবল নাট্য-সংগঠন নয়, ব্যক্তির নামে সংগঠনের পরিচিতির ব্যাপারটি প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে নাট্য-সংগঠনের বেলায় এটি প্রায় শতভাগ সত্যে রূপ নিয়েছে। নাট্য-সংগঠন মানেই প্রতিনিয়ত সৃজনশীল শৈল্পিক কর্মকাণ্ড। আর এ ধরনের কর্মকাণ্ড ব্যক্তির ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বা গুণাবলী ব্যতীত সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব।

বিভিন্ন নেতৃত্ব তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে নাট্য-সংগঠনে এই ধারার নেতৃত্বকে 'নেতার ব্যক্তিক গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক তত্ত্ব (Theories based on personal traits of leaders)'-এর আওতাভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই তত্ত্বে নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভর করে নেতার ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন, দৃঢ় প্রত্যয়, উৎসাহ, সাধুতা, সৃজনশীলতা, উদ্যমশীলতা,

---

[১৭] M. Weber, *The Theory of Social an Economic Organisation*, 1947, See also, M. Weber,. *The Methodology of Social Scientists*, Ecluard A. and Henry A. Finch ((Glencoe, Free Press, 1949), p. iii.

বুদ্ধিমতা ইত্যাদি গুণাবলির ওপর।[১৮] ১৯৬৩ সালে গিশেলী নেতৃত্বের ফলপ্রদতা এবং নেতার বুদ্ধিমত্তা, তদারকের ক্ষমতা, উদ্যোগ, প্রত্যয় ও ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সহ-সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন।[১৯] অনেকের মতে, কোনো কোনো ব্যক্তির পক্ষে মানবীয়, কারিগরিক ও রূপ-চিন্তন নৈপুণ্য অর্জনের দ্বারা নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।[২০]

বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনসমূহের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের অবস্থান লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি সংগঠনের শীর্ষ পদে নিজ নিজ সংগঠনের মাত্র দু-একজন ব্যক্তি বারবার অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। সংগঠনগুলোর প্রযোজনা তালিকার দিকে তাকালে এটাও দেখা যায় যে, ওই শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিগণই অধিকাংশ নাটকের নাট্যকার, নির্দেশক বা মুখ্য চরিত্রের অভিনেতা।[২১] অর্থাৎ নাটক রচনা, নির্দেশনা প্রদান বা ভালো অভিনয় করার গুণাবলি না থাকলে বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনগুলোতে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই দীর্ঘদিন শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। অন্যকথায় নেতা এখানে বিশেষজ্ঞ না হলে সংগঠনের শীর্ষ ব্যবস্থাপক হতে পারেন না। নাটক রচনা, নির্দেশনা বা অভিনয়-ক্ষমতা ব্যক্তির অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলির সাথেও সম্পর্কিত। ফলে এসব গুণের অধিকারী ব্যক্তিগণ সহজেই সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়ে ওঠেন; না হলে বারবার শীর্ষ পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

নেতার আচরণ-ভিত্তিক তত্ত্ব (Theory based on the behavioural patterns of leaders)-এর আলোকে বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনে নেতৃত্বের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় সব সংগঠনের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আচরণ গণতান্ত্রিক। কিছু ব্যতিক্রমও অবশ্য লক্ষণীয়। যেমন অনেক নাট্য-নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে যে ধরনের কড়া মনোভাব দেখান, সংগঠনের সদস্যদের সাথেও তাকে একই আচরণ করতে দেখা যায়। নাট্য নির্দেশনা আর সংগঠনে নেতৃত্বদানের কাজের মধ্যের পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলায় এমনটি ঘটে। নেতৃত্বের আচরণ-ভিত্তিক তত্ত্বে নেতার আচরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নেতার আচরণকে স্বৈরতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—এই চার ভাগে ভাগ করা হয়।[২২] গণতান্ত্রিক নেতা সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেন এবং এই ধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মীদের সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেবার সুযোগ থাকে। এদেশে সাধারণভাবে নাট্য-সংগঠনগুলোতে কর্মীদের সাথে আলোচনা করেই নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়। ডগলাস ম্যাকগ্রেগর-এর x-y তত্ত্বের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[২৩]

---

[১৮] দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য,, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬।

[১৯] E.G. Ghiselli, 'Managerial Talent' *American Psychologist*, Vol. 18, No. 10, PP. 631-64.

[২০] D.R. Sherill, 'Study of a Leader, What make him? A magic formula?' *Personnel Administrator,* Vol. II, No. 2 (march-April, 1966), PP. 17-19.

[২১] বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা, পূর্বোক্ত।

[২২] দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭।

[২৩] ড. নেসার আহমেদ, *শিল্প মনোবিজ্ঞান,* (ঢাকা: তানিম প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ২৫৩, ২৫৪ ('x' তত্ত্ব অনুযায়ী একদল ব্যবস্থাপক মনে করেন কর্মীরা জন্মগতভাবেই ফাঁকিবাজ, সুতরাং ভয়ভীতি ও শক্তি প্রদর্শন করেই তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয়। অন্যদিকে 'y' তত্ত্বের সারকথা হলো,

এদেশে নাট্য-সংগঠনে নেতৃবৃন্দের আচরণ 'y' তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ এখানে অনুসারীদের যোগ্যতাকে স্বীকার করেন এবং তাদের আস্থায় নিয়েই এগিয়ে চলেন।

নেতৃত্বের তত্ত্বাবধান ধরন বিবেচনায় নিলে আবার দেখা যায়, বাংলাদেশের নাট্য-সংগঠনের নেতৃত্ব একই সাথে কর্মকেন্দ্রিক ও কর্মীকেন্দ্রিক। অর্থাৎ নেতা বা ব্যবস্থাপক এখানে কর্মীদের মতামতকেই কেবল গুরুত্ব দেন না, তাদের কাছ থেকে কাজও আদায় করে নেন; না হলে বছরের পর বছর সংগঠনগুলোর পক্ষে সফল প্রযোজনা ও তার মঞ্চায়ন সম্ভব হতো না।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা মনে হতে পারে যে, শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত গুণের কারণেই এদেশে অধিকাংশ নাট্য-সংগঠন সাফল্যের সাথে টিকে আছে। কিন্তু না, এই শীর্ষ নেতৃত্বের সাফল্যের পেছনে কেবল তাদের ব্যক্তিক গুণাবলিই কাজ করেনি; এর পেছনে অনুসারী বা সাধারণ নাট্যকর্মীদের অবদানও কম নয়। এই প্রসঙ্গে নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব (Situational Theory of Leadership)-এর কথা এসে যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নেতৃত্ব নেতার গুণাবলি, অধীনস্থদের গুণাবলী ও পরিস্থিতির সম্মিলিত প্রভাবের ফল।[২৪] প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার সাফল্যের পেছনে নাট্য-সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিগত কর্মনৈপুণ্য যেমন অবদান রেখে চলেছে, তেমন অবদান রেখে চলেছে সংগঠনের উন্নত কর্মপদ্ধতি, এককেন্দ্রিক আদর্শ এবং কর্মীদের অঙ্গীকার ও কর্মদক্ষতা। অবশ্য এক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবদানও কম নয়। অনেকেই মনে করেন দেশে বারবার সামরিক শাসন এবং নাট্যিক কর্মে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবসহ বহুবিধ বাধাই নাট্যকর্মীদের অঙ্গীকারকে আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে—বাধার দুয়ার খুলতেই নাট্যকর্মীরা হয়েছে আরো বৈশি সৃজনশীল।

উপসংহার

বাংলাদেশে নাট্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কোন্দল, স্বেচ্ছাচারিতা, মাত্রাজ্ঞানের অভাব, নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের অভাব, মেরুকরণ প্রক্রিয়া, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কিছু দুর্বলতা থাকলেও সার্বিক সাফল্যকে তা কখনোই ম্লান করতে পারে না। এদেশের নাট্য-সংগঠনের দুর্বলতার তুলনায় সাফল্যের পাল্লাই ভারী। আর এই সাফল্য এসেছে যৌথভাবে নাট্য-সংগঠনের শীর্ষ ব্যবস্থাপনার কর্মদক্ষতা ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, নাট্যকর্মীদের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং বৈরী পরিস্থিতি উত্তরণে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে।

অন্য একদল ব্যবস্থাপক মনে করেন মানুষ মাত্রই কাজ করতে পছন্দ করে, সুতরাং কর্মীদের আস্থায় নিলে এবং প্রশংসা করলে তারা স্বেচ্ছায় কাজ করবে।)।

[২৪] দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা

মোঃ আমিরুল ইসলাম*

Abstract: Gazir gan is one of the performing arts of Bengali folklore. The folk culture and rural life lies in this folk drama. The present paper is an attempt brought forth on field collection at Gazir gan, from Khulna district; nearby sundarban. In this area Gazir gan contains such rituals and belives that reflect the syncretistic tradition of Bengal forever.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে গাজির গানের ব্যাপক প্রচলন এর জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করে। দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন জেলা বিশেষ করে খুলনা বিভাগের প্রায় সকল জেলাতেই গাজির গানের আয়োজন লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলের জনজীবনে গাজির গানের প্রভাব খুব বেশি। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করেই গাজির গানের বিস্তৃতি। গাজির গানের আলোচনা সুন্দরবন ছাড়া কিছুতেই পূর্ণতা পায় না। অতীতকালে সুন্দরবনের চারপাশের এলাকা ছিল জনবসতির জন্য প্রতিকূল। হিংস্র জীবজন্তু, মহামারী, সমুদ্র, নদী-খাল আর বাদাবন পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলের কৃষিজীবী, বনজীবী এবং জলজীবী মানুষের জীবন এবং জীবিকার একমাত্র উৎস ছিল সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক প্রতিবেশই এদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হওয়ার কারণে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব, প্রকৃতিকে জয় করার বাসনা, বৈষয়িক উন্নতি, সমৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এ অঞ্চলের জনজীবনে গাজি পিরের উপর নির্ভরতা। গাজি পিরের উপর ভরসা করেই এরা আজও রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হিংস্র কুমির এবং বিষাক্ত সাপের মোকাবেলা করে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় গাজি পিরের উদ্দেশ্যে পূজা, শিরনি, ওরস, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করে থাকে। গাজি পির এ অঞ্চলের প্রধান লোকদেবতা। লোকসমাজের এই দেবতা বাঙালির জনজীবনে অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীকও বটে। খুলনা অঞ্চলের ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশের এই গাজির গানের প্রকৃতি উদ্ধারের চেষ্টা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ।

হিন্দু সমাজে বাঘ দেবতা হিসেবে দক্ষিণা রায়ের যে স্থান মুসলিম সমাজে গাজিপিরের সেই স্থান। লোকপূজ্য পির গাজি দক্ষিণা রায়ের পর্যায়ভুক্ত হয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে পূজ্য হয়ে ওঠেন। জনজীবনের মুক্তিদাতা এই পিরের গান তাদের ধ্যান ও জ্ঞানের উৎস। খুলনার দিঘলিয়া থানার দাসপাড়া নিবাসী অশীতিপর বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ দাস বলেন, গাজিপিরই তাদের জীবনের ভালমন্দ, উন্নতি, অবনতি, ছেলে-মেয়ের বিয়ে, সুখ-শান্তি, সবকিছুর মাঝে অবস্থান

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ ধীরেন্দ্রনাথ দাস-এর সাক্ষাৎকার। গাজিপির কে তিনি দেবতা বলে সম্বোধন করেন। সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১।

করেন, বিধায় এ গান তাদের ধর্মেরই অংশ।[১] এ গান অঞ্চলভেদে গাজির পালা, গাজির গীত, গাজির গাইন, পিরের গান, গাইনের পালা, গাইনেরগীত, গাইনের তামাশা ইত্যাদি নামে পরিচিত।[২] হিন্দু মুসলিম উভয় পরিবারে গাজিপির সমান আসন দখল করে আছেন। নতুন সন্তানের জন্ম হলে গাজির গানের মানত করা হয়। এমনকি পরীক্ষা পাস এবং রোগমুক্তির জন্য গাজির গানের আসরের আয়োজন করা হয়। গাজিপিরের জনপ্রিয়তার কারণেই মৌখিক সাহিত্যের পাশাপাশি গাজি পিরকে ঘিরে লিখিত পুথি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে। গাজিপির বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন পুথির রচনাকাল ১৭৯৮-৯৯ সাল। রচয়িতার নাম পাওয়া যায় কবি খোদা বখ্শ।

সৈয়দ হালুমীর ১৮২৭, আবদুর রহিম ১৮৫৩, খোন্দকার মাহমুদ আলী ১৮৭৮, মোহাম্মদ মুন্সী ১৮৯৬ এবং আবদুল গফুর বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুথি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩] বর্তমান প্রবন্ধকার খুলনা বিভাগের জেলাসমূহে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য করেন যে, গাজিপিরের পুথি এবং গাজিপিরের পালার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যদিও ধারণা করা হয় পুথি সাহিত্যের ছায়া অবলম্বন করেই পালা কাহিনীসমূহ রচিত হয়েছে। কিন্তু পালা সমূহ সংখ্যায় যেমন প্রাচুর্যের দাবিদার বিষয়বস্তুতেও তেমন বৈচিত্র্যমুখী। লোকসমাজ আপন জীবনের অনুকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে নতুন নতুন পালা বা গাঁথা তৈরি করেছেন। প্রতিটি পালাতেই গাজিপির এবং কালুর উপস্থিতি থাকলেও ঘটনা এবং চরিত্রের বিস্তৃতির কারণে এর পালা সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। সরেজমিনে দেখা যায় যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত পালাসমূহের সাথে খুলনা জেলায় প্রচলিত পালাসমূহের ব্যাপক পার্থক্য। তবে উভয় অঞ্চলেই গাজি এবং কালুর উপস্থিতির সাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং ঘটনার সন্নিবেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পাওয়া যায়। আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি ইহকালীন কল্যাণ এবং পুণ্য প্রাপ্তির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য সকল এলাকার লোক সমাজেই বিদ্যমান। তবে, সমগ্র বাংলাদেশেই গাজির সাতটি পালা সমধিক পরিচিত। পালাগুলো হলো :

১. গাজী-কালু-চম্পাবতীর পালা
২. নিজাম ডাকাতের পালা
৩. কাফন চোরার পালা
৪. ভেলুয়া সুন্দরীর পালা
৫. জামাল বাদশার পালা
৬. দিদার বাদশার পালা
৭. বাহরাম বাদশার পালা।

ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যমুখী গাজির গানের সকল পালাতেই পাওয়া যায় মুখ্যত—

১. অধ্যাত্মবাদ
২. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
৩. আনুগত্য
৪. আত্মসমর্পণ
৫. ইহকালীন কল্যাণ প্রভৃতি।

---

[১] ধীরেন্দ্রনাথ দাস-এর সাক্ষাৎকার। গাজিপির কে তিনি দেবতা বলে সম্বোধন করেন। সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১।

[২] স্বরোচিষ সরকার, "লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা", *আইবিএস জার্নাল*, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১১।

[৩] তদেব, পৃ. ১১২।

২. গাজির আসনমানা

হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে গাজিরগান শুরুর পূর্বে পূজার আয়োজন এবং আসন তৈরি করা হয়। বাড়ির উঠান বা কোন ফাঁকা স্থান পরিষ্কার করার পর মাটি দিয়ে লেপন করা হয়। স্থানটি শুকিয়ে গেলে সেখানে একটি কাঠের টুলের উপর একটি কুলা বা চালভর্তি প্লেট রাখা হয়। চালের উপর রাখা হয় মিষ্টান্ন বা চিনি, আলু, ধূপদানি, আগরবাতি, সিঁদুরের কৌটা, চামর প্রভৃতি। পাশে রাখা হয় আমপাতার ঘট। ঘটে জল রাখা হয় এবং সবুজ কচি আমপাতার পল্লব স্থাপন করা হয়।

পাশে একটি পরিষ্কার মাদুরের উপর থাকে সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে হারমোনিয়াম, ঢোল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি। এছাড়া অভিনয় কলার সাথে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম চুল, দাড়ি, গামছা, জটা, ত্রিশুল, শাড়ি, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও থাকে। আসন সাজানোর পর সকলে একত্রে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে দু'হাত নামিয়ে প্রণাম জানায়। কখনো বা নামাজের মতো সিজদা করতে দেখা যায়। খুলনা অঞ্চলে তামা অথবা পিতলের তৈরি গাজির প্রতিকৃতি লক্ষ করা যায়। যা আসনের সামনে পুঁতে রাখা হয়। এর উপরের অংশ অনেকটা মানুষের মুখমণ্ডলের আকৃতি বিশিষ্ট এবং বিঘত পরিমাণ বা আধহাত প্রশস্ত। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত যত্নের সাথে এবং পবিত্রতা সহকারে করা হয়। এ সময় সকলকে কথা বলতে নিষেধ করা হয় এমনকি ছোট বাচ্চাদের মায়েরা কান্না থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেন। চুল খোলা রাখতে নিষেধ করা হয় এবং মাথায় কাপড় বা ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

৩. বন্দনা

আসন মানার পর ঢোলের আওয়াজের সাথে সাথে নিস্তব্ধতার অবসান ঘটে। শুরু হয় বন্দনা। বন্দনার মাঝে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ঘটে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, হিমালয়, সূর্যদেবী, ক্ষীরনদী সাগর প্রভৃতির বর্ণনা বন্দনার মাঝে প্রকাশ পায়। ময়মনসিংহ গীতিকার প্রচলিত পালা সমূহের সাথে গাজির পালার বন্দনারীতির সাদৃশ লক্ষণীয়। গাজির গানের মাঝে বর্ণিত ক্ষীরনদী সাগর-এর যে উল্লেখ, তা বাংলার নদ-নদী পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকেই নির্দেশ করে। যথা-

পর্থমে উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
তার ওপরে নাইতো কোন মানুষের বসত
পূবদিকে বন্দনা করি সূর্যদেবীর পায়
একদিকেতে ওঠে সূর্য্য চৌদিকে পর্সায়।
দক্ষিনে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর
সেই খানেতে চালায় তরী যত সাধুমহাজন
পশ্চিমে বন্দনা করি হজ্জ মক্কার ঘর
সেইখানেতে নামাজ পড়লে বান্দার গুনা হয়রে মাপ
চাইরদিকে বন্দনা করে আসর করলাম ঠিক
মন দিয়ে শোনবেন আপনার
গাজি দুঃখের গীত।[৪]

প্রতিটি পালা পৃথকভাবে পরিবেশিত হলে প্রারম্ভেই বন্দনা করা হয়। একই আসরে একাধিক পালা পরিবেশিত হলে প্রথম পালার শুরুতে বন্দনা করা হয়। উপস্থিত দর্শক এবং শ্রোতা সাধারণ বন্দনারীতিকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে শ্রবণ দর্শন করে থাকেন।

৪. গাজির গানের বিষয়বস্তু

গাজির গানের প্রধান উপজীব্য বা বিষয় মূলত গাজিপির এবং তার ভ্রাতৃপ্রতিম সহচর কালু। যদিও কোথাও কোথাও কালুকে গাজির সহোদর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু খুলনা জেলায়

---

[৪] সাক্ষাৎকার: রমজান আলী শেখ, বয়স-৪০, গ্রাম-দাসপাড়া, দিঘলিয়া সদর, খুলনা। তারিখ:১৪ সেপ্টেম্বর ২০১০।

প্রচলিত গাজির গানে এর সত্যতা পাওয়া যায় না। বর্তমান আলোচনায় লোক সমাজে প্রচলিত পালায় বর্ণিত ঘটনা এবং কাহিনীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উত্তর দেশের বাদশা সিকান্দার শাহ, বিরাট শহরে তার বাস। বেগমের নাম নুরজাহান। একে একে জন্ম হলো তিনটি পুত্র। জুলফত, জনমদ্দি এবং দয়ার গাজি (জুলফতকে কেউ কেউ জুলহাস বলে উল্লেখ করেন এবং রানীর নাম অযুফা বলে থাকেন)। জুলফত যৌবন প্রাপ্ত হলে রাজপরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে শিকারে বের হন। ঘটনাক্রমে এক মায়াবী রাজকন্যার সাক্ষাৎ পান এবং তাকে অনুসরণ করে পাতালপুরীতে গমন করার পর বিম্বিং রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেখানেই অবস্থান করেন। পুত্রহারা মায়ের বুকে আর একবার শেলবিদ্ধ হয়। যখন দশবছর বয়সে গাজি সন্ন্যাস বৃত্তি গ্রহণ করেন। বাদশা সিকান্দারের সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে গাজি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে মুর্শিদের পথ অনুসরণ করেন। মুর্শিদের শর্ত মেনে সন্ন্যাসী হলেন গাজি। মুর্শিদের মাথার লাল পাগড়ির মাঝ থেকে একটি কালো সুতা বের করে তা দিয়ে হাওয়ার সাহায্যে কালুকে তৈরি করা হলো। কালুকে নিয়ে গাজি মায়ের কাছে গেলেন। কালুর মাঝে মা যেন হারানো ছেলে জুলফতকে খুঁজে পেলেন। মায়ের আকুতি দেখে কালু রাজপ্রসাদে থেকে যেতে চাইলেন। মায়ার বাঁধন কেটে কালুকে নিয়ে গাজি ফকির হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। গাজির গানে কালু একটি ব্যাঙ্গাত্মক চরিত্র। তির্যক বাকভঙ্গির মাধ্যমে সামাজিক অসঙ্গতি প্রকাশে কালুর ভূমিকা তুলনাহীন। শ্লেষাত্মক কথার মাধ্যমে সমকালীন দেশ এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি কালুর কথায় উঠে আসে। মূল কাহিনীর সাথে যোগ সূত্রহীন হলে ও আঞ্চলিক আর্থ সামাজিক এবং সমাজ সচেতনতার প্রকাশ এভাবেই গাজির গানে মূর্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশটা চোরের খনি
সবই আমরা করতে পারি
চালচুরি, আটাচুরি, গরুচুরি
দরিচুরি, টাকাচুরি, ডালচুরি
সবাই আমরা করতে পারি
খেলার সময় খেলা করি
কাজের সময় চুরি করি
কোনটা আমরা কম পারি ?[৫]

গাজির গানের মাঝখানে ঠাট্টা মস্করা মূলক অনেক প্রসঙ্গ আসে যা স্থানীয় ভাষায় ফাকরি বলে পরিচিত। কালুর কথার মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক বিষয় সহজেই অনুপ্রবেশ করে। যথা: ওয়াইফ মানে "ফরিবার", ইস্তিরি (স্ত্রী) মানে "গাই"। উপস্থাপনার মাঝে বর্তমান মানুষ ও জীবনধারা মূর্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলার মানুষ স্বভাবতই গমের ছাতু বা খুদের ভাত খায়। ফলত পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। কখনো বা অভাবের তাড়নায় গমের ভাত, আলুর ভাত খায়। পেটেপীড়া দেখা দিলে তখন ওরস্যালাইন খেতে হয়। কালুর কথায় সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় না। জামাই শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে অভাবের সংসারে এসব খাবার খেয়ে যখন আক্রান্ত হয় তখন শুনতে পাই:

ছাতু খালাম মাতুখালাম
খালাম ক্ষিদের ঝালেরে
রাইত পোহাবার আগেরে প্যাটে
কুক ছাইরা দিয়া কান্দেরে
ডাইন হাতে জলের ঘটি
বাম হাতে লুঙ্গির কোচা

---

[৫] সাক্ষাৎকার:মন্টু চন্দ্র দাস, বয়স-৪৫, দাসপাড়া, দিঘলিয়া, খুলনা। তারিখ :১৪ সেপ্টেম্বর ২০১০। তিনি এ ধরনের গানকে ফাকরি বলে উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে দর্শক চিত্তকে আনন্দ প্রদান করা হয়।

দর্মের দোহাই লাগেরে ছাতু
এই যাত্রা বাঁচা।[৬]

বউয়ের সাথে চাষীর কথোপকথনের প্রসঙ্গ গাজির গানের নজর এড়ায় না। অনেক সময় প্রাসঙ্গিক ভাবে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে মেয়েরা মারে-বাপরে উচ্চারণ করে। কালুর ভাষায়-

বাপ বাপ বলিস ক্যানরে
তোর বাপ গ্যাছে মাঠে
আমারে যে বাপ বলবে
সে যে তোর প্যাটে।[৭]

গাজির গানে মুর্শিদি প্রসঙ্গ সহজেই অনুপ্রবেশ করে। চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে মুখ্যত গাজি, কালু, মুর্শিদ, রানী, দাসি, দাসির সখী, বাদশা প্রমুখকে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মুর্শিদ এবং বাদশা চরিত্র নেপথ্যে থাকে। জানা যায় পাঁচ বছর বয়সেই পায় জুড়ি খেলার সময় গাজি ধ্যানমগ্ন হয়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে তার কাছে অসীম জলধি বলে মনে হয়। মৃত্যুরূপ সত্যকে সাথে রেখেই তাকে এই ভবসমুদ্র পার হতে হবে । গাজির ভাষায়—

এই দুনিয়ায় হয়নি কায়েম
তাইতে করি ভয়
পিছে পিছে কাল সমন
আমার হয়েছে উদয়।[৮]

গাজি বনে গিয়ে মুর্শিদের সাধনায় দেওয়ানা হয়ে গেলেন-

হই ওরে মুর্শিদ দেখে যাও
তোমার ভক্ত দয়ার গাজি
কান্দিতে লাগিল
মুর্শিদ তুমি দেখে যাও।[৯]

মুশিদের মাঝেই খোদাকে পাওয়া যায়। মুর্শিদকে ভজনা করলেই খোদাকে ভজনা করা হয়। তাইতো গাজির কান্না শুনে স্বয়ং খোদা নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে জিবরাঈলকে প্রেরণ করলেন।

খোদা: হঠাৎ আমার অটল সিংহাসন টলে উঠছে কেন ?
জিবরাঈল: না জানি কোন প্রিয়ভক্ত স্মরণ করছে, তাই অটল সিংহাসন কেঁপে কেঁপে উঠছে।
খোদা: মর্ত্যের মাটিতে গিয়ে আমার সেই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করে দাও।
(জিবরাঈল গাজির সামনে উপস্থিত হলেন)
গাজি: তুমি কে ?
জিবরাঈল: আমি ভবপথের পথিক।
গাজি: ভবপথের পথিক যদি হও, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। যতক্ষণ তোমার সাথে কথা বলব। ততক্ষণ শতশত বার আমার দয়াল মুর্শিদের নাম নিতে পারব।

---

[৬] সাক্ষাৎকার: রমজান আলী শেখ ।
[৭] তদেব।
[৮] তদেব।
[৯] তদেব।

জিবরাঈল: ও বুঝেছি। আমাকে তুমি চিনতে পারোনি বালক! এই তোমার ভবচক্ষু খুলে দিলাম।[১০]

এরপর অনেক কথোপকথনের মাধ্যমে জিবরাঈল নিশ্চিত হলেন গাজি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। জিবরাঈল তখন মুর্শিদ রূপে গাজির সামনে উপস্থিত হলেন। গাজিকে শিষ্যত্ব প্রদান করে আপন হাতে তুলে দিলেন হাতের আসা, পায়ের খরম, জায়নামাজের পাটা, মৃত্যু অংস পাখি। দক্ষিণের যে আঠারো ভাটি বাদা আছে তার মাঝে যত বাঘ, ভাল্লুক, দ্যাও- দানব আছে গাজিকে সবার রাজা করা হলো। গাজির শরীরে চারটি অজপ্য গুণ দেওয়া হলো।

গুণ চারটি হলো-নির্ধনে ধন দান, নিপুত্রকে পুত্রদান, মৃতবৃক্ষকে জীবন দান এবং কামসিদ্ধি।[১১]

গাজির ভাষায়:

মুর্শিদ আমার মন বোঝে না
একলা দুনিয়ায় ফকির হলাম
দোসর পেলাম না
আমি আসি বলতে পারি
যেতে বলতে পারি না
ও সাধের বেলা ডুবে গেলরে।
পাগলমন চেয়ে দেখালি না
পুবের বেলা পশ্চিমে গেল
ভানু বসলো পটেরে।[১২]

সতীর্থ কালুসহ গাজি একদিন বিরাট শহরে অষ্টম দরজায় বাদশাহী মহলে ছদ্মবেশে হাজির হলেন। দাসীর মাধ্যমে রানীমাতা ভিক্ষা দিয়ে পাঠালেন। কালু গাজি এই বলে জবাব দিলেন যে তারা ভিক্ষার ফকির নয়। দ্বারে দ্বারে মা খুঁজে বেড়ানোই তাদের কাজ। আসল উদ্দেশ্য ছদ্ম বেশে গাজি মাকে একবার দর্শন করে চক্ষু জুড়াবেন। অবশেষে রানী এসে তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। কালুকে দেখে দাসীর মনে গানের উদয় হলো—

আর এক কালো দতের কালি
যাতে পত্র লেখি
আর এক কালো চোখের মণি
যাদে দুনিয়া দেখি
আরেক কালো মাথারি কেশ
যাতে বেণী বান্ধে
আরেক কালো যমুনার জল
সর্বলোকে খায়
কালো কালো কৃষ্ণকালো
কালো চারটি বাত
মথুরাতে কৃষ্ণ কালো
কালো দীন নাথ।[১৩]

---

[১০] তদেব।
[১১] সাক্ষাৎকার: মন্টু চন্দ্র দাস ।
[১২] তদেব।
[১৩] তদেব।

গাজীর মন মাকে ছেড়ে কিছুতেই আসতে চায়না, সন্তানহারা মায়ের ব্যথাকে অনুভব করে গাজি গেয়ে ওঠেন:

আমি যাবনারে আমার মাকে ফাঁকি দিয়ে
আমার মাকে মা বলিবে আরতো কেহ নাই
নিশিও প্রভাতের কালে কারবা বাড়ি যাবে
কি করিব কোথায় যাব কোন বা পথে যাই
কোন বা পথে কাহারে আমার এ দুঃখ জানাই
পাড়ার লোকে ঢিল মারিবে আমার মায়ের গায়ে
ও ভাই আমি তো যাবনারে।
আমার শোকে মা যে পাগলিনী হবে
তুমি যাবা যাও কালু ভাই
তুমি তো কালাচান মায়ের উদরের নও
মায়ের দরদ বোঝ না।[১৪]

মা স্বপ্ন দেখে আপন সন্তানকে চিনতে পারলেন। ততক্ষণে গাজি কালু বিদায় হয়ে গেছেন। সন্তান হারানোর বেদনা মায়ের মনে নতুন করে জেগে উঠলো। পুত্রহারা শোকার্ত মা পাগলপারা হয়ে ছুটতে লাগলেন। মায়ের এই আহাজারি সমবেত নারী পুরুষকে কান্নায় ভাসিয়ে দিল।

রানীর ভাষায়—

ঐ ওরে বিধি কি জানি লিখিলি কপালে
নীলমণি হায়রে গোপালহারা হলাম আমি
ঐখানেতে খেলতো গাজি সোনার বাটা হাতে
কোন হারানি হেরে নিল তারে পেয়েরাজ পথে
কেনবা বিধি করে ছিল কালুগাজির মা
গাজী কালার মা হয়ে মনের বাঞ্ছা মেটে না
এভাবে যার হয়নি পুত্র যে জন আছে বলো
ওহে পুত্র ছেড়ে গেল কানতে জনম গেল
কারবা আমি ছিড়েছিলাম ভরাক্ষেতের বাইন
সেতো মোরে দিয়েছিল পুত্রশোকের গাইন
কারবা আমি ছিড়েছিলাম খণ্ড কলার পাতা
সেই তো মোরে দিয়েছিল পুত্র শোকের ব্যথা।[১৫]

রানীর কণ্ঠে যেন চিরন্তন বঙ্গমাতার পুত্রশোকের বিলাপ শুনতে পাওয়া যায়। গাজি পির বাঙালি হিন্দু মুসলমানের দেবতা। মানুষ চিরকালই একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে চায়। অরণ্যচারী যূথ জীবনে দক্ষিণ বাংলার মানুষের যে সংগ্রাম তার মাঝে গাজিপির তাদের ত্রাতাস্বরূপ।

গাজিপির তাদের সংগ্রাম করে বেঁচে থাকায় প্রেরণা হয়েছেন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজও গাজিপিরের মূর্তি শোভা পায় গাজির গানে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপাখ্যান মুকুট রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে গাজি কর্তৃক তার মেয়ে চম্পাবতীকে বিয়ে করার কাহিনী।

৫. গাজির ভোগ

---

[১৪] সাক্ষাতকার: ধীরেন্দ্রনাথ দাস ।

[১৫]. তদেব।

সুন্দরবনে প্রবেশের আগে বাঘের হাত থেকে রক্ষার জন্য গাজির উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হয়। বাওয়ালি সম্প্রদায় মধু সংগ্রহের আগে গাজিপিরকে স্মরণ করে পূজা আচার পালন করে থাকেন। গাজি পিরের উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগি ছেড়ে দেওয়া হয়, পাঠা বলি দেওয়া হয়। কখনো বা পাড়া গ্রামে গাজির নামে চাল উঠিয়ে শিরনি করা হয়। খিচুরি বা পায়েস রান্না করে গাজির উদ্দেশ্যে ভেট প্রদান করার পর সবাই মিলে মিশে খায়। হিন্দু-মুসলমান একত্রে এই ভোগ দেওয়া বা শিরনির আয়েজন করে থাকে। বাঘের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই শিরনি পালন করা হয় বলে কেউ কেউ একে বাঘাইর শিরনি বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিল আহমদ উল্লেখ করেন যে, বাঘাই পীরের শিরনি উপলক্ষে যে মাঙন হয় তাতে গ্রামের রাখাল বালকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছড়ায় বাঘের বয়ান গায় ও চাল ডাল সংগ্রহ করে।[১৬]

৬. গাজির বাঁশ নাচানো

বাঁশ শব্দটির সাথে বংশবৃদ্ধির সাদৃশ্য থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে গাজির বাঁশ নাচানো উৎসব পালন করলে বংশ রক্ষা হয়। নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের বাসনায় এই আচারে আয়োজন করে থাকেন। ধারণা করা হয় এর ফলে বাঁশের ঝাড়ের নতুন বাঁশ বৃদ্ধির ন্যায় পরিবারে পুত্রসন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। খুলনা জেলায় বাঁশ বিয়ের প্রচলন আছে বলে গাজি গানের শিল্পী শাহাদত হোসেন মণ্ডল উল্লেখ করেন। তার মতে বাঁশ নাচানোতে দক্ষ ব্যক্তি বেশ পরিশ্রম করে থাকেন। এ উপলক্ষে বিশেষ থান বা দরগা তৈরি করা হয়। বাঁশের গাঁয়ে রঙিন কাপড় জড়িয়ে কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দরগার চারপাশে নাচানো হয়। এতে মানতকারীর মনোবাসনা পূর্ণ হয় বলে প্রচলিত আছে।[১৭]ওয়াকিল আহমদের বর্ণনা থেকেও আমরা গাজির বাঁশ দেওয়া বা বাঁশ নাচানোর সত্যতার উল্লেখ পাই। ওয়াকিল আহমদ বলেন, অনুষ্ঠানটিকে রূপ দেওয়ার জন্য পেশাদার " নাড়া" ও "চেলা " আছে। মানতকারিণীর আহ্বানে তারা গাজির দরগায় উপস্থিত হয়। এই দরগাটি তৈরি করায় মানতকারিণী নিজেই। একটা খোলা মেলা উচুঁ জায়গায় লেপে পুছে গাজির দরগা তৈরি করা হয়। দরগার সামনে তিনটি বাঁশ পোঁতা থাকে, মাঝের বাঁশটি অপেক্ষাকৃত লম্বা। এটাই গাজিপীরের প্রতীক বাঁশ। বাঁশগুলির মাথায় চামর বাঁধা থাকে। অনুষ্ঠানের দিন "চেলা" গাজির বাঁশটি মাটি থেকে তুলে নাভির উপরে রেখে দরগার চার পাশে নাচের ভঙ্গিতে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। সেই সাথে ঢুলি ঢোল বাজায় এবং "নাড়া" প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গাজির মহিমা বর্ণনা করে।[১৮]

গাজির বাঁশ নাচানোর সাথে মাদারের বাঁশ নাচানোর বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনার প্রথম খণ্ড ' ফিরে যাই ফিরে আসি 'তে মাদারের বাঁশ নাচ উৎসবের সরস বর্ণনা দিয়েছেন। তার সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা এবং সরাসরি সাক্ষাতকারের মাধ্যমে মাদারের বাঁশ নাচ এবং গাজির বাঁশ নাচের পার্থক্য জানা যায়। মাদারের বাঁশ নাচে পুরুষ মাদার এবং নারী মাদার থাকে। পুরুষ মাদারের রং হয় নীল সাদা এবং নারী মাদারের রং হয় লাল সাদা। তাছাড়া মাদার নাচের সময়ে একটা বড় তামার পয়সা তালুর উপর রেখে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তার অর্ধেকটা পরিমাণে মাদার বাঁশকে বসিয়ে নাচানো হয়। অপরদিকে গাজির নাচে বাঁশকে নাভির উপর বসিয়ে নাচানো হয় যা বেশ কষ্টসাধ্য। উভয় নাচের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকে একই।[১৯]

---

[১৬] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক -সংস্কৃতি* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০১), পৃ. ২১২।

[১৭] সাক্ষাৎকার : সাহাদত হোসেন মণ্ডল, গ্রাম-পানিগাতি, দিঘলিয়া সদর, খুলনা। প্রকাশ থাকে যে, তিনি একজন দক্ষ ঢালি খেলোয়ার এবং বাঁশ নাচানোর অভিজ্ঞতা তার নিজেরও রয়েছে।

[১৮] ওয়াকিল আহমদ , পৃ. ২১৪।

[১৯] সাক্ষাৎকার : হাসান আজিজুল হক,তারিখ: ১৫ জুন ২০১০,*আইবিএস*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

৭. গাজির বাঁশ বিয়ে

ওয়াকিল আহমদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এক সময় গাজির বাঁশের সাথে মানব কন্যার কৃত্রিম বিবাহ দেওয়া হতো। সাধারণত, মৃত বৎসার কন্যাসন্তান হলে সেই কন্যার সাথে বাঁশ বিয়ে দেওয়া হতো। তবে ঐ কন্যাকে ফকিরি জীবন যাপন করতে হতো। এছাড়া সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করেও এ আচার পালন করা হতো। এর সাথে বাঙালির উর্বরতা তত্ত্বের নৃতাত্ত্বিক বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত।

মানত করার পর যদি কোন সন্তান না জন্মে তবে বাঁশের সাথে বাঁশেরই কৃত্রিম বিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিবছর ১০ জ্যৈষ্ঠ এর উদযাপন কাল বলে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের ' হারামণি' তে উল্লেখ রয়েছে। এ উপলক্ষে বাঁশটিকে লাল কাপড় ও ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। বর্তমানে এই আচারটি বিলুপ্ত প্রায়।[২০]

৮.উপসংহার

রওশন ইজদানী গাজির গানকে লোককৃত্যমূলক গান অভিধায় ভূষিত করেছেন।[২১] গাজির গানের সাথে যুক্ত শ্রোতা এবং গায়েন সম্প্রদায় সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর মানুষ। এরা সমাজের বিত্তবানদের কাছে যেমন অবহেলার পাত্র তেমনই নিপীড়িত। প্রকৃতি এবং জীবনের কাছে এরা এতটাই অসহায় যে, অতিলৌকিক কোনো শক্তির নিকট আশ্রয়গ্রহণ ছাড়া এদের সামনে কোনো পথ খোলা নেই। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে জনসাধারণ পার্থিব বিপদ-মুক্তির জন্য গাজি পিরের উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে।

সে অর্থে গাজিপির তাদের ধর্মসমন্বয়ের দেবতার আসন গ্রহণ করেছেন। গাজির উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা বা বন্দনায় দেবতাতুষ্টির অনুকরণ লক্ষ করা যায়। আঠারো শতক, উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই গাজির গান জনপ্রিয় ছিল। এই সময়কার বাংলাদেশে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের ধর্মজীবন ছিল ব্যাপকভাবে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই সমাজে লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের এতোটা প্রভাব ছিলো যে, কখনো কখনো হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্য অভিন্ন লৌকিক দেবতার উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। সত্যনারায়ণ বা সত্যপির এমন এক দেবতা।[২২] একই কারণে গাজির কাহিনীতে যথেষ্ট পরিমাণে সাম্প্রদায়িক উপসর্গের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজে ও বিপদে আপদে গাজিকে স্মরণ বা গাজির গানের মানত করার রেওয়াজ আজও প্রচলিত। গাজির গান নিম্নবিত্ত হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছে। গাজির গানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তবান হিন্দু বা মুসলমান কেউ এগিয়ে আসেননি। নিম্নবিত্তরাই শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক। গায়েনদের কেউ এ গানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। কৃষিজীবী, রিকশাচালক, কারখানার শ্রমিক, দোকানি, দর্জি, রাজমিস্ত্রি, চিংড়িঘেরের শ্রমিক, নৌকার মাঝি, জেলে, তাঁতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত গাজির গানের গায়েন ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ।[২৩] গাজির গানের শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম ঘটে। জনসংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমান পরিবারের শ্রোতাসংখ্যা বেশি। অবশ্য প্রতিটি দলেই গায়েনদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম সংমিশ্রণ চোখে পড়ার মতো। কোথাও কোথাও মূল গায়েন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পার্শ্বচরিত্রসমূহ মুসলিম সমাজ থেকে আগত। তবে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় বিষয় হলো বাদকদের অধিকাংশই হিন্দু পরিবার থেকে আগত। ঢোল, বাঁশি, চাটি, মন্দিরা প্রভৃতি বাদকবৃন্দ হিন্দু পরিবারের সদস্য।

---

[২০] ওয়াকিল আহমদ, পৃ . ২১৫।

[২১] রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৫৫), পৃ. ৪২।

[২২] স্বরোচিষ সরকার, পৃ. ১১৯।

[২৩] ব্যক্তিগত অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষা, খুলনা জেলা, ২০০১।

দিঘলিয়া'র দাসপাড়ায় লক্ষ করা গেছে যে, পালা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলিম একই পরিবারে একত্রে খাবার গ্রহণ করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ দাসের বাড়িতে দেখেছি সকল গায়ক তার বাড়িতে দুপুরের খাদ্য গ্রহণ করে একত্রে বিশ্রাম করছেন। এখানে কোনো জাত বা সম্প্রদায়গত ব্যবধান সামনে আসেনি।[২৪]

শ্রোতাসাধারণ গাজিপিরকে অতিলৌকিক ক্ষমতার আধার বলে মনে করেন। তাদের বিশ্বাস গাজি সর্বত্রগামী। রূপ-রূপান্তর বা অশরীরী মূর্তি ধারণ করতে পারেন।[২৫] প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে দৈবদুর্বিপাক থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন। এমনকি মৃত ব্যক্তি এবং বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবন দান করার ক্ষমতাও তার রয়েছে।[২৬] তারা এমন ধারণা পোষণ করেন যে গাজিপির তাদের মনের কথা জানেন এবং ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। তার দোয়ায় নিঃসন্তানের সন্তান লাভ, অন্ধের দৃষ্টি অর্জন, রোগীর রোগমুক্তি, ক্ষুর্ধাতের ক্ষুধা নিবৃত্তি, পীড়িতের সেবালাভ এবং শত্রুকে জয় করা যায়।[২৭] তারা আরও বিশ্বাস করেন, গাজি পির আগুন পানির উপর কর্তৃত্ব করে সকল অমঙ্গলের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।[২৮]

গাজিপিরের গানকে তারা পুণ্য অর্জনের উপায় হিসেবে দেখে থাকেন এবং মনে করেন এগানের পরিবেশনার সাথে যুক্ত থাকলে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তিলাভ হয়।[২৯] গাজির গান যেমন বাঙালির জনজীবনে ইহকালীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগায় তেমনি তাদের আনন্দ বিনোদনের প্রকাশ ও ঘটে এর মাঝে। কাজেই এ গান বাঙালি হিন্দু মুসলমানের জনজীবনের স্পন্দন।

গাজির গান বাঙালির চিরায়ত লোকনাট্যের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এগিয়ে চলে। এর মাঝে পাওয়া যায় কাহিনি, অভিনয় কুশলতা, সংলাপ, কাব্যময় সঙ্গীত এবং কৌতুকপ্রিয়তার সমন্বয়। সাধারণ মানুষের জীবন ভাবনাকে অনুসরণ করে কাহিনীর চরিত্রের সুখ-দুঃখের সাথে একাকার হয়ে যায় বাঙালির জীবন। দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট একঘেয়ে জীবনের পীড়ন এবং যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তিলাভের একটি আশ্রয়স্থল এ গান। মানত এবং পুণ্য অর্জনের পাশাপাশি আনন্দ উপভোগও এখানে মুখ্য। প্রাত্যহিক কর্মজীবনে এভাবে গাজিরগান মানবচিত্তকে জয় করে থাকে। বাঙালির শিক্ষা ও শাস্ত্র জ্ঞানের গভীরতার যে অপূর্ণতা সে অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করে দেয় উদার চিত্ত ও সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থান। তাইতো এ জাতির লোকসঙ্গীত, পালাগান, ছড়া, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রবাদ প্রবচন, কিংবদন্তি, ব্রত কথা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ ঘটে। রোগ-শোক পীড়িত ও অভাব অনটনের মাঝে সেবা, সাহায্য, অনুগ্রহ কামনায় গাজির গানকে অনুষঙ্গ বিবেচনা করে বাঙালি, আর এভাবেই গাজিরগান হয়ে ওঠে জনজীবনের অনুকৃতি।

---

[২৪] তদেব।

[২৫] সাক্ষাৎকার : ধীরেন্দ্র নাথ দাস ।

[২৬] তদেব।

[২৭] তদেব।

[২৮] সাক্ষাৎকার : রমজান আলী শেখ ।

[২৯] তদেব।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

মেহেরপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি : লোক-কারুশিল্প ও লোকছড়া

ইয়াসমিন আরা সাথী *

Abstract: Meherpur district is situated in the west side of Bangladesh. The role of this district unique in the changing situation of history. The folklore of this district is prosperous and wealthy.The material folklore and folk-rhyme of this area has been developed in its own way. In this article the author tried to expose the nature and characteristics of these folkloric elements.

ভূমিকা

মেহেরপুর অঞ্চল বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ জনপদ। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ জেলাটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, লোক সংস্কৃতির দিক থেকেও এ জেলাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ভৌগোলিক অবস্থান, জনবসতির ধরন, লোকসমাজের আচার-বিশ্বাস-সংস্কার এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এখানকার বিচিত্র, বহুমাত্রিক লোকসংস্কৃতি। এই প্রবন্ধে মেহেরপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি, বিশেষভাবে, ঐ অঞ্চলের লোক-কারুশিল্প ও লোকছড়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মেহেরপুরের লোক-কারুশিল্প

মেহেরপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি উন্নত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, পেশার দিক থেকে এ অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। কামার, কুমার, কাঠুরে, ঘরামি, দর্জি, কবিরাজ, ধোপা, নাপিত, ডোম, চর্মকার, জেলে, ছুতার, স্বর্ণকার, কলু, তাঁতি প্রভৃতি পেশার মানুষ এ অঞ্চলে বাস করে। এছাড়াও এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত। মেহেরপুর অঞ্চলের কৃষকদের লোক-কারুশিল্পের মধ্যে মধ্যে লাঙল, জোঁয়াল, মই, কোদাল, কাঁচি, নিড়ানি, হুঁক্কা, কল্কি, ধামা ঢেকি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। কৃষকের গরু যেন মাঠে গিয়ে অন্যের ফসল নষ্ট করতে না পারে সে জন্য বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সুনিপুণভাবে ভাবে 'ঠুশি' তৈরি করে গরুর মুখে বেধে দেওয়া হয়। এছাড়াও মাথাল বাঁশের তৈরি লাঠি কৃষক ব্যবহার করে। মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় 'বিত্তি', কোঁচ, পলো, খালুই , বেড়জাল, খড়ারজাল, ফাঁদজাল। জেলেরা কাপড় বুনানোর জন্য তাঁত

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া।

ব্যবহার করে। এছাড়াও কামারের আছে হাতুড়ি, সাঁড়াশি ইত্যাদি। কুমারের আছে চাকা, ছুতারের আছে বাটালি, করাত, কামার তৈরি করে দা, বটি, খুন্তি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, নিড়ানি, কুড়াল, স্বর্ণকারের আছে কাতানি, প্লাস, যন্ত্রি, স্বর্ণা, ছোট হাতুড়ি, সাঁড়াশি ইত্যাদি। কুমার তৈরি করে হাঁড়ি, টব, ফুলদানি, ঢাকনা, ছাইদানি, পানদানি, বিভিন্ন ধরনের বাসন-কোসন, দেবদেবীর মূর্তি এবং খেলনা। ছুতার তৈরি করে কাঠের আসবাবপত্র স্বর্ণকার তৈরি করে গহনা। এছাড়া রাজমিস্ত্রির কুন্নি, ছেনি, এ অঞ্চলের লোক-কারুশিল্পের উপাদান।

মেহেরপুরের গ্রাম অঞ্চলে এক সময়ে অধিকাংশ বাড়িঘর ছিল মাটির দেয়ালের উপরে খড় বা শণ দিয়ে তৈরি। আসবাব বলতে ছিল চৌকি, টাক, ঘরের দেয়ালের সঙ্গে দেঁতো লাগানো থাকতো। এর উপর কাঠের তক্তা দিয়ে জিনিস পত্র রাখা হতো । বাঁশ, শণ, পাটখড়ি ও টিনের তৈরি ঘরগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা, ছাপড়া টিন দিয়ে ছাউনি দেওয়া ঘরগুলোতে চালের উপরে চাঁদ, পাখি, ফুল ইত্যাদি নকশা আঁকা হয়।

সাধারণত পরিচিত জগতের রূপ ও ব্যবহার্য বস্তুর ছবি লোকচিত্রে স্থান পায়। মেহেরপুরের লোকচিত্রের মধ্যে নকশি কাঁথা, নকশি পাটি, নকশি শিকা, নকশি ছাচ, নকশি পুতুল, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। নকশি কাঁথাতে সাধারণত ফুল, লতাপাতা, মাঁছ, চাঁদ, তারা, ধানের ছড়া, কোনো ঘটনা, কোনো উপাখ্যান, কোনো বাণী, প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। মেয়েরা চটের উপরে সুচ-সুতা দিয়ে বিচিত্র নকশা আঁকে, কাঁথা নিয়ে মেহেরপুরে একটা গল্প প্রচলিত আছে, এক হুজুর মাঘ মসের তীব্র শীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ফতোয়া দেন স্ত্রীলোকের পরিধেয় কাপড় দিয়ে তৈরি কাঁথায় শোয়া নাজায়েজ, বক্তৃতা শেষ করে ঐ হুজুর যখন ঘুমাতে যান গৃহকর্তা তাকে একটা পাতলা চাদর দেন, বেচারা সারা রাত কষ্ট করে সকালে উঠে গুরুর কাছে গিয়ে এ ঘটনা উল্লেখ করেন। গুরু তখন বলেন গরম কালের বক্তৃতা শীতকালে বললে তো ভোগান্তি হবেই।

নকশি পাখায় বিভিন্ন ধরনের ফুল লতাপাতা আঁকা হয়। তালের পাতা, খেজুরের পাতা, নারিকেলের পাতা দিয়ে নকশি পাটি বুনানো হয়। পিঠার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুলি পিঠা, চিতুই পিঠা, সরা পিঠা ইত্যাদি। এছাড়াও মেয়েরা গমের ডাটা, ধানের শিষ, দেশলাই এর কাঠি, নারিকেলের খিল (কাঠি) দিয়ে কাপড়ের উপর চিত্রাঙ্কন করে দেয়ালে টানিয়ে রাখে।

মাটির হাড়ি, বাঁশের তৈরি আসবাব, পাটের দড়ি, শিকা, ব্যাগ, ভেষজ ঔষধ, মাছ ধরার জাল, কাঠের আসবাব ইত্যাদি মেহেরপুরের কুটির শিল্প।

বিভিন্ন ধরনের লোকযান যেমন গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি, পালকি, নৌকা, প্রভৃতি মেহেরপুর অঞ্চলের লোক-কারু শিল্পের অন্যতম। ঢাক, ঢোল, খঞ্জুরি, একতারা, কাঁসি, বাঁশি, শঙ্খ প্রভৃতি লোকবাদ্যের ব্যবহারও এ অঞ্চলে দেখা যায়।

মেহেরপুর অঞ্চলের লোক-ছড়া, লোক-প্রবাদ ইত্যাদি

মেহেরপুর অঞ্চলের লোক-ছড়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কেবল মাত্র মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সহজ সরল কিছু শব্দের মালা গেঁথে ছড়া তৈরি করা হয়। ছড়া ছন্দোবদ্ধ সহজ সরল ক্ষুদ্র কবিতা যার অবয়ব ধ্বনিময়, তালপ্রধান শব্দগুচ্ছ নিয়ে গড়ে ওঠে এবং যার ভঙ্গি চটুল, চঞ্চল-গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। মেহেরপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াগুলো বৈচিত্র্যময় নিছক মনোরঞ্জনের জন্য কখনো বা খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে ছড়াগুলো রচিত। যেমন নিম্নের কয়েকটি ছড়া:

১. ইন্নিফুল বিন্নিফুল
আরতিফুল কেশে
বেড়া ভেঙে বউ পালালো
শিয়াল মরলো হেসে।

২. এলাটিং বেলাটিং
থার্টিং ফোরটিং
ব্যাঙে বাজায় বাঁশি
ঘুঘরো পোকা মিথ্যা করে
জীবন হলো ফাঁসি
শ্যাম সিন্দূর
ব্যাঙের ইন্দুর।

৩. এরান্টি বাইস্কোপ
তেরান্টি তেইস্কোপ
চুলটানা বিবিআনা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
রাজবাড়িতে যেতে
পানসুপারি খেতে
পানে নেই মরিচ বাটা
ইস্কুল ঘরে চাবি আটা।

৪. ইলিশ মাছের ত্রিশকাঁটাঁ
বোয়াল মাছের দাড়ি
টিক্কা খান ভিক্ষা করে
বাংলাদেশের বাড়ি।

ধাঁধার প্রকৃতি আলাদা হলেও তা ছড়ার ছন্দেই পরিবেশিত হয়। ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি শাখা, বাংলার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ধাঁধার খোরাক জোগায়। মেহেরপুর অঞ্চলের ধাঁধার মধ্যে বৈচিত্র্যময়তা আছে, মানুষ ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি, প্রকৃতি, জগৎ, গাণিতিক সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ধাঁধা আছে। বাংলাদেশে সব অঞ্চলের ধাঁধা প্রায় একই রকম, আঞ্চলিকতা ভেদে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন মেহেরপুর অঞ্চলের এই ধাঁধাগুলো—

১। ঘর আছে দরজা নেই, মানুষ আছে তাতে কোনো কথা নেই। (উত্তরঃ কবর)
২। ভাড়ানির বিটা ভুতু, পায়ে তার চৌদ্দ শিকের জুতু। (উত্তরঃ ছোটলোক)
৩। তিন অক্ষরে নাম যার জলে বাস করে , মাঝের অক্ষর কেটে দিলে
আকাশেতে ওড়ে। (উত্তরঃ চিতল)
৪। অণ্ড কেটে খণ্ড করি দেহ দিলাম জলে,
চামড়া ছুলে বিক্রি করি হাড়ে আগুন জলে। (উত্তরঃ পাট)
৫। পর্বতে আছি আমি, গর্তে আছি আমি পাহাড়েতে নই। {উত্তরঃ (ঁ) রেফ }[৩]

---

[৩] নাজু খাতুন। কুঠিপাড়া,গ্রামঃ আমঝুপি,জেলাঃ মেহেরপুর।

প্রবাদ হচ্ছে ব্যক্তিক জীবনের উপলব্ধিজাত ফসল, প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির আত্মিক পরিচয় জানা যায়। এগুলোও ছড়ার ছন্দে রচিত হয়। মেহেরপুর অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি মানুষ কথার সাথে প্রবাদ বলে। প্রায় প্রতিটি প্রবাদ অর্থবহ এবং প্রাসঙ্গিক। এখানকার অশিক্ষিত মানুষের প্রবাদ ব্যবহার অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে চমৎকৃত করে।

১। সাতটি জিনিসের উপর বিশ্বাস করতে হয় না, নদীর ধারে বাস/ বালুর চরে চাষ/ আভেজানো বাঁশ/ নারীর মুখে হাস/ জুয়া পাশা তাস।

২। আটা বলো পিঠা বলো ভাতের অধিক নয়।

৩। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

৪। যত হাসি তত কান্না
বলে গেছেন রাম স্বর্ণা।

৫। চল্লিশ মন দুধ নষ্ট করতে এক ফোঁটা গো-চুনাই যথেষ্ট।[৪]

মেহেরপুর অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস মিহির এবং খনা এ অঞ্চলে বসবাস করতো। নিচে খনার বচনের নমুনা দেওয়া হলো।

১। খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।

২। খনা বলে শুন শুন
শরতের শেষে মুলা বুন।

৩। ভাদর মাসে তুলা চাষে
পয়সা পোশাক বিড়ি আসে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মেহেরপুরেও মন্ত্র এবং যাদু বিদ্যার ব্যপক প্রচলন আছে। এগুলাও ছড়ার আকারে রচিত হয়। এক শ্রেণীর মানুষ তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। মন্ত্র হলো প্রাচীন যাদুবিদ্যার একটি অঙ্গ, যা বাংলার লোকজ সম্পদ। মেহেরপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিষধর সাপের ছোবল থেকে বাঁচতে, সাপের বিষ নামাতে এবং বাড়িতে সাপের উৎপাত ঠেকাতে মন্ত্র ব্যবহার হয়। কয়েকটি মন্ত্রের নমুনা দেওয়া হলো—

১) বনের ভিতরে ছিল তিন সরোবর
কালকূটের বীজ ভাসে জলের উপর
সেই জল ভোলা ভক্ষণ করিলেন
তানের ঘরে কালকূটের বিষ পানি হয়ে গেলেন,
উপায় না দেখে বরি বসিলেন ধ্যানে
ললিতা দান মন্ত্র ঝাড়েন তিন আঁচলে,
ঝাড়িতে ঝাড়ি বিষ বহুড়ে যায়
ললিতা ডাকিয়া বলে বিষ নাই তোর গায়,
নাই বিষ বিষহরি রাজ্য বনে বিষ নাই।

[৪] ভরসা মিয়া, গ্রাম:আমঝুপি, থানা:মেহেরপুর, জেলা:মেহেরপুর।

২) সহস্রফণা ভরের নাগ ছিলেন পাতালেতে
লক্ষ্মীসহ ছিলেন গোঁসাই সিন্ধুর ও জলে
কন যার মান কন,
উগালেতে দিলেন বিষ হলেন গঙ্গার পানি
ঘেদিরিয়া দিলেন বিষ উজানেতে বেগে
তেত্রিশ কোটি দেবতা পালায় বিষেরও বেগে
পাতাল থেকে বিষ ছাই হল গগন
প্রভুদের বলিলেন তখন দেবদে নাচন।[৫]

চোর বন্দী করার মন্ত্র

চোর চোরনি গাছের পাতা
যে চোর আইয়ো কাটা মাথা
ভাঙা লাঙল পুরান ঈশ,
চোরার বাণ মারলাম চৌদিশ
আসব চোরা হাস্যা
মরব চোরা কাইন্দ্যা,
ঘরের সিঁড়ির দুয়ার বান্দা
তেলের হাঁড়িতে চকমক নুনের হাড়িতে ফুল
হিন্দের মুখে বাইন্দা যইছি এ কোনো চোর।

ভেলকিবাজি আমাদের সামনে প্রাচীন কাল থেকে আছে, মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে রোগনিরাময়ে, জিনিস হারিয়ে গেলে তার সন্ধানে যাদুবিদ্যার প্রয়োগ এবং ভেলকিবাজি দেখা যায়, যেমন কোমরের ব্যাথা নিরাময়ে ভেঙে যাওয়া হাড় জোড়া দেওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র পড়ে হাতের কলাকৌশল করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়।

আঁত রস দাঁত রস বাতের রস
তন্ত্র বলে দন্ত ভাই
কেউরে কেউ ছাড়াইয়া যাই
তবে লাগে বাপের দোহাই।

গৃহবধূর গহনা, তৈজসপত্র হারিয়ে গেলে এক শ্রেণীর মানুষ বাটি চালান, ঝাঁপ চালান, আয়না চালান দিয়ে হারানো জিনিসের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেন, বন্ধা নারীর বন্ধ্যাত্ব মোচন, সুস্থ সন্তান প্রসবের জন্য তাবিজ, কবজ, পাট পড়া, গিঁট বাঁধার প্রচলন আছে এ অঞ্চলে।

---

[৫] আবুল হোসেন গ্রাম: আমঝুপি, থানা: মেহেরপুর, জেলা: মেহেরপুর।

উপসংহার

লোকসংস্কৃতিতে বাংলাদেশ যে সমৃদ্ধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকসংস্কৃতি মানব মননের দর্পণ। বাংলাদেশের আনাচে-কানাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতি নানা উপাদান। মেহেরপুর বাংলাদেশের ছোট্ট একটি জেলা। কিন্তু এই জেলার সর্বত্রই হাজারো লোকসংস্কৃতির অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতার কারণে এই জেলার বিভিন্ন এলাকায় লোকসংস্কৃতি যে উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা আরো সমৃদ্ধ হবে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানে নারীর আর্তি

মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগম*

Abstract: Folk songs are usually a branch of songs closely connected to folk life, society. The folk song of northern area of Bangladesh, named *vaowaya* is based on the natural environment, life style and culture of that area. It is available written and unwritten form. In this article, the author tried to explore themental agitation of the women in the songs colledted from northern region of Bangladesh.

ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ হলো ভাওয়াইয়া গানের প্রাণ কেন্দ্র। এই গানের জন্মস্থান মূলত রংপুর ও ভারতের কুচবিহার। তবে আজকাল বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ভাওয়াইয়া গান গীত হয়ে থাকে। এ গানের কথা ও সুর সহজেই সকল শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। ভাওয়াইয়ার মূল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো, এই গান এই মাটির রসে এতো প্রাণবন্ত যে, অন্য মাটির স্পর্শে এর রস ও সৌন্দর্য বিকৃত হয়। তাছাড়া এই গানের স্বভাব-ধর্ম এই যে, মূলত উত্তরবঙ্গের শিল্পীকণ্ঠ ছাড়া এর সুরযোজনা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইখানেই ভাওয়াইয়ার সাথে অন্যান্য গানের পার্থক্য। ভাওয়াইয়া সুর-লালিত্যে ভরপুর। মরহুম গায়ক আব্বাস উদ্দীনকে এই গানের পিতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই গানের আকর্ষণীয় শক্তি এমনই যে, নিমিষে এ গানের সঙ্গে মানুষের মন, মানুষের ধ্যান-ধারণা, মানুষের চিন্তা-ভাবনা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব লয় হয়ে যায়। তাই এ গান শুনে মানুষের ঘুমন্ত আত্মা জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং মাটির ধারায় মাটির তৈরি মানুষের সাথে প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এক কথায় বলতে গেলে এই ভাওয়াইয়া গান মাটির পৃথিবীকে মায়াময় ও মোহময় জগতে রূপান্তরিত করে তুলেছে।[১]

ভাওয়াইয়া গান অতি প্রাচীন কাল থেকেই গীত হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-বেদনা, পরকীয়া প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে রচিত। প্রাচীন আমলের

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, আলাউদ্দিন সিদ্দিকী মহাবিদ্যালয়, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

[১] সামীয়ূল ইসলাম, *উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য (গান ও মেয়লী গীত)* (রংপুরঃ বেগম আয়েশা ইসলাম, ১৯৭৩), পৃ. ১৫।

গানগুলোর গীতিকারের নাম না পাওয়া গেলেও, আধুনিক কালের গীতিকারগণের নাম জানা যায়। যেমন বিখ্যাত কয়েকজন ভাওয়াইয়া গানের গীতিকার হলেন, হরলাল রায়, মহেশচন্দ্র রায় প্রমুখ।

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক গান। এ গানে উত্তরাঞ্চলের জনজীবন, প্রকৃতি-পরিবেশ, ভূমিগঠন, ভাব-ভাষা ও যাপিত জীবন প্রণালীর তথ্যাদি প্রতীয়মান। সাধারণত পুরষরাই ভাওয়াইয়া গান বেশি গায়। এ গানের কথা নারীদের জীবন-যন্ত্রণা ও বিরহ-যাতনা নিয়েই বেশি রচিত। সব গানেই নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বাণী নিয়ে রচিত। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে পল্লীবালার প্রেমার্তি, বিচ্ছেদ-যাতনা ও মিলন-ব্যাকুলতা বেশি দেখা যায়। নারীর বেদনা-বাণী, নারীর পরকীয়া প্রেম, সমাজ জীবনে নারীর অবস্থান সব কিছুরই ভাওয়াইয়া গানে সন্ধান মেলে। কেন নারীদের বিরহ-বেদনা, প্রেম-মিলনার্তির কথা পুরুষদের কণ্ঠে গীত হয় সে প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক মত প্রকাশ করেন: 'আর্যীভবন এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে কোচরাজগণের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়; গ্রামের ভেতর এই বিরহ ভাবনা জাগানো উদাসিয়া গান গাওয়া চলবে না, হয়তো নারীর কুলধর্ম রক্ষা করবার জন্যই সরাসরি নারীর কণ্ঠে বিরহ বেদনার কথা ব্যক্ত না করে পুরুষের কণ্ঠে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।'[২] আলোচ্য প্রবন্ধে ভাওয়াইয়া গানে নারীর আর্তি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু নারীর সাক্ষাৎকার এবং সীমাবদ্ধতার কারণে প্রচলিত কিছু ভাওয়াইয়া গানকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই এতে তাত্ত্বিক আলোচনার কিছু ঘাটতি আছে বৈকি।

নারী ও সমাজ

বাঙালি সমাজের সামাজিক বিধি-বিধানগুলো সাধারণত নারীদের অধিকার-বঞ্চিত করে রাখে। ভাওয়াইয়া সাক্ষ্য প্রদান করে সুনির্দিষ্টকাল ব্যাপী নারী বৈষম্যের শিকার। নারীরা অধিকার-বঞ্চিত এবং মৌলিক অধিকার কি, তারা তাও জানে না। একটি কন্যা শিশু সাত থেকে আট বছর বয়স হলেই পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে নিকটতম আত্মীয় স্বজনরা বোঝাতে থাকে তুমি 'নারী'। নারী নির্যাতনের উৎসভূমি মূলত পিতৃগৃহ। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতানুসারে: 'বধূ নির্যাতনের মূলে রয়েছে কন্যা নির্যাতন।'[৩] পরিবারে পিতা-মাতার নিকট থেকে শিশুরা শেখে হীনম্মণ্যতা। সেখান থেকে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। 'পিতৃগৃহ থেকেই নারীর মানসিক ও শারীরিক অবদমনের পালা শুরু হয়। শ্বশুর-স্বামীগৃহেও তা অক্ষুণ্ন থাকে।'[৪] লোকসঙ্গীত যেমন লোকজীবন বাস্তবতার, লোকসংস্কৃতির অলিখিত দলিল, ঠিক তেমনি নারী জীবন ও সমাজ বাস্তবতার দর্পণও বটে। এ দর্পণে দেখা যায় নারীর জীবনচরিত। সে জীবনচরিত সুন্দর-সুখময় নয়। নিতান্ত দুঃখ দুর্দশাক্লিষ্ট, দুর্বিষহ জীবন বাস্তবতার আধিক্যই লক্ষণীয়। সব কিছুর মূলে সামাজিক বিধি বিধানই অনেকাংশে দায়ী। সেইসব সামাজিক বিধি-বিধানের স্রষ্টা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এখানে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা কিংবা চাওয়া পাওয়ার কোনো মূল্য নেই। অনেকাংশে বিধানগুলো নারীদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করার জন্যই তৈরি করা হয়। সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন সকল ক্ষেত্রে নারী চিরকাল বৈষম্যের শিকার। সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে নারী লাঞ্ছনার

---

[২] নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৯, পৃ. ৮৯।

[৩] অশোক রুদ্র, *সমাজে নারী পুরুষ অন্যান্য প্রবন্ধ* (কলকাতা, ১৯৯০), পৃ. ২১।

[৪] অশোক রুদ্র, পৃ. ২২।

চালচিত্র। উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানে অকপটে প্রকাশ মেলে নারীর জীবন-যন্ত্রণার বিচিত্রতর চিত্র কথন 'আর্তি'।

ভাওয়াইয়া গানে নারীর আর্তি

ভাওয়াইয়া গানে নারী-জীবনের বহুমাত্রিকতা প্রতীয়মান। নারী সকল কালে সকল সময়ে বঞ্চিত ও অতৃপ্ত। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পায় না কাঙ্ক্ষিত বস্তু, তাই তাদের মনের বাসনাগুলো অতৃপ্তই থেকে যায়।

নারীর প্রেম এবং নারীর বিরহ-যাতনা ভাওয়াইয়া গানে বেশির ভাগ স্থান দখল করে রয়েছে। গানের কথা ও সুরে প্রকাশ পায় সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, পণ-প্রথা, অসমবয়সী নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক, বিবাহ বিচ্ছেদ এমনকি পরকীয়া প্রেমে নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে সমাজপতিদের বিশেষ ভূমিকা। বিয়ে সামাজিক প্রথা, অথচ এখানে পুরুষের মতামতের মূল্য রয়েছে কিন্তু নারীর নেই। কি পিতৃগৃহ কি স্বামীগৃহ সর্বত্রই নারীর অবস্থা একই রকম। এর প্রমাণ মেলে নিম্নের প্রচলিত ভাওয়াইয়া গানে:

আইলোত ফোটে আইল কাশিয়া দোলত ফোটে হোলা।
ও হো রে বাপ মাও ব্যাচেয়া খাইছে, সোয়ামী পাগেলারে ॥
লোকে যেমন ময়নারে পোষে পিঞ্জিরায় ভরিয়া;
ও হো রে ওই মতো নারীর যৌবন রাখি চোঙ বান্দিয়া রে ॥[৫]

সামাজিক প্রথা মতে বিয়ের ব্যাপারে বাবা-মা, ভাই এবং পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা নারীর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। উল্লিখিত গানটিতে নারীর জৈবিক চাহিদার কথা প্রকাশিত হয়েছে। নারী দেহগত সুখ পিপাসায় কাতর, কারণ স্বামী পাগল। একজন পাগলের সাথে কন্যাকে বিয়ে দিতে পরিবারের কর্তাদের সমস্যা হয়নি। অথচ নারীর ক্ষেত্রে এটির যথেষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, নারী অসুন্দর হলে পুরুষ বলতে পারে তার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব নয়। পরিবার ও সমাজে নারীর মতামতের কোনো মূল্য নেই। তাই বাধ্য হয়ে নারীকে পাগল বর বিয়ে করে নিজের দৈহিক চাহিদাকে দমন করে রাখতে হয়। আলোচিত ভাওয়াইয়া গানটির আলোকে একজন পল্লীবালার আর্তি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

নিম্নের ভাওয়াইয়া গানে বাল্য বিবাহেরও করুণ আর্তির সন্ধান মেলে:

ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল, আস্তে বোলাও গাড়ি
আর এক নজর দেখিয়া নাও মুই
দয়াল বাপের বাড়িরে গাড়িয়াল, দয়াল বাপের গাড়ি ॥
না জানোঙ মুঁই আন্দন্ বাড়ন্
না জানোঙ মুঁই অস্বন্ পবন্
না পারোঙ মুঁই কুটিবার তরকারী
ননদে পাড়িবে গালি
সদায় কইবে মোক জরম আলসিয়ানী ॥
মুই হনু যে দোকাপুড়ী
সিয়ানা হবার অনেক দেরী

[৫] সাক্ষাৎকার : ময়না বিবি, কেটকি পাড়া, রংপুর।

এলায় ক্যানে আইলেন গাড়ি ধরি
আর কিছু দিন থুইয়া যাও
পুষিবে পালিবে মাও
না নিজান মোক ঠ্যাংগোত নাগে দড়ি ॥[৬]

উল্লিখিত ভাওয়াইয়া গানটিতে এক কিশোরীর বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাবার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কিশোরীটি স্বামীর বাড়ি যেতে চায় না, কারণ সে এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি। স্বামী এবং সে পরিবারের সদস্যদের সাথে মানিয়ে চলার মতো পরিপক্বতা অর্জন করেনি এবং সে গানের বাণীতে আরো স্পষ্ট করে বলে 'সিয়ানা' অর্থাৎ বিবাহের উপযুক্ত এখনো হয়নি। এরপর সে গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, তাকে বন্দি করা হচ্ছে। পিতা-মাতা সচেতন হলে কোনো কিশোরীকে জোর করে বিয়ে দিয়ে স্বামী গৃহে পাঠানোর প্রয়োজন হতো না।

উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে নারী নির্যাতন চিত্রের সন্ধান মেলে। অমানুষ স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নির্যাতিতা বধূটি দেবরকে বলে:

আরে ও মোর ভাবের দ্যাওরা
থুইয়া আয় মোক বাপো-ভাইয়ার দ্যাশে রে
বাপো-ভাই মোর দুরাচার
ব্যাচে খাইচে মদকিয়ার ঘরে রে ॥
মদকিয়া মদ খায়
আগুন দিলে মোর রাতি পোয়ায় রে,
নলের ডাণ্ডে শরীল করছে কালারে ॥
যে নাইয়া করিবে পার
তাক দিম্ মুই গলার হার রে,
পার করিলে যৌবন করি দান রে।
তোর এ দ্যাওরা পিরিতের ভাবে
বাড়ি ঘর মোর না যায় মনে রে
দারুন চিত মোর বাইরাং বাইরাং করে রে ॥[৭]

উল্লিখিত ভাওয়াইয়া গানটিতে নারী নির্যাতনের চিত্র প্রকাশ পায়, সেই সাথে বাবা ভাইয়ের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশিত হয়। নারীর শিক্ষা এবং নারীর সাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। নিম্নের ভাওয়াইয়া গানে তেমনি এক অসহায় নারীর আর্তি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

অলপো বয়সে বিদুয়া নাইয়া রে বিদাতায় করিচে
সোনার যৌবন বয়া যায় পতি নাই মোর ঘরে রে।
ওকি নাইয়া রে পার কর।
ছোট কালে হইছে বিয়া কোলায় বাচ্চা হইলো
শশুর শাউরি হইচে বরি
বাড়ির বাইর করি দিল রে।
পাড়ার লোক হইচে বরি দ্যাকে আড়ে আড়ে

---

[৬] সাক্ষাৎকার : আলিমন বিবি, দোলাপাড়া, রংপুর।
[৭] সাক্ষাৎকার : আলতাজান বিবি, সেনপাড়া, রংপুর।

ছয় মাস হইলো হইচোঁ আড়ি
সগলে নালোচ করে রে।[৮]

গানটিতে নারীর বাল্য বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় সেখানে শুধু বিরহ যন্ত্রণা এবং দুঃখের তথ্যই রয়েছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে এখনো অসমবয়সী নর-নারীর বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অনেক বালিকা বধূই প্রবীণ বরের সঙ্গে ঘর-সংসার করে। উল্লিখিত গানটিতে বালিকা বধূর প্রবীণ স্বামী মারা যায়। নারীটির যৌবন তখন অভিশপ্ত হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর শশুর বাড়িতে আশ্রয় হয় না।

নিম্নের ভাওয়াইয়া গানটিতে বিরহিণী নারী তার প্রেমিক পুরুষ মইষাল বন্ধুকে তাকে ছেড়ে না যাওয়ার করুণ আর্তি জানায়:

আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংড়া মইষাল রে
মইষের পিঠত চড়িয়া মইষাল রে
ছেড়েন কাশিয়ার ফুল।
আষাঢ়ো শ্রাবণ মাসে নদী ছল ছল রে
আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংড়া মইষল রে।[৯]

আলোচ্য ভাওয়াইয়া গানটির মধ্যে এক পল্লী বধূর হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়। নারী সংসারের চার দেয়ালে বন্দী। সেখানে বহির্জগতের আলো প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। স্বামী ব্যক্তিটি জীবন জীবিকার প্রয়োজনে চলে যায় বাইরে। স্বামীর সান্নিধ্য, স্বামীর সোহাগ বঞ্চিত নারী ভাওয়া বা বাথানে মহিষ চড়াতে আসা মইষালের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সময়ের পরিক্রমায় মইষাল এক ভাওয়া থেকে অন্য ভাওয়ায় চলে যায়। তখনি প্রকাশ পায় নারী-মনের আর্তি।

সমাজ-সংসারে কোনো নারী যদি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয় কিংবা স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে না পারে তখন স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা ঐ স্ত্রীকে রেখেই দ্বিতীয় বিয়ে করে। যেহেতু স্ত্রীর অক্ষমতা, তাই নারীকে সতীনের সাথে সংসার করতে হয়। নারীর পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই বোঝায়, অনেক কিছু মেনে নিয়ে নারীদের চলতে হয়। অথচ নারীদের দেহগত সম্ভোগ চাহিদা থাকতে পারে এটা কোনো সময় পরিবার কিংবা সমাজে মূল্যায়িত হয় না। প্রকারান্তরে কথাগুলো নারীবাদী মনে হলেও এটা বাস্তব এবং চিরন্তন সত্য। অনেক পরকীয়া গানে সন্ধান মেলে স্ত্রীকে ঘরে রেখে এবং তার জ্ঞাতসারে স্বামী তার পরকীয়া প্রেমিকার নিকট চলে যায়, তখন স্ত্রী দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে:

কিসের মোর রাঁধন, কিসের মোর বাড়ন
কিসের মোর হলুদি বাঁটা।
মোর প্রাণ নাথ অন্যের বাড়িত যায়।
মোরে আঙিনা দিয়ে ঘাটা
ও প্রাণ সজনি, কার আগে কব দুস্কের কথা ॥[১০]

---

[৮] সাক্ষাৎকার : লিপিকা নাথ, দোলাপাড়া, রংপুর।
[৯] সাক্ষাৎকার : মইজান বিবি, কেটকিপাড়া, রংপুর।
[১০] সাক্ষাৎকার : শাহুবালা, সুন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

স্ত্রী স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে অবগত হয়েও কিছু করতে পারে না। কারণ সে নারী, সে উপার্জনে সক্ষম নয়। বাবার সংসারে ফিরে যাবে, সেখানে তার মূল্য কম। মুসলিম পারিবারিক আইন তাকে পিতার সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেক অংশের দাবিদার বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে নারীর চলে যাবার পথও রুদ্ধ। এছাড়া স্বামী পরিত্যক্তা শব্দটি পিতা এবং ভাইদের সমাজে মাথা হেঁট করবে।

দুঃখের কথা বলার জায়গা নেই এবং শোনারও কেউ নেই। তাই ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে নারী অকপটে তার মনের কথা ব্যক্ত করে এভাবে:

আর যদি দাখোঙ, আর যদি শোনঙ
অন্য জনের সঙ্গে কথা
এহেন যৈবন সাগরে ভাসাব,
পাষাণে ভাঙিব মাথা,
প্রাণ সজনি, কার আগে কব দুস্কের কথা।[১১]

নারী স্বামীর পরকীয়াকে মেনে নিতে পারে না। নারী স্বাবলম্বী নয় তাই দুরাচার স্বামীর অনুগত হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য। নারীর আত্মাভিমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, বড় জোর সে আত্মহত্যা করতে পারে। পুরুষ স্বনির্ভর, উপার্জনক্ষম। কোনো স্বামী যদি জানতে পারতো তার স্ত্রী পরকীয়া প্রেম করে তখন সমাজ-সংস্কার, স্বামী সকলে তাকে শাস্তি দিত। নারী যেহেতু পরগাছা, পরান্নভোগী, সেহেতু তাকে নিরবে স্বামীর পরকীয়া প্রেম মেনে নিয়ে সংসার করতে হয়।

উপসংহার

মোট কথা, সোজা ভাষায়, নারী যতোদিন সমাজে মানুষ হিসেবে মূল্যায়িত না হবে ততোদিন সুযোগ সন্ধানী পুরুষ সুযোগ সৃষ্টি করবে। সমাজ ব্যবস্থায় যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রথা, নারীদের পছন্দ-অপছন্দ মূল্যায়ন না করা, এই বিষয়গুলোতে গুরুত্ব আরোপ করলে নারীর আর্তি আপনা আপনি কমে আসবে। সর্বোপরি নারীকে মানুষ হিসেবে যোগ্য, সক্ষম, পিতার সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্ব আবশ্যক, তবেই নারীর বিরহ বার্তা কম শোনা যাবে ভাওয়াইয়াসহ সকল লোকসঙ্গীতে।

---

[১১] সাক্ষাৎকার : নেকজান বিবি, দোলাপাড়া, রংপুর।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা

শামীমা সুলতানা*

Abstract : Mangal Kabya is a separate realm of poetry in mediaeval Bengali literature. In this sprightly fountain of epic poems, the way personal and social lives of Bengali people are depicted, is rarely found in any other fields of literature. Following a dislinct poetic form, the poets of Mangal Kabya used to compose verses and as a result, they used to end up with blind, deaf, dumb, hunchback and the aged husbands. Inevitably, their lives would become engulfed by dark shadow of sorrows. Generally, women used to narrate their tales of affliction to one another in some special festival. In some cases, illustrations of women's protest is also noticed which is more serious than that of the point of view of the modern feminists.

ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে নারীরা চিত্রিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। বাংলা সাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সাহিত্যের বিশ্লেষণে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষ-রচিত এসব সাহিত্যে নারীরা যথাযোগ্য মর্যাদায় চিত্রিত হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে নারীকে কল্পনা করেছে সেভাবেই চিত্রায়ণ ঘটেছে এসব সাহিত্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। তবে নারীরাও যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া রীতি-নীতির বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার চিত্রও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উঠে এসেছে। মঙ্গলকাব্যে 'পতিনিন্দা' অংশ তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও এই বর্ণনায় কবিগণ তাঁদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পুরোপুরি বিস্মৃত হতে পারেননি তবুও শাস্ত্রীয় জীবনের বাইরে নারীদের যে একটি স্বাধীন চেতনা ছিল তা এই অংশ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রতিনিধিত্বশীল আঙ্গিক মঙ্গলকাব্য। সময়ের ধারাবাহিকতায় সামাজিক প্রবর্তনায় মঙ্গলকাব্য একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চর্চিত হওয়া প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক প্রবণতা ছিল। ফলে এখানে বিষয়ের বিবেচনায় বৈচিত্র্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কবিদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার স্বাক্ষর থাকলেও মঙ্গলকাব্যের প্রখ্যাত অবয়ব থেকে কেউ বেরিয়ে আসেননি। মঙ্গলকাব্য মাত্রই যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা হল— প্রথমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বর্ণনা, তারপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টি রহস্য কথন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, দক্ষরাজের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম,

*ড. শামীমা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, হর-গৌরীর কোন্দল, নানাবিধ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কাব্যকথিত দেবতার মর্ত্যে পূজা প্রচার এবং অবশেষে স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন। এসব বর্ণনা প্রসঙ্গে বারমাসি, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা ইত্যাদি প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যধর্মে পত্নীদের পতিনিষ্ঠা যুগ যুগ ধরে প্রশংসিত। শাস্ত্র মেয়েদেরকে পতিব্রতা ও পতি-অনুরাগিণী হতে বললেও এর বাইরেও তাদের জীবন ছিল। নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় করে নিজেদের হালকা করতে চাইত। মঙ্গলকাব্যের প্রায় সকল কবিই তাঁদের কাব্যে 'পতিনিন্দা' অংশ সন্নিবিষ্ট করেছেন, যেখানে নারীরা পরস্পরের কাছে স্বামী-দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর অবদমন, নিষ্পেষণ ও অধস্তনতার এক নির্মম চিত্র লক্ষ করি। নারীদের প্রতিবাদের চিত্রও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশে নারীদের পিতৃতন্ত্রের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা যায়। মুকুন্দরামের কাব্যে বিয়ের আসরে শিবকে দেখে একবার এবং ধনপতিকে দেখে একবার পতিনিন্দা প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়া মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল*, জগজ্জীবনের *মনসামঙ্গল*, বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে মেয়েরা বিবাহ আসরে লখিন্দরকে দেখে তাদের কালা, কানা, খোঁড়া, কুঁজো, গোদা স্বামীদের নিন্দা করেছে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের নায়ক লাউসেনকে দেখে এয়োস্ত্রীরা তাদের স্বামী-দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করেছে। তাছাড়া ভারতচন্দ্র আরো একধাপ এগিয়ে শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীদের দিয়ে স্বামীর প্রতি নিন্দা প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই সাথে রাজসভার বৈদ্য, পণ্ডিত, মুনশি, উকিল, আরজবেগি, মুহুরি, দপ্তরি এইসব কর্মচারী সভাসদের স্ত্রীদের মুখে পতিনিন্দার কথা বলিয়েছেন।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যধারা। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পদেবী মনসার জন্ম, বিকাশ ও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাহিনি বিধৃত হয়েছে। এখানে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর। কিন্তু সব বাধাকে অতিক্রম করে অন্ত্যজ শ্রেণীর দেবী মনসা সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেবী চণ্ডীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এদিক থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যটি বেশ আলাদা। মধ্যযুগের অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে যেখানে নারী দেবীদের প্রাধান্য সেখানে ধর্মমঙ্গল কাব্যে পুরুষ-দেবতা ধর্মঠাকুরের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

মঙ্গলকাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহ উৎসবকে কেন্দ্র করে নারীরা তাদের অসম ও অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের চিত্রকে তুলে ধরেছে অবলীলায়। "বাঙালির বিয়ের উৎসবে মেয়েদের বিশেষ আধিপত্যকারী ভূমিকা থাকে, সেখানে সমবেত এয়োরা পদে পদে পুরুষদের হেনস্তা ও নিন্দা করে। মেয়েদের পুরুষ-নিন্দার এই ঘটনাটি বাখতিনের কার্নিভাল সংক্রান্ত চিন্তার আলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বাখতিন বলেছিলেন সামাজিক উৎসব প্রতীকীভাবে সমস্ত অবদমন ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির প্রাণোচ্ছল প্রকাশ। ক্ষমতার বিরুদ্ধে, শাসকের ও শাস্ত্রের কর্তৃত্বকারী বাচনের বাধ্যতার বিরুদ্ধে উৎসবের কণ্ঠ সক্রিয় হয়ে ওঠে। উৎসব হল সমবেত এবং সমতাবাদী, এ হল এমন এক আচারমূলক সামাজিক ঘটনা যেখানে জনগণের

অ-প্রাতিষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর প্রাতিষ্ঠানিক কণ্ঠস্বরকে তুলোধোনা করতে চায়।"[১] সাধারণত এয়োস্ত্রী ও বৃদ্ধরাই এ অংশে পতিনিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। স্ত্রীদের পতিনিন্দায় প্রাধান্য পেয়েছে স্বামী বিড়ম্বনা। শারীরিক দিক থেকে বিকলাঙ্গ পুরুষের পত্নীরাই এখানে অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে। এদের অধিকাংশের স্বামী বুড়ো, কালা, কানা, খোঁড়া বা কুঁজো, গোদা। আর বুড়িদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে কামনা-বাসনা। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে লখিন্দরের বিবাহ উৎসবে নারীদের পতিনিন্দার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানে রাধা, রুই, সরু, নীলা, রূপাই, চুয়া প্রমুখ এয়োস্ত্রী তাদের দাম্পত্যজীবনের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছে —

এক আইয় আইল তাহার নাম রাধা।
ঘরের স্বামী আছে পোসনিয়া গাধা ॥
... ...
আর আইয় আসিল বলে মিথজি আমি।
ঘরের বাহির না হয়ে না মরে মোর স্বামী ॥
না সরে না জিয়ে কেবল সদা করে কোপ।
সকল শরীরে নাহি লখাইর গায়ে[র] রূপ ॥
এ স্বামী কাজ নাই দেশে মাগি খাই।
মাগিয়া খাইতে আমি লখাইর দেশে যাই ॥[২]

এখানে লখিন্দরকে দেখে এয়োস্ত্রীরা তাদের স্বামীদের দোষ-ত্রুটিগুলো তুলে ধরেছে। এমনকি স্বামীকে ত্যাগ করে লখিন্দরের দেশে গিয়ে ভিক্ষা করে খেতেও তাদের আপত্তি নেই এমন মনোভাবও তারা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছে। এছাড়া বৃদ্ধাদের অবদমিত কামনা-বাসনার প্রকাশও এখানে লক্ষ করা যায়। কিছুটা হাস্যরসের আবহ সৃষ্টি কবির লক্ষ হলেও তৎকালীন সমাজের নারীদের সুদীর্ঘ বঞ্চিতজীবনের বহিঃপ্রকাশ তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

ঘাড় গুজা বুড়ি বলে সাধ নাহি গণ্ডগোলে
আপনা আপোনাকে[ন] বুঝি ॥
যদি পাম সরস বোল লখাইরে ধরিয়া দেম কোল
তবে সে মনের দুখ ঘোচে।
কহিতে নাহিক ত্বর কতবা বয়েস মোর
বিধি মোরে হইল নিদারুণ ॥[৩]

মঙ্গলকাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশে দেখা যায়, যে এয়োস্ত্রীদের স্বামী অন্ধ, কালা, খোঁড়া, বোকা, কুঁজো কিংবা বুড়ো সাধারণত তারাই পতিনিন্দায় সরব হয়ে উঠেছে। বিবাহ আসরে সুদর্শন বরকে দেখে তারা স্ব-স্ব স্বামীর সঙ্গে তুলনা করে বঞ্চিত জীবনের বিবিধ আলেখ্য তুলে ধরেছে —

আর যুবতী বোলে কথা মিথ্যা নাই তোর।

---

[১] অপু দাস, *বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ:নারীবাদী পাঠ* (কলকাতা: ডি. ডি. এণ্ড কোং, ২০০৬), পৃ. ১৫৪।

[২] বিজয়গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ*, জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পা.), (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), পৃ. ৩৮২-৩৮৩।

[৩] বিজয়গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ*, পৃ. ৩৮৫।

আমি হেন সুন্দরী নারী স্বামী কুজা মোর ॥
কর্ম্মে কিছু নহে কুজা কথার নাগর বুড়া।
উবুর হৈয়া সুতে কুজা যেন নায়ের গুড়া ॥[৪]

এ থেকে ধারণা করা যায় মেয়েদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিকলাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া হত। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতকে যে উপেক্ষা করা হত তা উপর্যুক্ত দৃশ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। তাছাড়া তৎকালীন সমাজে অসমবিবাহ যে প্রচলিত ছিল তাও এখানে স্পষ্ট। বৃদ্ধের সঙ্গে যুবতীদের বিয়ে দিতেও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ দ্বিধা করতেন না। ফলে তাদের দাম্পত্যজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত —

এক জুবতী বলে প্রিয়া তোর নাপন ভাল।
মোর কপালে মিলিয়াছে জক্ষ বুড়াকাল ॥
এক মনে কহো জদি য়ঙ্গচঙ্গের কথা।
বুঝে বা না বুঝে কালা সদাই নাড়ে মাথা ॥[৫]

বৃদ্ধ পতির যুবতী স্ত্রীদের শারীরিক-মানসিক অতৃপ্তির বেদনা এই পংক্তিগুলোতে উঠে এসেছে। বয়সের পার্থক্যের কারণে বয়োবৃদ্ধ স্বামীরা স্ত্রীদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটাতে ব্যর্থ হত। ফলে অবদমনই হয়ে উঠত নারীদের নিয়তি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা এই অসম বিবাহের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও কেউ কেউ এটিকে নিজের কর্মফল ভেবে সান্ত্বনা খুঁজেছে —

এক ঠাটী বলে মোর কর্ম্মফলে
পতি অতিশয় বুড়া।
দুর্দ্দিনের কালে ফেলাইল জলে
টিপশোকা মোর খুড়া ॥[৬]

'পতিনিন্দা' অংশে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে পুরুষরা কানা, খোঁড়া, কুঁজো বা বৃদ্ধ হলেও তারা নিতান্ত শান্তশিষ্ট নয়। বরং স্ত্রী নির্যাতনে তারা সিদ্ধহস্ত। রান্না-বান্নায় সামান্য দেরি হলে তারা স্ত্রীদের নির্মমভাবে প্রহার করতেও দ্বিধা করত না—

একদিন অন্নবেঞ্জন দিড় করি রান্ধি।
মারয়ে পীড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি ॥[৭]

তৎকালীন সমাজে নারীদের কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। বরং তারা ছিল পিতা কিংবা অন্য কোনো কর্তাব্যক্তির হাতের পুতুল। তারা যেভাবে অঙ্গুলি সংকেত করত, নারীকে সেভাবে

---

[৪] জগজ্জীবন, *মনসামঙ্গল*, সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ ও আশুতোষ দাস (সম্পা.) (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), পৃ. ১৮৯।

[৫] মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুনীলকুমার ওঝা (সম্পা.) (শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্বদ্যিালয়, ১৩৮৪), পৃ. ২০০।

[৬] ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, পীযূষ কান্তি মহাপাত্র (সম্পা.) (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), পৃ. ২৫৮।

[৭] মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, পৃ. ২০১।

চলতে হত। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও এর বিরুদ্ধে মেয়েদের মনে যে ক্ষোভের জন্ম হত তার বহিঃপ্রকাশ আমরা 'পতিনিন্দা' অংশে লক্ষ করি —

আমার কপাল মন্দ ভাতার সে কুড়ে।
বারমাস বচনে বিশেষে মরি পুড়ে ॥
করে নাঞি কর্ম কাজ কোলে থাকে বসে।
ঘটকালি করেছিল নির্বুংশে পিসে ॥[৮]

বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে অনুপযুক্ত বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা মেয়েদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। ফলে বিয়ের আসরে বা অন্যত্র কাব্যের নায়ককে দর্শন করে বিবাহিত নারীগণ তার সঙ্গে নিজেদের স্বামী-দুর্ভাগ্যের কথা পরস্পর ব্যক্ত করে। এর মধ্য দিয়ে তাদের অবদমিত কষ্টেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে —

উজানির নারীগণ বালার চাহে মুখ।
দেখি নারীগণের মনে লাগে সুখ ॥
দেখিয়া যুবতীগণ করে হায় হায়।
কিরূপে সৃজিল রূপ কুন বিধাতায় ॥
আমার বাপ মাও তবে দুই চক্ষ ধরে।
কড়ি খায়া দেলে মোকে সড়া পচার ঘরে ॥[৯]

অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানব-মনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন — ইড(Id), ইগো(Ego), সুপার ইগো(Super Ego)। এর মধ্যে ইড স্তর মানুষের অবদমিত বাসনার আশ্রয় স্থল। মানুষের যে বাসনা সমাজ-বাস্তবতায় চরিতার্থ হয় না তা ইড স্তরে আশ্রয় নেয়। কোনো অসচেতন মুহূর্তে কিংবা উৎসব-মুখর পরিবেশে তা জেগে উঠতে চায়। মঙ্গলকাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশেও আমরা দেখি, দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত নারীর বাসনার বহিঃপ্রকাশ, যা স্বাভাবিক সামাজিক, পারিবারিক প্রেক্ষাপটে হয়তো অপ্রকাশিতই থেকে যেত। *মনসামঙ্গল* কাব্যের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে বিবাহের আসরে লখিন্দরকে দেখে উজানী নগরের নারীরা যে সতৃষ্ণ রূপ-বন্দনায় মেতে ওঠে তাতে তাদের অবদমিত বাসনার অচরিতার্থতার বেদনাই স্পষ্টতা পায়। নারীদের এ অবদমনের পেছনে প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার ভূমিকাই প্রধান। পারিবারিকভাবেও নারীরা ছিল অবহেলিত। তাই সামান্য উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে মেয়েকে অপাত্রে সম্প্রদান করার দৃশ্যও আমরা উপরিউক্ত পংক্তিগুলোতে দেখি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে পতিনিন্দা

মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গল কাব্যটি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত আঙ্গিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে ভারতচন্দ্র তাতে নতুনত্ব যোগ করেছেন। পরিশীলিত ভাবনা ও নাগরিক চেতনায় ভারতচন্দ্রের অনন্যতা সহজলক্ষ। নারীগণের পতিনিন্দায়ও মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি

---

[৮] মানিকরাম গাঙ্গুলি, *ধর্মমঙ্গল*, বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত (সম্পা.) (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), পৃ. ২২৭।

[৯] জগজ্জীবন, *মনসামঙ্গল*, সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ ও আশুতোষ দাস (সম্পা.) (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), পৃ. ১৮৯।

ভারতচন্দ্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের ছাড়িয়ে গেছেন। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবির পতিনিন্দায় অংশ নেওয়া নারীরা প্রায়ই অশিক্ষিত এবং মূর্খ কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিক্ষিত মার্জিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীদেরও পতিনিন্দায় অংশ নিতে দেখা যায়। ফলে তাদের পতিনিন্দায়ও যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা—

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত ॥[১০]

পতিনিন্দায় মুখর এ নারীর মধ্যে আমরা কাব্যরসের সন্ধান পাই, যা অন্য কোনো কবির 'পতিনিন্দা' অংশে দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য কবির ন্যায় ভারতচন্দ্রের নারীরাও কালা, অন্ধ ও বৃদ্ধ স্বামী নিয়ে বিড়ম্বনার চিত্র তুলে ধরেছে। বৃদ্ধ স্বামী তাদের যুবতী স্ত্রীদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়, ফলে তাদের সংসার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়—

ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া ॥
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত ॥[১১]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সুন্দরের রূপ দর্শন করে সধবা নারীকেও স্বামী সংসার ত্যাগ করার মতো দুঃসাহস চিন্তা করতে দেখা যায়। এ থেকেও ভারতচন্দ্রের প্রাগ্রসর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, ষোড়শ শতকের মুকুন্দরামও এতটা দুঃসাহস দেখাতে পারেন নি। যুগের পার্থক্যই এর অন্যতম কারণ—

আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥[১২]

ভারতচন্দ্রের 'পতিনিন্দা' অংশে কবির আত্মসমালোচনাও লক্ষণীয়। কবিপত্নী অভাব-অনটনে দিনযাপন করে অথচ কবি সেদিকে লক্ষ না করে কেবল সরস কথা দিয়ে মন ভুলাতে চান —

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥[১৩]

---

[১০] *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা) (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৭), পৃ. ২৮৭।

[১১] তদেব, পৃ. ২৮৭।

[১২] *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, পৃ. ১৯৭।

[১৩] তদেব, পৃ. ২৯২।

মধ্যযুগে পুরুষ রচিত বাংলা সাহিত্যে বঞ্চিতা নারীর ক্ষোভ ও বিদ্রোহ-বেদনা তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। কারণ "কবিরা মধ্যযুগীয় পুরুষ হলেও জীবনের অন্তর্গত যন্ত্রণাময় সত্যকে তাঁদের পক্ষে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। হয়তো সেসব অনুভব তাঁদের ব্যক্তিজীবনের অব্যবহিত ছিল না। কিন্তু সমাজবাস্তবের যে সংবেদনশীলতা একজনকে শিল্পী করে তোলে, সেই সংবেদনের র‍্যাডারে সেদিনের নারীর যন্ত্রণার্ত অনুভব সৃষ্টির অনিবার্য নিয়মেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যেই আমরা পেয়ে যাই ব্যক্তিনারীর বিদ্রোহিনী সত্তাকে। কিন্তু সে বিদ্রোহ কখনোই সংগঠিত আকার নেয়নি। তাকে ইতিহাসের অনুগত করে দেখলে একক নারী-ব্যক্তিত্বের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই লক্ষ করা যায়।"[১৪]

'পতিনিন্দা' অংশে লক্ষ করা যায় নারীরা পরস্পরের কাছে স্বামী-দুর্ভাগ্যের চিত্র তুলে ধরে কিছুটা দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছে মাত্র। এছাড়া অন্য কোথাও এভাবে পতিনিন্দার সুযোগ ছিল না—

দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥[১৫]

মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দার বিরোধিতা

মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা একটি অপরিহার্য কাব্যরীতিতে পরিণত হয়েছিল। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর জোরালো বিরোধিতাও কোথাও কোথাও দেখা যায়। এক্ষেত্রে শুধু পুরুষরা নয় নারীরাও এর বিরোধিতা করেছে। দেখা যায়, যখন কোনো নারী পতিনিন্দায় সরব হয়ে ওঠে তখন অন্য কোনো নারী তাকে ইহকাল-পরকালের কথা, সেই সাথে পতির নিন্দা করলে পত্নীর অধোগতি এসব কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে বিবাহ-আসরে জামাতা-দর্শনে নারীগণ পতিনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে এবং এক নারী তার স্বামীকে অবোধ বলায় অন্য এক নারী তৎক্ষণাৎ তাদের ধিক্কার জানায়—

সত্যবতী বোলে তোরা বড় দুষ্টমতি।
ইহলোকে পরলোকে পতি ত্রাণ-গতি ॥
তারে অবোধিয়া বলা তোরে না যুয়ায়ে।
নিন্দিলে পতিরে পত্নী অধোগতি পায়ে ॥[১৬]

মূলত পুরুষতান্ত্রিক ভাবনারই প্রতিফলন এ নারীর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজে প্রতিফলিত কবির নিজস্ব ভাবনায় নারীর অবস্থান এখানে পরোক্ষভাবে রূপায়িত হতে দেখি। *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* কাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশেও এক নারী পতিনিন্দার বিরোধিতা করে নিজ পতিকে সর্বস্ব জ্ঞান করার পরামর্শ দিয়েছে —

---

[১৪] সত্যবতী গিরি, "অবরোধবাসিনীর আকাশ-অন্বেষণঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য", উজ্জ্বলকুমার মজুমদার(সম্পা.), *বাঙালির সাংস্কৃতিক দিগন্ত* (কলকাতাঃ সোনার তরী, ২০০১), পৃ. ৬৮।

[১৫] *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, পৃ. ২৮৭।

[১৬] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) (কলকাতাঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫), পৃ. ১৪০।

নিজ পতি সোনা মহা গুরুজনা
নিন্দ দেখি পরবেটা।
এত নহে ভাল জল লয়ে চল
লোকে শুনি করে ঠাটা ॥[১৭]

এছাড়া *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* কাব্যে কবি নিজেও পতিনিন্দায় মুখর নারীদের কুলটা হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি —

দেখি রূপছটা যতেক কুলটা
পরস্পর কহে মর্ম্ম।
চিত্তে অধোগতি নিন্দা করে পতি
ত্যজে লোকভয় ধর্ম্ম ॥[১৮]

উপসংহার

মঙ্গলকাব্যে 'পতিনিন্দা' বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। বরং সুদীর্ঘ কাল থেকে নারীদের অবদমিত ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। যদিও এটি বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তবুও তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পতিনিন্দায় অংশ নেওয়া নারীরা তাদের সামাজিক ও সাংসারিক জীবনে বঞ্চনা ও হতাশার কথা তুলে ধরেছে। সমাজ ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাপক ও গভীর। মূলত সমাজ-বাস্তবতার ভিন্নতর অভিব্যক্তি সাহিত্যে রূপায়িত হয়। "সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী-সাহিত্যিকরা ব্যক্তিক আন্তর-গরজে সাহিত্য রচনা করেন। একটি বিশেষ সমাজ-কাঠামোর আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয় বিশেষ কোন শিল্পীর মানসলোক। সমাজ-সংগঠনের সুসম্পর্ক প্রভাবে বিকশিত হয় সাহিত্যিকের জীবনবোধ। সুতরাং তাঁর রচনায় ঐ বিশেষ সমাজের ছায়াপাত ঘটবে, এটা একান্তই স্বাভাবিক।"[১৯] মধ্যযুগের বাঙালি নারীদের অবমাননাকর সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কর্তৃক রচিত 'পতিনিন্দা' অংশে পাওয়া যায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে নারীরা তাদের অব্যক্ত বেদনাকে তুলে ধরলেও তার বাস্তবতা ও নির্মমতা আমাদের খুব সহজে স্পর্শ করে এবং সংবেদনশীল করে তোলে। জীবনবাস্তবতার স্বাভাবিকতায়, স্বাভাবিক চাহিদার অনিবার্যতায় মঙ্গলকাব্যের কবিবৃন্দ তাঁদের কাব্যে 'পতিনিন্দা' অংশকে সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জন্য কোনো কোনো কবির মধ্যে পতিনিন্দায় অংশ নেওয়া নারীদের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাবও লক্ষযোগ্য। 'পতিনিন্দা' অংশটি মধ্যযুগের বাঙালি নারীদের অন্তঃপুরের মনোগভীরের চিত্রকে উন্মোচিত করেছে। নারীরা তৎকালীন সমাজে কতটা অবদমিত, অত্যাচারিত ও বৈষম্যের শিকার হতো তার একটি চালচিত্র আমরা মঙ্গলকাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশে পাই। ফলে কাব্যরীতি হিসেবেই নয় বরং তৎকালীন সমাজচিত্রের দর্পণ হিসেবে মঙ্গলকাব্যের 'পতিনিন্দা' অংশটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

---

[১৭] ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, পৃ. ২৬০।

[১৮] ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, পৃ. ২৫৮।

[১৯] শিপ্রা সরকার, *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' : বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃরূপ

মো. আতাউর রহমান*

Abstract : 'Mother', the very name, is the purest of all which is closely related with 'children'. The synonym of this word in Bengali is `janani'. The janani of Manik Bandyopaddhyay in Bengali literature is an important novel. The reflection of an eternal feature of a Bangalee lady as being a mother is reflected in this novel. In this essay the discussion of the same is mentioned here.

ক.

জননী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামা—জননী। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি; বাঙালি নারী। পার্ল এস বাকের *দি মাদার* উপন্যাসের মা জমিদারের নায়েবের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হলে জা'য়ের সহযোগিতায় যতটা সহজে অবাঞ্ছিত সন্তান থেকে মুক্তি লাভ করে বাঙালি সমাজের নারীরা মানিকের সময়ে অতটা পারেন না। তাদের বিশ্বাস অন্যত্র। ফলত শওকত ওসমানের জননী এমনটি পারেন না, এমনকি এ জননী গর্ভজাত সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তবু সন্তান হত্যা নয়। মানিকের জননী এর কোনোটিই নন। ভিন্ন এক আদর্শ নারীসত্তা যেখানে ভিড় করেছে নারীত্ব; মাতৃত্ব। এক অসহায় সংগ্রামী বাঙালি নারীর মাতৃত্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে মানিকের *জননীতে*। জননী 'সর্বদায়িনী, সব কিছু সহ্য করেই মা তার সন্তানকে লালন করেন, প্রতিপালন করেন, বেড়ে উঠতে ছায়া দিয়ে রাখেন।'[১]

নারীমাত্রেই মাতৃত্বের স্বাদকামী। মা ডাকের মধুর সুধাকাঙ্ক্ষা নারীর সহজাত। বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাই মায়ের আসন অনেক উর্ধ্বে। দুশো আশিদিন গর্ভধারণকালে আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি পরিস্থিতিতে নারী যখন মা হন তখন থেকেই কষ্টার্জিত এ সন্তানের প্রতি তার দরদ-মায়ামমতার বন্ধন প্রগাঢ় হয়। মা স্বীয় সত্তাকে দেখতে চান সন্তানের ভেতর দিয়ে। অন্য অর্থে বাঙালি সমাজে মাতৃত্বও এক ধরনের গৌরব। সন্তানধারণের মাধ্যমেই নারী চায় তার বাঁঝারূপে কলঙ্ক মোচন করতে ; নিজেকে গরবিত ভাবতে। শ্যামা এমন নারী চরিত্রের ব্যতিক্রম নয় মোটেও। দাম্পত্যের সাত বছর অতিবাহিত হবার পর সে প্রথম সন্তানের মুখ দেখে। স্বপ্ন দেখে সে দাম্পত্যের শুরু থেকেই। ভয় জন্মায় মা হতে পারেবে তো ? 'তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয়

---

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] হাসান আজিজুল হক, "মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাখ্যা চলে না", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, (ঢাকা : ৯মে ২০১০), পৃ. ১৮।

করিয়াছে।'[২] সাত বছরের মাথায় বন্ধ্যাত্ব ঘোঁচে। ছেলে সন্তান জন্ম নেয় শ্যামার। যেন 'জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।'[৩] শ্যামার বিশ্বাস সত্যে রূপান্তরিত হয়। যেন মৃত্যু পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেও শ্যামাকে জননী হতেই হয়। মাতৃরূপেই তাঁর সংস্থান । সন্তান ভূমিষ্ঠকালে বারবার মূর্ছা গেলেও আগত সন্তান ভাবনায় কষ্টের মধ্যেও মহামুক্তির স্বাদ পায় শ্যামা।

শেষ মূর্ছা ভাঙিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে। সে বাতাসের মতো হালকা। শীতকালের পুঞ্জীভূত কুয়াশার মতো সে যেন আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কর অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময়। একবার তাহার মনে হইল, সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া ফাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা ক্লান্তিকর যাতনা তাহার অশরীরী আত্মারই দুর্ভোগ।[৪]

অতপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে কি এক আবেগে শ্যামার প্রাণ টইটুম্বুর হয়। যেন এতদিনকার সমস্ত অপূর্ণতার বাঁধ ভাঙে। পৃথিবীতে একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অপত্য স্নেহের ভুবন নির্মিত হয়। কি এক মায়া কি এক মমতা বেষ্টন করে শ্যামাকে।

গভীর ঔৎসুক্যে সন্তর্পণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল।[৫]

স্নেহের যেন বাড়াবড়ি হয়েছে।। এ সন্তানকে শ্যামা বারো দিনের বেশি বাঁচাতে পারেনি। সন্তানহারা অসহায় জননী শ্যামা নিজেকেই সন্তানের মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাবে। ছেলের লালিম পায়ে অতি আদরে চুম্বন, একটু অমঙ্গলজনক কোনো পরিস্থিতি হলেই প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়, স্নানের পানি অল্পগরমেই ছেলের ত্বক পুড়বে এমন আশঙ্কা একজন নবজননীর হৃদয়কে তটস্থ করে রাখে। শ্যামা ভাবে সন্তানকে ঘিরে তার সবকিছু যেন অতি হয়েছে। ঈশ্বর তাই মায়া ছিন্ন করেছে। দুবছর ব্যবধানে আবার কোলজুড়ে ছেলে সন্তান আসে শ্যামার। বাড়াবাড়ি করে প্রথম সন্তান হারিয়েছে শ্যামা। কিন্তু মাতৃত্বের জোয়ার কি জোর করে ঠেকানো যায় ? উচ্ছ্বসিত আবেগ একজন জননী কি খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? 'খোকার লালিম পা দুটি হইতে কেশ বিরল মাথাটি পর্যন্ত শ্যামা অসংখ্য চুম্বন করে, দীর্ঘনিশ্বাসে খোকার দেহের আঘ্রাণ লয়। তারপর সে অনুতাপ করে। বাড়াবাড়ি করিয়া একবার তাহার সর্বনাশ হইয়াছে, তবু কি শিক্ষা হইল না?'[৬] তবে এবার সে অনেক সংযত, যথার্থ যত্নশীল ; অধিক স্বপ্নকাতর নয়। শ্যামা এখন 'স্মরণ করে যে সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া জননীর অসংযত উল্লাস অমঙ্গলজনক।'[৭] *জননী*তে শ্যামার ননদ

---

[২] 'জননী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত (ঢাকা : অবসর, ১৯৯৫), পৃ. ১।
[৩] তদেব, পৃ. ১।
[৪] তদেব, পৃ. ৪।
[৫] তদেব, পৃ. ৫।
[৬] তদেব, পৃ. ১৩।
[৭] তদেব, পৃ. ১৩।

মন্দা, মন্দার বর রাখাল। শ্যামার দ্বিতীয় সন্তানটি জন্মানোর পর কেন যেন রাখালের ব্যবহারে পূর্বের থেকে অনান্তরিকতার ছাপ খুঁজে পায় শ্যামা। স্ত্রী মন্দা স্মরণ করে দেবার পর রাখাল শ্যামার ছেলেকে গাল টিপে দিলে অনাদর আর উপহাসের ছবি দেখতে পায় শ্যামা। অপমানিত বোধ করে। শ্যামা অসন্তুষ্ট হয় মাতৃত্বের জায়গা থেকে। 'জীবনযুদ্ধে সন্তানের প্রত্যেকটি পরাজয়ে মার মনে যে ক্ষুব্ধ বেদনার সঞ্চার হয়, এ অসন্তোষ তাহারই অনুরূপ।'[৮]

জননী উপন্যাসে জননী শ্যামার পাশাপাশি মন্দা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সত্যভামা, সুপ্রভা, বকুল সবারই খণ্ডিত মাতৃরূপ জননী শ্যামাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। জননী মন্দা সন্তানকে কাছে টানার মোহেই শ্যামার বাড়িতে সন্তানসহ এসে দীর্ঘদিন থাকে শাশুড়ির ডাক উপেক্ষা করে। ঠাকুরমার প্রতি বড্ড বেশি ঝুঁকে পড়া সন্তানদের একান্ত করে ভালোবাসার জন্য এমনকি মন্দাই যে তাদের মা তা পৃথক করে বোঝাবার জন্য চুরি করে তিনটি সন্তানকেই এনেছে মন্দা শ্যামার বাড়িতে। সন্তানের যত্নে সেও যথার্থ বাঙালি নারীর মাতৃরূপ। উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি বিষ্ণুপ্রিয়ার কন্যা সন্তান মহিম তালুকদারের পাপের ছাপ নিয়ে জন্মেছে। তবুও বিষ্ণুপ্রিয়া মা। নিজের সাজসজ্জা হতে দূরে ; মাতৃত্বের বসনে-ভূষণে। বিষ্ণুপ্রিয়া শ্যামার সন্তানের জন্য জামা পাঠায়। শ্যামার কাছাকাছি আসে। সন্তানের খোঁজখবর রাখে। সন্তানকে ঘিরে সমান অনুভূতি তারও। অন্যদিকে একেবারেই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সত্যভামা যে কিনা শ্যামার বাড়ির ঠিকা ঝি, সেও মা এবং সন্তানের জন্যই সে তিন বাড়িতে বিরতিহীন কাজ করে; নিজের জন্য কোনো সময় নেই তার। মানিক কৌশলে নানাশ্রেণীর জননীর সংগ্রামী ছবি মায়াময় করে তুলেছেন যেখানে প্রতিটি নারীরই জীবনাবর্তন প্রতিফলিত সন্তানকে ঘিরেই। সুপ্রভা-বকুলও এর ব্যতিক্রম নয়।

জননী শ্যামা একই সঙ্গে স্ত্রীও। তার স্বামী মাথায় ছিটওয়ালা। কখনো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফেরে, এমনকি একসময় প্রেসমালিকের টাকা চুরি করে মেয়ে বকুলকেসহ পালায় পর্যন্ত। জেলেও যায় দু'বছরের জন্য। এমন স্বামীর সঙ্গে শ্যামাকে সোহাগের চেয়ে সংগ্রাম করতে হয় বেশি। সংসারের ভালোমন্দ, সন্তানদের দেখাশোনা, দায়দায়িত্ব সবই শ্যামার ওপর বর্তায়। শ্যামা ভাবে, নারী বুঝি জননী হলে স্ত্রীসত্তার ঘাটতি আসে। তার এ শঙ্কা প্রগাঢ় হয় যখন সে জানতে পারে বিনা কারণেই রাখাল দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, ঘরে এনেছে সুপ্রভাকে। শ্যামা তখন জননী হয়ে আর এক জননী মন্দাকে নিয়ে চিন্তিত হয়। 'মন্দা জননী বলিয়াই হয়তো রাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে।... স্ত্রী বর্তমানে রাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল, হয়তো তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে?'[৯]

কীরূপে সন্তানের বেড়ে ওঠা। শিশুমনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। সেবা আর জিজ্ঞাসার উত্তরে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দেয় শ্যামা। শিশু বিধানকে খেলনা মোটর চালানো, কুলপি বরফের ঘুষ, নানা উসিলায় সন্তনকে বড় করে শ্যামা। এ যেন আমাদের খুব কাছ থেকে দেখা এক জননী। 'জননীতে এমন একটি সংসারের আলেখ্য পাই যার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠকমনে কোন সংশয় দেখা দেয় না। অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালি সংসারের ছবি, অতি পরিচয়ের ফলেই যাকে আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখি না।'[১০] জননীই আমাদের সে দেখার চোখ খুলে দেয়। দেখতে শিখি আলো আর অন্ধআরের সমন্বয়, ভালো-মন্দের যোগসাযশ—এ দ্বিবিধরূপ। শ্যামার

---

[৮] তদেব, পৃ. ১৪।

[৯] তদেব, পৃ. ১৫।

[১০] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮৮।

বিপরীতে বিষ্ণুপ্রিয়া, শোষক-শোষিত, মাতৃত্ব-হিংসা ইত্যাদি। মানবসম্পর্কের বহুবিধ দিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের চিনিয়ে দেন। 'বস্তুত, মানবসম্পর্ক নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনদেন আমাদের সঙ্গে।'[১১]

শ্যামাকে কি তবে আমরা স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ দেখবো? তা কি করে হয়? বাঙালি সমাজের একজন নারী তা কি করে পারে ? চতুর্থ সন্তান জন্মানোর আগে উপরি পাওনার টাকায় শীতল শ্যামার জন্য একটা রঙিন শাড়ি কিনে আনলে শ্যামা লজ্জাবোধ করে এ বয়সে এমন শাড়ি পরতে। তারপরও রাতের বেলা স্বামী শীতলকে ছাদে যেতে বলে নিজে নতুন শাড়ি পরে শীতলের কাছে যায় শ্যামা। এই বয়সেও তারা আনাড়ির মতো আদর করে। তার কিছুদিন পরেই শ্যামা অন্তঃসত্ত্বার খবর জানায়। ' শ্যামা হাসে। মধুর পরিপূর্ণ হাসি, দেখিয়া কে বলিবে, শীতলের মতো অপদার্থ মানুষ তাহার মুখে এ হাসি যোগাইয়াছে।'[১২] এমনকি শীতলের শেষ পরিণতির সময়েও ছিটওয়ালা বরকে সে ঘৃণা করে নি। নির্ভরতার একমাত্র অবলম্বনরূপেই সে স্বামীকে ভাবে। অনেক অপ্রাপ্তির মধ্য দিয়েও বাঙালি নারী স্বামীকে দেবতাজ্ঞান করে বিশেষ করে নিম্নবিত্ত বাঙালি নারী। শ্যামাকে পতিপ্রাণা না বলে উপায় কি?

লজ্জা নারীর অলঙ্কার। খুব সহজেই সে লজ্জা বিকিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত নয় নারী। দোতলার ঘরের কাজ আরম্ভ হলে মিস্ত্রির মজুরি দেবারও পয়সা থাকে না শ্যামার। কি করবে সে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সমস্যার কথা খুলে বলে কিন্তু লজ্জায় টাকা চাইতে পারে না। একসময় বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া হাতের মুঠোয় কি যেন এনে আঁচলে বেঁধে দিলে' কি লজ্জা তখন এ দুটি জননীর : চোখ তুলিয়া কেহ আর কারো মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই।'[১৩] জীবনসংগ্রামে পিছু হটেনি শ্যামা। সমস্ত প্রতিকুলতার মোকাবেলা করে শ্যামা জননীর মাহাত্ম্য প্রমাণ করেছে। কেননা কতটা বৈরিতা সইবে একজন জননী। সে যেন সর্বংসহা ধরণীর মতো জননী। উপন্যাসের আদ্যোপান্ত তার সহনশীলতা আর সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট। যখন বিষ্ণুপ্রিয়াও মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন সে বিধানকে বড়লোকের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কাশীপুরের সাধারণ স্কুলটিতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, বিধান হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত। ধোপার সঙ্গে শ্যামা কোনো সম্পর্ক রাখিত না, বাড়িতে সিদ্ধ করিয়া কাপড় জামা সাফ করিত–কাপড়-জামা দুই-ই সে কিনিত কমদামি, মোটা, টিকিত অনেকদিন। খোকার জন্য দুধ কিনিত এক পোয়া, দু বছর বয়সের আগেই খোকা দিব্যি ভাত খাইতে শিখিয়াছিল, পেট ভরিয়া খাইয়া টিঙটিঙে পেটটি দুলাইয়া দুলাইয়া শ্যামার পিছু পিছু সে হাঁটিয়া বেড়াইতে শ্যামা তাহাকে স্তন দিত সেই অপরাহ্নে, সারাদিন বুকে যে দুধটুকু জমিত বিকালে তাহাতেই খোকার পেট ভরিয়া যাইত। কত হিসাব ছিল শ্যামার, ব্যাপক ও বিস্ময়কর ! ভাতের ফেনটুকু রাখিলে যে ভাতের পুষ্টি বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সে খেয়াল রাখিত ! তাহার এই আশ্চর্য হিসাবের জন্য ছোট খোকার পেটটা একটু বড় হওয়া ছাড়া ছেলেমেয়ের কারো শরীর তেমন খারাপ হয় নাই ! রোগা হইয়াছে শুধু শ্যামা। শেষের দিকে শ্যামার যে মখমলের মতো মসৃণ উজ্জ্বল চামড়াটি দেখা দিয়ছিল তাহা মলিন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক বছওে কারো বয়স এক বছরের বেশি বাড়ে না, শ্যামারও বাড়ে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কে তাহা ভাবিতে পারে। গত যে বসন্ত ব্যর্থ গিয়াছে তার আগেরটি উতলা করিয়াছিল কেন শ্যামাকে ? বনগাঁয়ে এই যে

---

[১১] হায়াৎ মামুদ, (সম্প) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, (ঢাকা : অবসর, ১৯৯৫), পৃ. ভূমিকা।

[১২] 'জননী', পৃ. ৩১।

[১৩] তদেব, পৃ. ৪৪।

নিষ্প্রভজ্যোতি শ্রান্ত নারীটি আসিয়াছে, শহরতলীর সেই বাড়িটির দোতলার সমাপ্তপ্রায় নতুন ঘরটির ছায়ায় দাঁড়াইয়া বসন্তেও বাতাসে ধানকলের ছাই উড়িতে দেখিয়া জেলের কয়েদি স্বামীর জন্য এরই যৌবন কি ক্ষোভ করিয়াছিল ?'[১৪]

শ্যামার এমন জননীরূপের আখ্যান বাঙালি নিম্নবিত্ত পরিবরে অহরহই। শ্যামা কি তবে দেবীরূপী। না নিশ্চয়। মানবী এবং জননীরূপ তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কর্মনিপুণা সৎ শ্যামাই তো চুরিও করে স্বীয় স্বার্থে নয়, সন্তানের জন্য। ভালো ছাত্র ছেলে বিধানকে ঘিরে শ্যামার অনেক স্বপ্ন। ওর জন্য ভালো খাবার প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে তা জুটবে ? শ্যামা চাহিয়া চিন্তিয়া চুরি করিয়া যতটা পারে ভালো জিনিস বিধানকে খাওয়ায়, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পায় না।...তবু শ্যামা পরিশ্রমী সন্তানের জন্য খাদ্য চুরি করে। দুধ জাল দিতে গিয়া সুযোগ পাইলেই দুধে সরে খানিকটা লুকাইয়া ফেলে, দুধ গরম করিলে সর তো যায় গলিয়া, টের পাইবে কে ? রাঁধিতে রাঁধিতে দুখানা মাছভাজা শ্যামা শালপাতায় জড়াইয়া কাপড়ের আড়ালে গোপন করে, ঘরে গিয়া কখন সে তাহা লুকাইয়া আসে কে জানিবে ? এমনি সব ছোট ছোট চুরি শ্যামা করে, গোপনে চুরি করা খাবার বিধানকে খাওয়ায়।'[১৫]

সন্তানকে বিন্দু করেই জননীর বৃত্তভ্রমণ। তার যে জীবনরেখা গতিপথ সৃষ্টি করে তার মূলে রয় সন্তান। আত্মসুখকে তুচ্ছ করে সন্তানের তরে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলেই নিজেকে সুখী মনে করে। নিজেকে অর্থহীন জ্ঞান করে কি এক অন্ধ মায়ায় দুঃখকেও সুখ ভেবে চলে। প্রকৃত সুখ মেলে না। মনে প্রশ্নের উদয় হয়—'তাহার একটা প্রাণ নিংড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে–কেন ? কি লাভ তাহার ?'[১৬] উত্তর ওই একটাই—সে যে জননী। উৎসর্গেই তার জননীরূপের পূর্ণতা। 'বাঙালী সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের অল্প শিক্ষিতা জননীর কাছে তার নিজের সংসারটিই বিশ্বের শেষ সীমা।'[১৭] সে স্বপ্ন বোনে, কবে, কতদিন পরে লেখাপড়া শেষে বিধান হাল ধরবে সবকিছুর। সেদিন যেন সন্তানের কাছে জননীই সন্তানরূপে অধিষ্ঠিত হবে। অবশেষে বিধান চাকুরি নিয়ে এলে শ্যামার মনে হয় 'পৃথিবীতে শরৎ আসিয়াছে হাসির মতো।'[১৮] জননী শ্যামা বিধানকে নিয়ে নিমজ্জিত পরিস্থিতির উত্তরণে নিবিষ্ট হয়। ধাপে ধাপে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল করে তোলে। ভেতরের মাতৃরূপের প্রকাশ ঘটায় শুধু আত্মঘিরে নয়; পরার্থেও। অপরের সন্তানের মধ্যেও সে নিজ সন্তানের মতো দরদ অনুভব করে। মন্দার ছেলে কালুর মৃত্যু ঘটলে কালু ও কালুর বৌ ভাবনায় স্বীয় পুত্রশোকের মতো শ্যামা ভেঙে পড়ে। অস্বাভাবিক ব্যথা অনুভব করে। এ যেন সর্বজনীন মাতৃরূপ। যন্ত্রণাজর্জর জীবনে শ্যামার একান্ত চাওয়া 'ওষুধের মতো পথ্যের মতো একটু স্নেহ দাও শ্যামাকে। একটু নিঃস্বার্থ অকারণ মমতা।'[১৯] তার এ চাওয়াও অকারণ, চাওয়ার জন্য চাওয়া। জননীসত্তার এ চাওয়ার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে সন্তানের মঙ্গলসূত্র। শ্যামা নিজেও জানে—জগতে এই পুরস্কার মা পায়। বকুলকে বড় করিয়া দান করিয়াছে পরের বাড়ি, তার চোখের সামনে বিধানের নিজের স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে, যেখানে তার ঠাঁই নাই এতটুকু। মণির

---

[১৪] তদেব, পৃ. ৫৯-৬০।

[১৫] তদেব, পৃ. ৬৮।

[১৬] তদেব, পৃ. ৬০।

[১৭] গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, "শ্যামা, সর্বজয়া ও আমার মা", *মানিক বিচিত্রা* , বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত (কলিকাতা : সাহিত্যম, ১৯৭১), পৃ. ১৮৫।

[১৮] 'জননী', পৃ. ৭৭।

[১৯] তদেব, পৃ. ৮১।

বেলা ফণীর বেলাও হইবে এমনি। আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে এই অন্ধ শিশুটি, যার নিমীলিত আঁখি দুটির জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন।[২০]

এমন পুরস্কার জননীরা শুধু পায়, তা নয়—চায়ও। মেয়ে বড় হলেই সৎপাত্রে দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ছেলে বড় হলে লক্ষ্মীবউয়ের সঙ্গে জোড়া বেঁধে দেবার সুপ্ত বাসনা জননীহৃদয়ে সবসময় বিরাজমান। অন্ধশিশুটি এ সমাজে অনেকটাই অচল। খুব সহজেই পর করা সম্ভব নয়। বিধায়, জননী ভাবে এ-ই সন্তানটিই থাকবে একান্ত কাছে আজীবন কিন্তু সে থাকা সুখের নয়, অনেক বেশি কষ্টের। জননী সে কষ্টের অনলে পুড়বে নিয়তই। এরূপে মানিকের জননী তার জনম পার করে। বিধানকে বিয়ে দেয় সুবর্ণর সঙ্গে। কিন্তু সুবর্ণর রূপ যৌবনকে হিংসেও করে শ্যামা। ঈর্ষান্বিত রূপ-যৌবন নারীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বটে। রূপের অহঙ্কারে যেমনটি জননীরূপ বাধাগ্রস্ত হতে পারে তেমনটি থাকতে পারে সামর্থ্যের চেয়েও বেশি চাহিদা। যতক্ষণ পর্যন্ত না জননীরূপের প্রকাশ ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত একধরনের নেতিবাচক ধারণা লালন করে শ্যামা বাঙালি সমাজের আবহমানকালের শাশুড়িচরিত্রের ভূমিকায়। এ পুষিয়ে রাখা বিদ্বেষ, শত্রুতা, নেতিধারণার ইতি কোথায় ? সুবর্ণর জননীরূপে নিশ্চয়।

এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।[২১]

যে ঘরে শ্যামা জননী সেই ঘরেই কাঙ্ক্ষিত জননী প্রাপ্তিতে শ্যামা ফিরে পায় জীবন। সুবর্ণর প্রতি তার সমস্ত হিংসা-দ্বেষ পরাভূত হয়। সন্তানের সন্তানপ্রাপ্তিতে জননীসত্তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে শ্যামা। বাঙালি সমাজের মাতৃত্বের আসল রূপ এমনই। স্বজীবনকে তুচ্ছ করে সন্তানের পরিচর্যা আর সন্তানকে ঘিরে কিছু সুখস্বপনই বাঙালি নারীর ভেতরের বাস্তবতা। 'বাঙালী ঘরের সেই চিরন্তন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি হলো শ্যামা। এই মাতৃত্ব আলোর মতো সর্বত্রগামিনী।'[২২]

আবহমানকালের বাঙালি সমাজের চেনামুখ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী*। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো জননীও যে রক্তমাংসের মানুষ—ভালো ও মন্দ মিলিয়ে, তার নিপুণ উপস্থাপন। অসাধারণ, দেবী বা অপার্থিব চরিত্র করে নয়, বরং হিংসা-ঈর্ষা-লজ্জা-সোহাগ মেশানো আত্মসুখ বঞ্চিত সাধারণ জননী চরিত্রের প্রতিফলন এই *জননী*। মানিকের মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা 'মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন ? '[২৩] *জননী*তে এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে। তাঁর *জননী* ভালোমন্দ মেশানো এক জননীর জীবনআলেখ্য যা বাঙালি সমাজের চিরন্তন মাতৃরূপের পরিচয়বাহী।

---

[২০] তদেব, পৃ. ৮৯।

[২১] তদেব, পৃ. ১০১।

[২২] গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

[২৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা ও বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা*, (ঢাকা : সংহতি প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ১৪

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

শিল্পী এস. এম. সুলতান : বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা•

Abstract: Bangali nationalism is one of the main constituents for the spirit of the war of liberation. A nationalist artist has a special passion towards the traditional art and culture. By mingling tradition and modernism, creating something unique has been an all time desire of the artists of this country. But for an artist accustomed with complex capital centered life and with non-sectarian point of view, the inability to analyze tradition and for the lack of philosophical psychology, this attempt has been fruitless. Exception is the life-style and creation of S.M. Sultan. Along with western modernism, he has enlightened himself with Bangalistic spirit by fusioning Bangali philosophy and its trait of art. This particular issue has been brought into lime-light in this article.

ভূমিকা

পাকিস্তান কায়েম আন্দোলনের নেতৃত্ব তৎকালীন বাংলা প্রদেশের জনসৌধ এবং তাদের প্রকৃত মানসগঠন, ভূগোল পরিচিতি ও পরিবেশ, ভূমি ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক, ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাসের মূলধারা ও ঐতিহ্য লালিত আচার-আচরণ, জনসৌধের ঐতিহ্যমণ্ডিত সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতিতে উপেক্ষা করে। তারা বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে 'ধর্মীয় বাহ্যিক আচার-আচরণে'র ভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়ে জনসাধারণের 'সরল ধমানুভূতি'কে বিপথে চালনা করে সাফল্য লাভ করেছিল। এ প্রয়াস ছিল মূলত রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি নির্ভর। এই ধর্মভিত্তিক তথা সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির ধারা ও সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) তার প্রয়োগ প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার বিরোধিতায় বাঙালির জাতীয় স্বার্থ চেতনার উন্মেষে যে জাতীয় ঐতিহ্যানুরাগ ক্রিয়াশীল

• ড. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন আর্টস, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা।

ছিল, তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ১৯৪৮-'৭১ সময়কালের মধ্যে বিকশিত ও বিজয়ী এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্য নির্ভর উপকরণ সমূহের যেমন—আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা, সহজ জীবন-সহজ ভাব-সরল ধর্মানুভূতি, বিদ্রোহী-সংগ্রামী-বিপ্লবী চেতনা, সাম্যের ভাবনায় শোষণমুক্ত সমাজ আকাঙ্ক্ষা, ভেদাভেদ জ্ঞানাতিরিক্ত মানুষের মানব-মহিমা তথা মানবতাবাদ ইত্যাদির উপলব্ধি, মূল্যায়ন এবং তার প্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিসত্তা নির্মাণের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উত্থিত হয়েছিল।

মানবতাবোধ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সাম্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বাঙালিত্বের নির্যাস, তাকে স্বরাজ্যে স্বভিত্তিতে প্রখরতর করার উদ্দীপনা মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এ চেতনার প্রতি শিল্পীদের একাত্মতা তাদের স্বদেশ প্রেম ও উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশসূচক। বাংলা সমাজের আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশোন্মুখ জাতি হিসেবে প্রকাশ প্রয়াসে শিল্পীরা অংশী হয়েছিলেন সেই সমাজের দায়িত্বশীল অংশ হয়েই। পাকিস্তানি বৈষম্যমূলক আচরণ, স্বৈরশাসনিক অত্যাচার থেকে নিজস্ব জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই বাঙালি শিল্পীরা সমকাল স্বদেশ ও মানবতাবাদী চেতনার পথে তাদের বাস্তব সঙ্গত তুলি সঞ্চালিত করেছেন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ মুক্তির আশায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে এই স্বদেশপ্রেম তথা মা-মাতৃভূমির চেতনায় স্বাদেশিক সবকিছুর জন্যই শুভ কিছু করতে পারার শৈল্পিক আকুলতা, নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা, লোকায়ত সংস্কৃতির পুনর্বিবেচনা, এমনকি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার বর্ণনা, কোন কিছুরই ধারাবাহিক চর্চার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অগ্রজ এবং প্রথম প্রজন্মের চিত্রীদের থেকে শুরু করে নবপ্রজন্মের শিল্পীদের আঙ্কিত চিত্র সম্ভারে প্রায় প্রতিজনেরই দু-চারটে করে মুক্তিযুদ্ধ-মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বাঙালিত্বের চেতনা ভিত্তিক চিত্রকর্ম আছে। সেগুলোর মধ্যে বিষয় হিসেবে অবশ্যই এসেছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা, হত্যা-নির্যাতন ও ধ্বংসজ্ঞের চালচিত্র, স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও বিজয় এবং সমকাল সচেতনতা ইত্যাদি। তবে বিষয়ের ব্যপকতার প্রেক্ষিতে প্রায়শই তা হয়েছে ঘটনার তাৎক্ষণিক চিহ্নমাত্র অথবা বিশেষ বিশেষ অঙ্গনের অংশ বিশেষ। মনে হয় চিত্রীরা যেন কোন প্রকারে তাদের দায় সেরেছেন। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, যেমন—কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ শিল্পীরা রাজধানী-কেন্দ্রিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত থেকেও বিচূর্ণিত পন্থায় ইউরোপীয় আধুনিক আঙ্গিকের সংশ্লেষণে তাদের চিত্রপটে ক্রমাগত তুলে এনেছেন জন জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-বিদ্রোহ এবং লোককলার নানা বৈশিষ্ট্য। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন ঢাকা এবং প্যারিসে বসে চিত্রপটে রোমন্থন করেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের ঐতিহ্যানুরাগ, করণকৌশল এবং দার্শনিকতা নিয়ে পঁচাত্তর পরবর্তীকালে বাঙালিত্বের ধ্বজাধারী হিসেবে আবির্ভূত হন শিল্পী এস.এম. সুলতান। ঐতিহ্যিক বঙ্গীয় চিন্তা-চেতনা এবং জীবনাচারের লব্ধ জ্ঞান সংযোগে একটি সুলতানীয় চিত্রকর্ম কিভাবে

বাঙালির অভিজ্ঞতা ও বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বেড়ে উঠেছে, তা লক্ষ্য করাই বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়।

যখন পরিপার্শ্ব এবং ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক জ্ঞানে শিল্পীর উপলব্ধির জগৎ-বিশ্বাসের জগৎ গড়ে ওঠে, তখন উর্বরা সেই ক্ষেত্রে রূপকল্প-ভাবকল্প সৃজন প্রক্রিয়া অনেকটাই স্বাভাবিক-অনবরত-স্বয়ংক্রিয়। এ অবস্থায় কল্পিত রূপের বা ভাবের প্রতিফলন প্রক্রিয়াকে 'ছবি আঁকা' কর্ম না বলে- 'ছবি লেখা' কর্ম বলাই উত্তম। এই প্রেক্ষিত বিচারে এস.এম. সুলতান ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি কখনও বুদ্ধি প্রয়োগে খসড়া তৈরি করে পরিকল্পনা মাফিক চিত্র রচনা করেননি। মোহাবিষ্ট শিল্পী বোধের জগৎ-উপলব্ধির জগৎ থেকে আগত আবেগকে নির্ভর করিয়েছেন সরাসরি ক্যানভাসের প্রাঞ্জল প্রবহমান তুলির উপর। যখন ধ্যান তন্ময়তা বিঘ্নিত-বোধি'র দ্বার রুদ্ধ-আবেগও স্তিমিত-তুলি সঞ্চালন বিক্ষিপ্ত কিংবা বন্ধ, তখন ছবিও অসমাপ্ত। সুলতানের পাঠ নেওয়ার যোগ্য এরকম অসমাপ্ত ছবির সংখ্যা প্রচুর।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অন্তঃপ্রাণ শিল্পী এস.এম. সুলতান

শিল্পকলার ইতিহাসে এমন কিছু শিল্পী আছেন যাঁদের দার্শনিক বিশ্বাস, তৎসংলগ্ন জীবনাচার, এবং নান্দনিক আদর্শ পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট। পাশ্চাত্যের যেমন ভ্যান গগ্ (১৮৫৩-'৯০) ও পল গ্যগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩) এ রকম বৈশিষ্ট্যের শিল্পী, আমাদের দেশে অনেকটা সেই রকম শিল্পী ছিলেন এস.এম. সুলতান। তবে পশ্চিমীদের জীবনাচারে যে ধরণের বিস্ফোরণোন্মুখ ভাব ও বিভ্রান্ত তান্ত্রিকের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা দেখি, সুলতান সেখানে বৈষ্ণব ঘেঁষা সহজিয়ার মতো এক আত্মসংযমী সাধক শিল্পী। চিন্তাজগতে উর্ধ্বাচারে সোমরস আর কামরসের যুগল মিলনে সামান্য বিভ্রান্তির সম্ভাবনাটুকুও পরিত্যাগ করে তিনি 'সিদ্ধি'র গুণ গ্রহণ করে যেন সিদ্ধাচার্য হতে চেয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাংলার পার্বতীর বিরহে পাগল পার্থিবাচারী শিব এবং রাধাবিরহী কৃষ্ণের দুঃখ ও প্রেমানুভূতির রস আস্বাদন করতে চান তিনি। তাই যাপিত জীবনে কাল্পনিক রাধা-পার্বতীকে খুঁজে ফিরে বাস্তবে নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেন নিজেকে। প্রাচীন সাধকের মতো নারীকে তিনি আবিষ্কার করেন নিজের মাঝেই, কখনো উর্বরা প্রকৃতি রূপে। নিজের লিকলিকে দৈহিক গড়নে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে অবদমিত করে আত্মকামী এই শিল্পী একদিকে আত্মগতভাবে সৃষ্টি রস আস্বাদন করেন, অপর দিকে অবদমিত তাঁর জাগতিক অনুভব অবচেতনভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে চিত্রের সংসারী সবল পুরুষ আর মাংসল নারীর প্রাণচাঞ্চল্যের মাঝে। শিল্পীর বোধ থেকে নিঃসৃত নারী পুরুষের এ সকল রূপাবয়ব যেন এদিকে বাঙালির অধরা অতীতের স্মৃতি, অন্যদিকে তাঁর ভবিষ্যতের অকাঙ্খার ধন।

মৌল চরিত্রের হওয়ায় সুলতানের চিত্রকর্মকে আরও অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিশ্লেষণ করা চলে। এবং তা করতে গেলে তাঁর জীবনাচরণকে লক্ষ্য করতে হয়। কেননা জীবনাচার ও জীবন দর্শনের সঙ্গে সুলতানের চিত্রকর্ম একান্তভাবে সম্পৃক্ত। তিনি ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী জীবনকে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত করেন। আসলে সুলতান নিজেই এই জীবন্ত শিল্পকর্ম;

প্রাচীন বঙ্গীয় সাধক শিল্পীর ভাবশিষ্য। বিষয়টি আরেকটু বিশদভাবে দেখা যাক। যাযাবর জীবনে (১৯৪৪-'৫৩) বৈশ্বিক শিল্প-ভাবনা ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এ সাধক শিল্পী ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট না থেকে পাকিস্তান আমল থেকেই ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে বাজিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শৈশবের গ্রাম্য জীবন, স্থাপত্য-গ্রাত্র অলঙ্করণ শিল্পী-পিতার সাহচর্য, বনেদি হিন্দু পরিবারগুলির পূর্বাপর সহমর্মিতার স্মৃতি তখন ছিল তাঁর পাথেয়। ১৯৫৩-'৭৫ সালের মধ্যে এদেশে সুলতানের কোনো প্রদর্শনী নেই, তেমন কোনো ছবিও দেখা যায় না। ১৯৭৫ সালে তাঁর চিত্রের হঠাৎ উৎকর্ষ লক্ষ্য করে অনুমান করা যায়, এই দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর বোহেমিয়ান জীবনে প্রাপ্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নান্দনিক অঞ্জনে অবলিপ্ত দৃষ্টিতে বাংলার বিহার-মন্দির স্থাপনাগুলিকে এবং তৎসংলগ্ন ও সম্বন্ধীয় শিল্পকর্মকে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আশ্রয় সন্ধানের অছিলায় যশোহরের গ্রামে-গঞ্জে ভাঙা মন্দিরের দ্বারে দ্বারে জীর্ণ অট্টালিকার খিলানে, অলিন্দে, গর্ভগৃহে ঘুরে তিনি যে খুঁজে ফিরেছেন শিল্পসুষমা, তা আমরা শরীফ আশরাফ উজ্জমান লিখিত শিল্পীর জীবনীগ্রন্থ *কিংবদন্তীর ক্যানভাসে এস,এম সুলতান* থেকে জানতে পারি।[১]

তিনি বাংলার ঐতিহ্যগত শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ভাব দর্শনের স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। এবং সেটা শুধু তাত্ত্বিক কিংবা তথ্যগতভাবে নয়, ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন আচার-আচরণের ভেতর দিয়েও। বিশ্ব পরিভ্রমণ কালে প্রকৃত আধুনিকতা সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে স্ব-ভূমির নাগরিক সভ্যতার দৈন্য ও কৃত্রিমতাকে শিল্পী গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু সে সবকে একেবারে অচ্ছুৎ জ্ঞান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই প্যান্ট-সার্ট-পালিশ করা জুতো ইত্যাদি সব আধুনিকতার লেবাসের উপর সুফি মাধকের মতো কিংবা বাউল রবীন্দ্রনাথের মতো কালো এবং সাদা আলখেল্লা চাপিয়ে দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম চেতনার স্তরের হিসেব দেন এই অকৃতদার শিল্পী। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো সকল ধর্মের সকল আচারই তিনি চর্চা করেছেন। তিনি ছিলেন শ্মশানচারী শিব, খ্রিস্টান পাদ্রি, কৃষ্ণের ন্যায় বংশীধারী, 'সখীভাবে' একই দেহে রাধাকৃষ্ণের ('প্রকৃতি'-'পুরুষের') অনুভবে উন্মাতাল এক গেরুয়াধারী কীর্তনিয়া। ছিলেন জীবপ্রেমী, একনিষ্ঠ 'খাকসার' আন্দোলন কর্মী, ছিলেন কামরুল হাসানের মতো ব্রতচারী এবং সবার শেষে উপলব্ধি করেছেন মধ্যযুগের বাঙালির সেই সহজ স্বীকৃতি 'সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই', আর 'যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'র মতো পরম ইহজাগতির তত্ত্ব।[২] তাই তাঁর চিত্রের সমগ্র প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আর্য পুরাণে বর্ণিত পূর্বাঞ্চলের 'অসুর' প্রকৃতির কর্মমুখর চাষাভুষো মানুষেরা। ভারতীয় প্রাচীন লেখ-সাহিত্যে এই প্রকান্ডাকার অসুরদের সুঠাম দৈহিক গড়নের আভাস মিললেও শিল্পশাস্ত্রে অনুরূপ নির্মাণের অনুমতি নেই। প্রশ্নজাগে, সুলতান কি তবে শিল্পশাস্ত্র-অনুসৃত (অনুগত নয়) বঙ্গীয় শিল্পকর্ম দেখে সেই অভাবটাই পূরণ করতে চান বর্তমানের

---

[১] শরীফ আশরাফুজ্জামান, *কিংবদন্তীর ক্যানভাসে এস.এম সুলতান* (নড়াইল: বর্ণছাপ প্রকাশণী, ১৯৯৭), পৃ. সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

[২] তদেব।

প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে? ভবিষ্যৎমুখী হয়ে? নিজস্ব চিত্রের বিশালাকার পেশিবহুল কৃষক সম্পর্কে শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঐতিহাসিকের মতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "এটাই ছিল আমাদের প্রকৃত অবস্থা। বাংলার কৃষক শোষণ আর বঞ্চনার কারণেই আজ কঙ্কালসার।.....আমি কৃষকদেরকে তাদের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।[৩] আসলে সুলতান অতীতের কৃষক আর বর্তমানে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কৃষকের মধ্য দিয়ে তিনি অতীত এবং ভবিষ্যৎকে যূথবদ্ধ করতে চান। তাঁর ছবিতে বর্তমান এলেও তা এসেছে অতীত আশ্রয় করেই এবং সেটা হয়েছে দেশীয় শৈলীগত, বিষয়গত এমনকি দার্শনিকভাবেও। ফলে ব্যক্তি সুলতানের মতোই একটি সুলতানীয় চিত্রকর্ম স্বতঃস্ফূর্ততার ভেতর দিয়ে সর্বোত্তম দেশীয় চরিত্র নিয়ে বেড়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে অতীত এবং বর্তমানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা যখন শিল্পী সাহিত্যিকদের, যখন ধর্মীয় রাজনীতিবিদ্ধ সাম্প্রতিক অতীতের চিন্তা-চেতনাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুনকে গ্রহণ এবং নতুনতর সৃষ্টির ঔচিত্যবোধের তীব্র চঞ্চলতায় প্রায় দিকহীন তাঁদের মনন, তখনই স্বাধীন স্ব-ভূমের শিল্পাঙ্গনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘর-বিরাগী শিল্পী এস.এম সুলতানের আবির্ভাব ঘটে। লোকদর্শন-লোকজীবনের মর্মবাণী অনুধাবনের গাঢ়ত্বে ও মমত্বে এবং বিশ্ব দেখা আয়ত দৃষ্টিতে রূপায়িত বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনের নানা চিত্ররূপ নিয়ে ১৯৭৬ সালে একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর এই আবির্ভাব। মানবের চরম শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে অঙ্কিত চিত্রগুলি মূলত আখ্যানধর্মী এবং তাতে থাকে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের ভাবরস আর জড়-জঙ্গমের জন্য বাঙালির চিরকালীন সংগ্রাম ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। সুলতানের সত্তর দশকীয় এই সব চিত্রকলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আহমদ ছফা বলেন:

"বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের একেবারে অন্তঃস্থল থেকেই এ সকল চিত্রের উদ্ভব। ইনকুয়েবেটর যন্ত্রের তাপে ডিমের খোলস ফেটে যেমন করে মুরগীর বাচ্চা প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের উত্তাপে শিল্পীর অন্তর চিরে এ সকল ছবি বেরিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সবটুকু আবেগ, সবটুকু জীবনোল্লাস, সবটুকু স্পর্ধা এবং দুঃসাহস এই ছবিগুলো ধরে রেখেছে।"[৪]

বাঙালিত্বের চেতনায় আপ্লুত জাতির অমিত স্পর্ধায় রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে সগর্ব প্রকাশ-প্রক্রিয়া সুলতানের আত্মপরিচয় বোধকে জাগ্রত করে তোলে। এবং চিত্রের-বিষয় নির্ধারণের জন্য তিনি স্ব-মূলের দিকে অন্বিষ্ট হন। ফলে গ্রাম বাংলার চলমান ইতিহাস প্রবাহ হয়ে ওঠে তাঁর ঐসব চিত্রকলা। সামগ্রিকভাবে সুলতানের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবি শামসুর রাহমান বলেন: "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্যতিরেকে সুলতান এরকম একজন 'মাস্টার পেইন্টার'-এর ঋদ্ধি অর্জন করতে পারতেন না" মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ব্যঞ্জনা বাংলার কৃষকের দেহে সঞ্চারণ করে অতিমানবিকতার গুণ সম্পন্ন করে তোলেন

---

[৩] এস.এ খালেক, "ঐতিহ্য পিয়াসী এক আধুনিক শিল্পী", আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *শিল্পী এস. এম সুলতান* (ঢাকা: কৃষ্টি প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ৩৩।

[৪] আহমদ ছফা, *বাঙালী মুসলমানের মন* (ঢাকা: বুক পয়েন্ট, ১৯৯৬), পৃ. ৭৩।

শিল্পী তাদেরকে।[৫] ফলে অতীত এবং ভবিষ্যতের শোষণহীন কৃষক সমাজের প্রতিভূ হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রাবলী। শ্রী ও শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে শরীরী সৌন্দর্য প্রকাশের যে কৌশল তিনি চিত্রে প্রয়োগ করেছেন (যেমন: চিত্র - ১, ২, ৩) তাতে য়ূরোপীয় রেনেসাঁস যুগের শিল্পীদের প্রভাব থাকতে পারে। তাঁর চিত্রের অতিমানবিকতার গুণ সম্ভবত তিনি কিছুটা আহরণ করেন ইতালীয় রেনেসাঁস শিল্পীদের অজেয় মানবের শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা থেকেই।[৬]

কিন্তু তাই বলে প্রাচীন বাঙালির 'অসুর' পরিচয়, একাদশ-দ্বাদশ শতকে ক্রম-বিবর্তিত বঙ্গীয় ভাস্কর্যে শক্তি ও সৌন্দর্যের যূথবদ্ধ মানবিক কল্পনা তথা মধ্যযুগীয় শিল্প সাহিত্যে মানবিকতার ঐতিহ্যের কথা শিল্পী একেবারে বিস্মৃত থেকেছেন, এমনটি বলা যায় না। বরং প্রকৃতি ও অতীতকাল থেকে আহৃত রূপাবলির সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনা ও স্বদেশ-চেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগে সৃষ্ট যৌগকে অনুশীলিত প্রয়োগ দ্বারা পরিস্ফুটিতে করে তোলার রেনেসাঁস যুগীয় যে শিল্প বৈশিষ্ট্যের কথা ভাসারি (১৫১১-৭৪) বর্ণনা করেছেন, সুলতান তাঁর চিত্র রচনার ক্ষেত্রে সেই শর্তটি মেনে থাকবেন বলে ধারণা করা যায়।[৭] সম্প্রদায়-অতিক্রমী চৈতন্যে তিনি চিরায়ত হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্প সাহিত্যের ভাবসম্পদ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করেন এবং বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আদলে বাংলাদেশী কিছু একটা করার প্রয়াস পান।

সুলতান তাঁর চিত্র শৈলীকে নির্মাণ করেন মূলত ঐতিহ্যগত ভাস্কর্য শিল্পাঙ্গনে দাঁড়িয়ে। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষতা গুণে স্বচ্ছ, পৌত্তলিকতা-অপৌত্তলিকতা বিতর্ক এখানে একেবারে অবান্তর। শিল্প রসিক সৈয়দ আলী আহসান সুলতানের চিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন:

"...সামগ্রিকভাবে একটি শরীরের অঙ্গসংস্থানকে তিনি প্রোপরশনেট বা অনুপাতগত করেন নি। মূলত তার লক্ষ্য ছিলো হস্ত, পদ এবং বক্ষদেশের প্রতি-যেখানে শক্তির তীব্রতা সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু এগুলোর পারস্পরিক সমতা বা অনুপাত তার লক্ষ্য ছিলো না। ভারতীয় ভাস্কর্যে শরীরের একটি আদর্শগত বিভঙ্গ আছে যা বাস্তবসম্মত নয়, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসে সমর্থিত। সুলতান ভারতীয় অর্থাৎ উপমহাদেশের ভাস্কর্যের শরীরী গঠন অনুসরণ করেছেন এবং নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রকাশিত করেছেন।"[৮]

গোটা উপমহাদেশে বিচরণের প্রয়োজন নেই। বঙ্গীয় অঞ্চলের ভাস্কর্যশৈলীর ভেতরেই সুলতানের অনুন্ধিৎসু দৃষ্টি ঘোরাফেরা করেছে বলে আমাদের ধারণা। বিশেষ করে যখন দেখি নবম-দ্বাদশ শতকীয় বঙ্গীয় প্রতিমাকলায় ইহজাগতিক ভোগবাসনার

---

[৫] শামসুর রাহমান, "প্রহেলিকাময় চিত্র শিল্পী", আসাদুজ্জামান (সম্পা.), *শিল্পী এস.এম সুলতান(ঢাকাঃ কৃষ্টি প্রকাশ, ১৯৯৬)*, পৃ. ১৯।

[৬] আহমদ ছফা, পৃ. ৯০-৯১।

[৭] শিবনারায়ণ রায়, *রেনেসাঁস* (ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৪।

[৮] শরীফ আশরাফুজ্জামান, *কিংবদন্তীর ক্যানভাসে এস.এম সুলতান* (নড়াইল: বর্ণছাপ প্রকাশণী, ১৯৯৭), পৃ. ১৯৮-৯৯।

মদির-মাধুর্যের ব্যাপ্তি। বিষয়বস্তু ধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও শিল্প সাহিত্য উভয়ই পার্থিব ভোগ চেতনা এবং জৈব কামনা-বাসনা দ্বারা মণ্ডিত, তখনি সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য আমাদের প্রাচীন কলাচর্চার ভাস্কর্য বিষয়ক অধ্যায়টিকে চোখের সামনে তুলে ধরে। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সুলতানের শিল্প দর্শন ও শৈলীকে প্রাচীনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে মন প্রলুব্ধ হয়; ফলে আলোচনা হয়ে যায় কিছুটা প্রলম্বিত। তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত বাংলাদেশে সুলতান এমন এক শিল্পী, যাঁকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা চলে। কেননা, একটি সুলতানীয় চিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশ ও একজন সাধক বাঙালি শিল্পীকে; দর্শনগত, ভাবগত, বিষয়গত এমনকি শৈলীগতভাবেও। সুলতান কখনো প্রাচীন বঙ্গীয় শিল্প লক্ষণের সূত্র অন্বেষণ করেন, কখনো তাঁর বিবর্তনচক্র পর্যবেক্ষণ করেন নিজের বিদেশ ঘোরা জ্ঞানদৃষ্টে। আর ক্যানভাসে আঁকেন যেন রঙিন মৃৎফলক ভাস্কর্য। বিশাল আকৃতির সেইসব মাটিরঙা ছবি। পুরুষ দেহে প্রকৃতিদত্ত পৌরুষের অতিরঞ্জন, আর নারীদেহে লাবণ্য, কমনীয়তা, মদিরতার অতিরেক নিয়ে সুলতানের ছবি। দেহসীমা অঙ্কনে স্পষ্ট রেখার সাবলীলতা সহজ দৃষ্ট। লোকশিল্পের সহজ সরল ও বলিষ্ঠ শৈলীর স্থূলত্ব ও গতিভঙ্গির আড়ষ্টতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসামঞ্জস্যতা তাঁর চিত্রে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্যের (টেরাকটা) চিত্রধর্মী গুণ আর মসজিদ-মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ নকশার মূর্তিধর্মী গুণের সমন্বয় হলে কি প্রকার হবে, সুলতানের ছবি দেখে তা অনুমান করা যায়। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্র সংলগ্ন খোদিত প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলকগুলি পর্যবেক্ষণে অভিজাত, লোক এবং এ-দুয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট মিশ্র ধরনের শিল্প-লক্ষণের কথাও শিল্পী মনে রাখেন। তাই তাঁর ***প্রথম বৃক্ষ রোপণ*** (চিত্র-১) চিত্রে প্রতীকী মাত্রায় চিত্রিত আদমের চোখে, ঠোঁটে, গালে, ভাবালু মুখমণ্ডলের সর্বত্রই দেখা যায় আভিজাত্যের ছাপ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেহে শুধু মাটির নয়, আদিম শিলা ভাস্কর্যেরও দৃঢ়তা। প্রাচীন মন্দিরের গর্ভগৃহের দেববিগ্রহের মাধ্যমে তিনি যেমন সর্বভারতীয় আত্মীয়তাকে আবিষ্কার করেন, তেমনি বিগ্রহের পৃষ্ঠদেশের চালচিত্রে ঠাসা বুনটে রূপায়িত কিন্নরী অপ্সরা সন্নিবিষ্ট জীবনপ্রবাহের লীলাকেও প্রত্যক্ষ করেন। আবার মৃত্তিকা ফলকগুলি থেকে তিনি শনাক্ত করেন বাংলার সহজাত পটুত্ব-নির্ভর সহজ ও প্রাণবন্ত শিল্প শৈলীর অস্তিত্ব এবং তাতে উচ্চেকোটি শিল্পের ভাবদ্যোতনার অনুপস্থিতি। সেইসব আখ্যানধর্মী শিল্পের মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করেন প্রাচীন বাংলার ধর্মের মানবিক দিক, মনুষ্য দেহ, জীবন, জাগতিক ও অধ্যাত্মবোধ এবং সর্বোপরি জীবপ্রেম। ফলে তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনাচারের মধ্য দিয়ে দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম, এবং কান্তা প্রেমে (পরকীয়া প্রেম/জীব প্রেম) উত্তরণ সম্ভব হয়। একই দেহে তিনি অনুভব করেন রাধা কৃষ্ণের লীলারস, আদম হাওয়া'র উপস্থিতি। সুফির সৃষ্টি ও স্রষ্টার আত্ম-সম্পর্ক, সহজিয়ার মানুষ ও মনুষ্যত্বের সহজ হিসেব, বৈষ্ণবের (লীলা ব্যাতিরেকে) রাধা কৃষ্ণের অভিন্নতা, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণা ইত্যাদি যৌগধর্মী 'একত্ব' চিন্তায় সুলতানের অধ্যাত্ম চেতনা পরিপুষ্ট হয়। একত্বের যৌগত্ব বিষয়ক চেতনা রসায়নই তাঁকে মানব ও মানবী, মানবে মানবে প্রেম সম্পর্ক ও নতুন সৃষ্টির সূত্রটির

সমীপে নিয়ে এসে মানবতাবাদী করে তোলে; করে তোলে সৃষ্টিশীল প্রকৃতির প্রেমিক। তাই ইহজাগতিক ভাবপ্রাধান্য ও আখ্যানধর্মিতা নিয়ে সৃষ্ট সুলতানের চিত্রকর্মে বাঙালির বস্তুজগৎ সম্পর্কে চিরকালীন আকর্ষণটি যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনি ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মানুষ ভূ-প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে থাকে একেবারে। লক্ষণগুলো আমরা দেখি পাহাড়পুর, ময়নামতি, মাহস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকগুলির ফাঁকহীন (Spaceless) তলে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির জীবনধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। ফলকগুলিতে মানবদেহের গঠনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবহীনতা, অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেন সুলতান। অন্তর্নিহিত ভাববিহীন মুখাবয়ববিশিষ্ট ভাস্কর্যগুলি রূপায়ণে যে স্বতঃস্ফূর্ততার বহিঃপ্রকাশ, তা তিনি আত্মস্থ করেন। সারিবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট ফলকগুলির মধ্যে তিনি লক্ষ করেন অনন্ত জীবন প্রবাহ, কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনের প্রতিফলন, সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুভূতিময় বিচিত্ররূপ ও মানসিকতা (চিত্র ৪, ৫)। নবম শতকীয় প্রস্তর মূর্তিরূপের দেহ সীমাকে দৃঢ় বহিঃরেখা দিয়ে আবদ্ধকরণের যে কৌশল তাও শিল্পী লক্ষ্য করেন। ইন্দ্রিয়ানুগ মাংসল দেহ কান্ডস্থিত মুখের প্রশান্তভাব ও অর্ধনিমীলিত চোখ শিল্পীকে আকৃষ্ট করেছে। কারুকার্যহীন অলঙ্করণ ও দেহের মাংস হ্রাস-বৃদ্ধি করণের যে রুচিগত স্বাধীনতা সেকালে শিল্পীদের ছিল, ঐতিহ্যের সেই স্বাধীনতাই কি সুলতান আধুনিককালে তার চিত্রের নারীদেহে ভোগ করেন? বিশেষ করে জাগতিক রসমাধুর্যপূর্ণ, প্রেমভাবসম্পন্ন প্রশান্ত মুখাবয়ব আর ঋজুতাময় স্তম্ভসদৃশ নিম্নভাগ নিয়ে যে একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর্যশৈলী, তার প্রভাব সুলতানের নারীরূপ গুলিতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না। এসবের উদাহরণ হিসেবে ***ধান ঝাড়া, সচল সচল সবাক ইতিহাস*** (চিত্র-৪, ৬) চিত্র দুটিকেও উপস্থাপন করা যায়। আবার বাংলার ধর্মগত চিত্রের প্রবহমান ক্ষীণ ধারা ধরে বাস্তবধর্মী নারীদেহ-বল্লরী রচনার যে প্রচলন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে বজায় ছিল, সুলতান তাঁর চিত্রের নারীদেহে সেই শৈলীরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভাস্কর্যের স্তন, জঙ্ঘা, নিতম্ব, হাঁটুর বর্তুলাকার কোমল মাংসল তাল'কে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে দৃঢ়বদ্ধ এবং অসম পৌনঃপুনিক করে বিশেষ মাত্রা দান করেন শিল্পী তাঁর চিত্রের রূপাবয়বে। ফলে পাথুরে কিংবা শক্ত মাটির ঢেলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত চিত্রের পুরুষ ফিগারগুলি দশম শতকীয় ভাস্কর্যের শক্তিমত্তা আর প্রাণময়তার প্রকাশ নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। ইহজাগতিক ভাব প্রবণতায় ফিগারের ঋজু কঠিন নিম্নভাগ রচনার নবম-দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর্য বৈশিষ্ট্য একটা সময়ে সুলতানের ফিগারগুলিরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রমাণ আলোচ্য চিত্র 'সচল সবাক ইতিহাস'সহ তাঁর অন্যান্য চিত্রাবলীতেও বিদ্যমান।[৯]

বস্তুতপক্ষে, দেবভাবশূন্য হয়ে বাংলার মানবায়িত ভাস্কর্যের (বিশেষ করে মৃৎফলক ভাস্কর্যের) যে ক্রমপরিণতি, সেখান থেকে মাধ্যমের ভিন্ন রাস্তায় আধুনিক সময়ের চিত্রী

---

[৯] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বাং), পৃ. ৬৪৪-৬৬৬; দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ১ম খন্ড (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪-৩৫), পৃ. ৪৩৬-৩৭।

সুলতান যাত্রা শুরু করেন স্ব-সমাজের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের দিকে। অর্থাৎ বঙ্গীয় শিল্প সাহিত্যের মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠার ক্রমবিবর্তনের কথা ছবির ভাষায় লিখতেই সুলতানের ছবি নির্মিতিগুণ নিয়ে বেড়ে ওঠে। কখনো মনে হয় যেন মধ্যযুগের দেবভাবহীন মৃৎফলকের জীবন প্রবাহ তার অঙ্গ বৈশিষ্ট্যে অতিমানবিকতার মাত্রা চড়িয়ে আধুনিক আঙ্গিকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই অতিমানবিকতা এসেছে শিল্পীর পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা থেকে, মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ থেকে, সহজিয়ার দেহভাণ্ডের সর্বস্বতার চিন্তা থেকে, সর্বোপরি বাঙালির অসুর পরিচয় থেকে। ফলে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সর্বোচ্চ মাত্রার গভীরতায় পৌঁছানোর সক্ষমতার বিচারে চিত্রীদের মধ্যে এস.এম. সুলতানকেই উত্তম হিসেবে দেখি। আধুনিক দৃষ্টি নিয়ে ঐতিহ্যের মর্মমূলে পৌঁছানোর মুক্তি সংগ্রামকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন নিজের কর্মজীবনে ঘটিয়ে এস.এম. সুলতান একজন প্রকৃত বাঙালি শিল্পী হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন।

সুলতানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রকর্ম

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলিকে অবলম্বন করে অগ্রজ শিল্পীদের প্রত্যেকেই দু-একটি করে চিত্রকর্ম রচনা করেছেন দেখা যায়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এস.এম. সুলতানও এর অন্যথা করেননি। শত্রু বাহিনীর নজিরবিহীন হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, ধ্বংসলীলা, ও নির্মূল প্রক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচতে লক্ষ লক্ষ বাঙালি বাড়িঘর ছেড়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। এর প্রেক্ষিতে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিআক্রমণ রচিত হওয়ার এটাও একটা অব্যবহিত প্রেক্ষিত। মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালির বিপর্যয় এবং আত্মরক্ষা ও তাদের শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে এস.এম. সুলতানের ***সচল সবাক ইতিহাস*** (চিত্র-৬) চিত্রটিতে। ঢাকার মতিঝিল শিল্প ব্যাংকের প্রধান ফটকের করিডোরে ঝুলানো এগার ফুট বাই একুশ ফুটের এই বিশাল চিত্রটির শিরোনাম শিল্পী প্রথমে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের একটি বাক্য 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর' রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পী ও শিল্পকলার উপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির অলঙ্ঘ্য প্রভাবের প্রমাণ দিয়ে শিল্পী '৭৫ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে এটির বর্তমান শিরোনামটি রাখেন।[১০] বাঙালির মুক্তির ইতিহাসের সচিত্র এই দলিলে উপরের দিকে দেখি পাকিস্তানি হায়েনার অত্যাচারের নমুনা দাহ্যমান গ্রাম, প্রজ্বলন্ত প্রকৃতি। নীচে অঙ্কিত হয়েছে জান-মাল ইজ্জত রক্ষার্থে ভীত জনস্রোতের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিকহীন প্রবাহ। উন্মূলিত মানুষ পিঁপড়ের সারির মতো লাইন করে এগিয়ে চলেছে। এঁরা প্রায় সকলেই অবলা নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ। বোঝা যায়, কিশোর-তরুণ-যুবার দল চলে গেছে মুক্তিযুদ্ধে। পলায়নপর মানুষের নানা ভঙ্গি, অভিব্যক্তি, আর ত্রস্ততা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন শিল্পী এই মানুষের দঙ্গলে। একাত্তরে যারা উন্মূলিত হয়ে প্রতিবেশী ভারতে

[১০] শরীফ আশরাফুজ্জামান, পৃ. ১২৬।

শরণার্থী হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এ দৃশ্য। নিজের ইজ্জত এবং সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে মা, আতঙ্কিত শিথিল পেশির বৃদ্ধ ও তাঁর যুবতি পৌত্রী অথবা গৃহবধূ, পুত্রের ঘাড়ের খাটিয়ায় উপবিষ্ট চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধের পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তার জীবনসঙ্গিনী, কারও মাথায় কাপড়ের পুঁটুলি, হাঁস মুরগির ঝাঁকা, হাতে ছাগলের দড়ি, সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। সাথে চলছে বাড়ির পোষা কুকুরগুলি। এই ভীত-সন্ত্রস্ত পলায়নপর জনতার বিপরীতেই আছে সাহসের পরাকাষ্ঠা। শরীরের পেশিতে ঢেউ তুলে প্রতিবাদী যুবকেরা যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রু প্রতিরোধকল্পে দৃপ্তপদে আগুয়ান। এখানে শত্রুকে প্রতিহত করতে বাঙালির শৌর্য-বীর্যের প্রকাশকে জাতিসত্তার নবজাগরণের প্রজ্ঞাপন হিসেবে দেখতে চান শিল্পী। এভাবেই শিল্পী এস.এম. সুলতান বাঙালির জাতীয় জীবনের জাগতিক পরিক্রমার সবচেয়ে ভোগান্তিকর পরিস্থিতির অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন ঘটিয়েছেন আলোচ্য চিত্রটিতে। বস্তুত শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বিষয় সংলগ্নতা কিংবা গ্রাম বাংলার যাপিত জীবনের শুদ্ধ আদর্শিক প্রতিফলনের জন্যই নয়, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সুলতান বিশিষ্ট শিল্পী হয়ে আছেন এই জন্যও যে, তিনি ঐতিহ্যগত শিল্প শৈলীর সঙ্গে আধুনিকতার সংশ্লেষণ ঘটিয়ে স্পষ্ট আঙ্গিকে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত নতুন সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন। চিন্তার মুক্তির সংগ্রামের মাধ্যম এই দুর্লভ প্রাপ্তির আশা মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরে সকল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরই আত্যন্তিক লক্ষ্য ছিল।

বর্তমান আলোচ্য চিত্র ***৭১-এর গণহত্যা*** (চিত্র-৭) সুলতানের স্বকীয় শৈলীর বহির্ভূত হলেও তাঁর দার্শনিক মননের ছোঁয়াবঞ্চিত নয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন হত্যা নির্যাতনের বিশেষ অনুষঙ্গাবলম্বী এই চিত্রটির প্রাথমিক তল তিনি নির্মাণ করেন আমাদের স্বাধীনতার উষালগ্নের রক্তিম আবহ সহযোগে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষপ্লাবী অরুণালোকময় প্রেক্ষাপটটি তুলির আঁচড়ে চিরে চিরে তার ভেতর থেকে বের করে আনেন তাঁর বিষয়কে। অগণিতের ধৈর্য, শক্তি, আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা স্বাধীনতার সর্বাঙ্গ চিরে এর গড়ন প্রক্রিয়াটিই যেন নব প্রজন্মের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে চান শিল্পী। চিত্রটিতে দেখতে পাই মাতৃরূপে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রসারিত হাতের মতো শাখা প্রশাখায় নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে ঝুলে আছে অসংখ্য লাশ; ঠিক যেন একই বৃক্ষের অজস্র ভূমিস্পর্শকাতর ঝুরি লম্বমান হয়ে আছে। বাস্তবকে পরাবাস্তব অনুভবে উন্নীত করতে গিয়ে শিল্পী প্রকৃতি এবং মানব দেহ সংগঠনকে এক করে এঁকে চিত্রতলে বিশেষ ধরনের সাযুজ্য নির্মাণ করেন। এই নির্মিতি থেকেই ক্রমশ দৃশ্যপটে ভেসে উঠেছে স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধে আত্মত্যাগী সন্তানের দল ও তাদের ধারণ করে বিলাপরত দেশমাতৃকার মূর্তিরূপটি।

যাপিত জীবনে গৌতম বুদ্ধের ত্যাগ, দয়া ও অহিংস নীতির প্রতি আস্থাশীল শিল্পী এইসব গুণকে ধর্মীয় ঐতিহ্যসূত্রে তাঁর জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করেন, যার পরিচয় চির-নিগৃহীত বাঙালি জাতি একাত্তরের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কাল পর্যন্ত অনেকবারই দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানব

কল্যাণকামী নীতিকে পদদলিত করে আক্রমণ ও অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাদের বহুপ্রকারের উৎপীড়ণ ও নির্মূল প্রক্রিয়ার মধ্যে বাঙালিদের গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতন ও হত্যার পদ্ধতিটি হয়তো শিল্পী কোনোক্রমে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। প্রত্যক্ষের সেই অভিজ্ঞতা তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস, ভাবনা ও নীতিকে আহত করে তোলে। সেই আহত দার্শনিক বোধই অপমানিত, শোক বিহ্বল প্রতীক হিসেবে বিধ্বস্ত 'বোধিবৃক্ষ'কে বেছে নিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, যা আবার ঘটনাবহুল একাত্তরের কোনো এক বাস্তব ঘটনারও প্রতিচিত্র। যে বোধিবৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে অহিংসা আর মানব কল্যাণের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেখানেই শিল্পী অবলোকন করেন পাকিস্তানি ক্রুরতার পরাকাষ্ঠা; অহিংসার বেদিমূলে নরঘাতকের উন্মত্ত হত্যালীলা। প্রায় একই রকমের আঙ্গিকে বোধিবৃক্ষতলে নারী নির্যাতনকে বিষয় করে সুলতানের অপর একটি সুবৃহৎ কাজ আছে। ***নির্যাতন*** (সম্ভাব্য শিরোনাম) শীর্ষক কাজটিতে (চিত্র-৮) হিংস্রতা আর বর্বরতা অহিংসা তত্ত্বের 'বোধি' বৃক্ষটির সমস্ত অহিংসত্ব শুষে নিয়ে একে মহাদানবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করেছে যেন। অক্টোপাসের ন্যায় বহুভুজ এই মহাসম্ভোগী বিকৃত দানব বাঙালি দেহ চিপে পিষে চিবিয়ে মাড়িয়ে ঝুলিয়ে অগ্রগমনরত। এখানে শিল্পী'৭১-এর বাংলার ত্রিসীমানা জুড়ে পাকিস্তানি দৈত্যের কামোল্লাসী পৈশাচিকতার চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট। এককালে অহিংস নীতি অবলম্বিত বাংলায় অবলা মাতৃত্বের প্রতি নির্মম নিষ্ঠুরতায় বিচলিত শিল্পী পাকিস্তানি অমানবিকতার বিচিত্র বীভৎস এই দলিলটি বিশ্ব বিবেকের জ্ঞাতার্থে সৃজন করলেও চিত্রটি এখন মূলত অপ্রকাশ্য; ছবির বাজারে অর্থমূল্যের চোরাবালিতে আবদ্ধ।

দেশের অনেক চারুকর্মীর চৈতন্যে শেষ পর্যন্ত জনচেতনারই আশ্রয় মিলেছে; লুণ্ঠন আর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিচিত্রও বিষয় হয়ে উঠে এসেছে চিত্রকর্মে। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আশাভঙ্গ ও প্রতিবাদী চেতনাও সত্তর দশকীয় ধারাবহিকতা রক্ষা করেছে পরবর্তী দশক গুলোতে। সামাজিক অবক্ষয় চিহ্নিত করার তাড়না ছাড়াও গণতন্ত্র হত্যা, স্বৈরাচারী শাসক এবং তার ছত্রছায়ায় স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির উত্থানকে রুখবার দৃঢ়তাও প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে আশির দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত চিত্রমালায়। আসলে, সমাজের মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং জীবন সংগ্রামের শিল্পময় উপস্থাপনা বা প্রকাশই যে একজন সচেতন শিল্পীর 'প্রকৃত দায়' এটিই কখনো কখনো উপলব্ধ হয়েছে এই সময়ের চিত্রকলায়। জনগণের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের দীপ্ত প্রভায় শিল্পীরাও আলোকিত হয়েছেন; তাঁরা ঋদ্ধ থেকেছেন বাঙালিত্বের চেতনায়, গণতান্ত্রিক ভাবনায়। শিল্পীদের কেউ কেউ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার সমার্থক শিল্প প্রবণতায় নিমজ্জিত হলেও বাঙালি সংস্কৃতি-চর্চার স্রোতটি প্রবলতর ধারা হিসেবেই ক্রিয়াশীল থেকেছে। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে অযৌক্তিক দ্বিধাবিভক্তি অনেক শিল্পীই মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা সমকালীন সময়ের কাছে, আশাহত মানুষের কাছে, বাঙালিত্বের কাছে, স্বাধীনতার কাছে তাঁদের দায়বোধকে আত্মগতভাবেই মেনে নিয়েছেন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসান, এস.এম.

সুলতান ও শাহাবুদ্দিনের নাম প্রথমেই মনে পড়ে। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বাঙালিত্বের চেতনার ভেতর দিয়ে তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান পেয়েছিল। ঐতিহ্য অন্বেষণের উপলব্ধি বা প্রয়োজনীয়তা থেকে সে আবিষ্কার করেছিল সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। অথচ পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো একে বিতর্কের সূত্রে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবাদ নিয়ে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রয়োজনে। সরকার নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে শিল্পীরা লক্ষ করলেন বাঙালিত্বের চেতনার সংকট। এই সংকট নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের নামে পাকিস্তানি সরকারি সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপকৌশল মাত্র। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক এবং ভাষা-আশ্রয়ী বাঙালি জাতীয়তাবাদের রয়েছে দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ভিত্তি। তাই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের ধারকদের সঙ্গে এই তথাকথিত নবনির্মাণের প্রতারকদের সংঘাত অনিবার্য। সেই পরিস্থিতিতে শিল্পী এস.এম. সুলতান লোক-রূপবন্ধ, লোকগল্প, সংস্কার-কুসংস্কার, অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের প্রভাবে সৃষ্ট প্রহেলিকাময় চিত্রতল, নাগরিক অবক্ষয়িত জীবন, সংঘাত, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদিকে তাঁর বিষয় ভাবনায় স্থান দিলেন না। কোনরূপ শিল্প-বিতর্কে জড়ালেন না শিল্পী। তিনি প্রচলিত পাকিস্তানি চিন্তাধারা ও চিত্রধারার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন প্রকাণ্ডদেহী প্রবল বিক্রমী মানুষকে; বাংলাদেশি মানুষকেই। কিন্তু মননে রইল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিশীলিত সত্তা।

তিনি বাংলাদেশের আশির দশকীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে, না দেখা কোন অনুভব অনুভূতিকে রঙ-রেখার জটিল বিন্যাসে চিত্রপট ভরিয়ে তোলার বাংলাদেশী প্রক্রিয়াটিকে অযথার্থ ভেবে সযত্নে এড়িয়ে গেলন। পরিবর্তে চিত্রপটে মানবের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন শিল্পী সুলতান। তিনি গ্রাম-প্রকৃতি ও কৃষকের দৈনন্দিন জীবনাচরণের নানা দৃশ্য সহজ সরল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে চিত্রতলে সাবলীল আঙ্গিকে সঞ্চারিত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ঐতিহ্যিক শিল্পশৈলী ও ভাবদর্শনের প্রতি যেমন তাঁর আনুগত্য প্রকাশ অব্যাহত রেখেছেন, তেমনি কখনো কখনো আপাত নিরীহ বাঙালির সুপ্ত হিংস্রতাকেও প্রকাশ করেছেন পক্ষবিস্তারকারী অপশক্তিকে সতর্ক করে দিতে। শিল্পীর বিখ্যাত ***চর দখল*** চিত্রটির সঙ্গে ***প্রতিরোধে কৃষক*** চিত্রটিও সমান ভাবব্যঞ্জক। আধুনিক এই সাধক শিল্পীর জন্য দূর অতীতের লোক বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হয় তাঁর সমতুল্য সংঘ প্রিয় শিল্পী মানস ও শিল্পী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অন্বেষণে। অতীত বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান রাণক শূলপানির (সেন রাজত্বকালে বর্তমান) মতো রাজকৃপা এস.এম সুলতানের কপালেও জুটেছিল 'প্রান্তিক মানুষের দায়' ঘাড়ে নিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও। এরশাদ সরকারই সেই কৃপা করেছিলেন। কিন্তু এরশাদীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির ধূম্রজালে দেশের মানুষ যখন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত, লক্ষ্যহীন, তখন মানবিকতা বোধে আপ্লুত শিল্পী নির্বিকার চিত্তে এই সংকটময় পরিস্থিতির প্রতীকী রূপায়ণ ঘটান তাঁর ***যাত্রা*** (চিত্র-৯) শিরোনামের চিত্রটিতে। এখানে চিত্রিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গৌরব বিস্মৃত হয়ে

আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালি ধুকে ধুকে অনির্দিষ্টের পানে যাত্রা করেছে সেই দৃশ্য, যেন লক্ষ্যহীন বাংলাদেশ চলেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এইভাবে শিল্পী সুলতানের মানস সত্তায় বাঙালিত্বের চেতনাজাত মানবিকবোধ, ধর্মীয় সমন্বয় ভাবনা, অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতার পাশাপাশি এক ধরনের প্রতিবাদী চেতনাকেও সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতানের ছবিতে আদিমতা বর্তমান থাকলেও তা যেন বাঙালির বক্র মেরুদণ্ডকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলছে, সমকালীন নির্বীর্যতাকে পরিত্যাগ করে পৌরুষদীপ্ত সত্তায় আরোহণ করতে বলেছে।



চিত্র ১: প্রথম বৃক্ষরোপণ



চিত্র ২: অতীত দিনের স্মৃতি, ১৯৭৬।

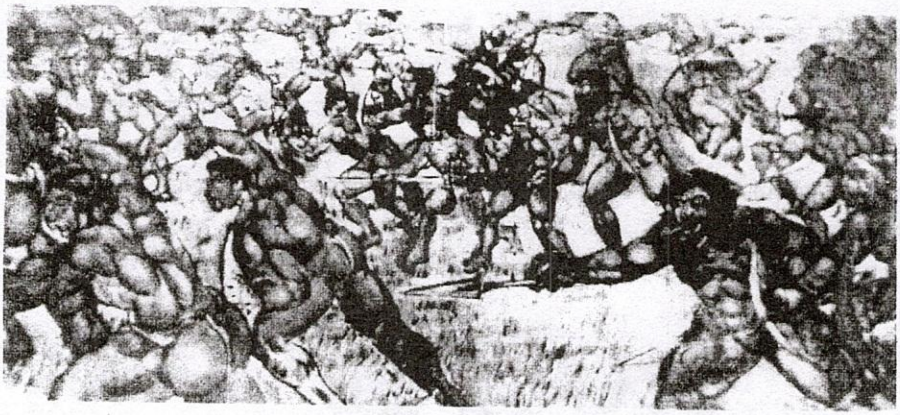

চিত্র ৩: চর দখল, ১৯৭৬।



চিত্র ৪: ধান ঝাড়া, ১৯৭৬।



চিত্র ৫: প্রতিরোধে কৃষক, ১৯৮৭।



চিত্র ৬: সচল সবাক ইতিহাস

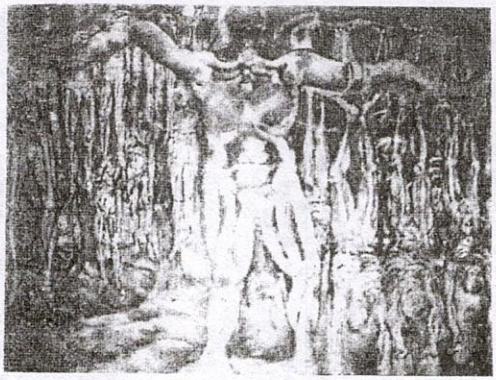

চিত্র ৭: ৭১-এর গণহত্যা।



চিত্র ৮: নির্যাতন।



চিত্র ৯: যাত্রা, ১৯৮৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

সেলিম আল দীন-এর নাটক 'কেরামতমঙ্গল' : প্রসঙ্গ দোজখ ভাবনা

অনুপম হাসান*

Abstract : Selim Al Din is genius and talent dramatist in the history of Bengali Drama. He always tried to discover new outline of Bengali Drama. In his drama he tried to explore the social reality of Bangladesh. Selim Al Din sketched geographical dissimilarity, social condition, viewing of different community in a big plot and epic form of *Keramatmangal*. Keramat is the hero of the drama, who acrossed the tortured chambers (dojokh) of the Bangladesh.

ভূমিকা

বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে অসামান্য প্রতিভাবান নাট্যকার সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) আজীবন নাট্যচর্চা করেছেন। তিনি একক সৃজন-প্রতিভায় বাংলা নাটকে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি মনে-মননে নাট্যজন এবং নাট্য-গবেষক; নাটকের অধ্যাপক। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব বিভাগে নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করেছেন এবং বাংলা নাটকের বিষয়-আঙ্গিক তথা নাট্যশরীর নির্মাণে নতুন নতুন রীতিপদ্ধতি আবিষ্কারে সচেষ্ট থেকেছেন। প্রচলিত নাট্যাঙ্গিক ভেঙে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের একটি নিজস্ব ভুবন তৈরি করেছেন। একই সাথে তাঁর নাটকে উপস্থাপিত জীবনচিত্রও প্রচলিত নাট্যধারণা থেকে পৃথক। তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণের দ্বারা বাংলার প্রাচীন জনপদ এবং আদি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য নাট্যসাহিত্যে উপস্থাপনে সচেষ্ট থেকেছেন। তাঁর নাট্যচেতনার উৎস বাঙালি সমাজ ও বাংলার প্রাচীন জনপদ। তিনি নাটকে বাঙালি সমাজের শেকড় সন্ধান করেন। তিনি বাঙালি সমাজের শেকড়ের সাথে গবেষণা করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হন।[১] এ সময় তিনি মধ্যযুগে বাঙালি সংস্কৃতির অবস্থা এবং প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাংলা জনপদের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে উপকূল ঘেঁষা মানুষের সাথে। ফলে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়েছে– বাংলা জনপদের উপকূলীয় প্রান্তিক মানুষের যাপিত জীবনের ঋদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনবোধ। তিনি গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষের সমাজজীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করেন যে গ্রামীণ মানুষের জীবনাচরণের মধ্যে আছে যেমন স্বাতন্ত্র্য তেমনি এতে নিহিত আছে নাটকীয়

---

* ড. অনুপম হাসান, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা।

[১] সেলিম আল দীন *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। এটি বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর থেকেই নাটক রচনা ও নাট্য-গবেষণা নিয়ে সেলিম আল দীন জীবনের গাঁটছড়া বাঁধেন নাটকের সাথে। তাঁর এই বন্ধন ছিল আমৃত্যু অটুট ও অভিন্ন।

উপাদান। তিনি বাঙালি সমাজের এই নাট্যউপাদানকে গভীর নিষ্ঠায় আবিষ্কার করেন এবং তা নিজস্ব কৌশলে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করে বাংলা নাটকে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনি একান্ত নিষ্ঠায় প্রান্তিক মানুষের নিত্যকার জীবনকথা ও সমাজবাস্তবতা নাটকের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলা নাটকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ অবিকল উপস্থাপন করে সেলিম আল দীন একাধারে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি বাংলা নাট্যসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেলিম আল দীন অসামান্য প্রতিভাবান, স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্য-পিয়াসী নাট্যকার। তিনি মনেপ্রাণে নাটকে সমর্পিত আপাদমস্তক নাট্যকার ও নাট্যগবেষক ছিলেন। বাংলা নাটকের নিজস্ব রীতি-প্রকরণ আবিষ্কারে আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। তিনি নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন গ্রামবাংলার অতিসাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের হাসি-কান্না মিশ্রিত বাস্তবতা। তিনি নাটকের গাঁটছড়া বেধেছিলেন প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবন ও সমাজভাবনার সাথে। তাঁর *কেরামতমঙ্গল* নাটকে মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে গ্রামবাংলা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ নাটকে তিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভিন্নতায় বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীর যাপিত জীবনের বিচিত্র ক্যানভাস এঁকেছেন। এ নাটকের নায়ক কেরামতের নরক-পরিক্রমার সাথে সাথে নাট্যকার সেলিম আল দীনও যে স্বীয় জীবনদর্শন নিয়ে গ্রামবাংলার মানুষের বিচিত্র জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। বলাবাহুল্য *কেরামতমঙ্গল* সেলিম আল দীনের রচিত নিজস্ব নাট্যধারার সর্বাধিক উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য নাটক।

কেরামতমঙ্গল প্রসঙ্গ

সেলিম আল দীন রচিত *কেরামতমঙ্গল* (১৯৮৮) মহাকাব্যিক আয়োজনের নাটক। মহাকাব্যের মতোই *কেরামতমঙ্গল*-এর কাহিনীর বিস্তার স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপী। নাট্যকাহিনীর নামকরণ সেলিম আল দীন সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যধারার রীতি অনুসারে করেছেন। *কেরামতমঙ্গল*-এর কাহিনীতে মহাকাব্যিক আবহে নাট্যকার অনেক চরিত্রের আমদানি করেছেন। এসব চরিত্রের ছোট-খাট সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে গতিশীল রেখেছেন এবং একটি বিশেষ ঐকতান সৃষ্টি করেছেন। *কেরামতমঙ্গল* নাটকে এগারটি খণ্ডে আলাদা আলাদা মূল কাহিনী ও উপকাহিনী আছে, তবে সকল কাহিনীর মধ্যে নাট্যকার একক ঐকতান সুকৌশলে সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়াও এ নাটকের ঘটনা ও কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান, সময় ও কাহিনীর মধ্যেও যথেষ্ট দক্ষতার সাথে নাট্যকার ঐক্য সাধন করেছেন।

ভারতবর্ষের বিভাজনের অল্পকাল পূর্ব থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দিকভ্রান্ত সমাজচিত্র, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত সময় *কেরামতমঙ্গল*-এর কাহিনীর বিরাট পটভূমি। বাংলা-জনপদের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোষ্ঠী ও নানা জাতের মানুষের সুখ-দুঃখের ঘটনা কেরামতমঙ্গল-এর কাহিনীবৃত্তে স্থান লাভ করেছে। বিশাল কাহিনীতে সমগ্র বাংলাদেশই যেন উঠে এসেছে একটি অখণ্ড মূর্তিতে। *কেরামতমঙ্গল*-এর কাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান, আদিবাসী– হাজং-গারো, জমিদার-প্রজা, মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকার, রাজনীতিবিদ-কৃষক-মাঝি থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবীর চালচিত্র

নাট্যঘটনায় উপস্থাপিত হয়েছে।[২] কেরামত এই মহাকাব্যিক কাহিনীর কথক। কেরামত বাংলা-জনপদের অতীত ও বর্তমান মানচিত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা এক পথিক। নাট্যকাহিনীতে কেরামতের কখনো সক্রিয় অংশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটিকে নাট্যকার দর্শক বা একজন পান্থ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কেরামত সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন :

> এক জীবন এক মানুষ। আপন গৃহ, আপন মানুষ, প্রাত্যহিক মুখগুলো পেছনে ফেলে চলে যেতে যেতে কেরামত আর এক জীবন এক মানুষ থাকে না। স্বার্থবাদী মানুষের ছড়ানো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আর জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্র কেরামতকে ঘরছাড়া করে। তারপর থেকে গৃহহীনতাই হয়েছে তার গৃহ। তাকে দেখা গেছে হাজংদের আন্দোলনে, জেলখানার ছোট্ট খুপরীতে, আবার হাজতসঙ্গী গ্রাম্য ডাক্তারের সহকারীও হতে দেখা গেছে তাকে। ... এ নাট্যে কেরামতের আকুতি শমলার ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলে।[৩]

বাংলাদেশ নামক একটি রঙ্গমঞ্চের অতীত ও বর্তমানের অভিনীত কাহিনীর দর্শক কেরামত। কেরামত পথের দু'ধারের দৃশ্য দেখে চলেছে অবিরাম। তার দেখা এ জনপদের ইতিবৃত্ত সেলিম আল দীন মোট এগারোটি খণ্ডে দৃশ্যমান করে তুলেছেন। নাটকের প্রতিটি খণ্ডে যে জীবনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা প্রতীকী অর্থে দোজখ সদৃশ।[৪] সমালোচকের ভাষায় : 'পান্থজন কেরামতের চোখ দেখে ক্লিষ্ট ক্রুর জীবন দোজখ একের পর এক। এ জীবনের শেষ কোথায়? কোথায় সত্য? মানুষের মঙ্গল নিহিত রয়েছে কোথায়? এগারোটি দোজখ অতিক্রম করে সে।'[৫] কেরামত যেন এই দোজখ সদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ অতিক্রম করে চলেছে স্বর্গের সন্ধানে। *কেরামতমঙ্গল* নাটকে প্রতিটি খণ্ডকে এক একটি দোজখের প্রতীকে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। নাটকের এগারো খণ্ডে সেলিম আল দীন এগারোটি প্রতীকী দোজখের কথা তুলে ধরেছেন। *কেরামতমঙ্গল* নাটকের প্রতিটি খণ্ড ও তার প্রতীকী দোজখের নাম নিম্নরূপ :

১. নখল খণ্ড: সম্প্রদায়িকতার দোজখ
২. চন্দ্রকোনা খণ্ড : ছিন্নমূল উদ্বাস্তু তথা উন্মূল মানুষের দোজখ
৩. ফইট্যামারি খণ্ড : সামন্তবাদের সামাজিক দোজখ
৪. হিজড়া খণ্ড: সামাজিক-প্রাকৃতিক বঞ্চনার দোজখ
৫. হাজং খণ্ড: প্রতিবাদী মানুষের দোজখ

---

[২] সমালোচকের কথায়ও এর সমর্থন মেলে : 'এ নাটকে যোগ হয়েছে লোকজ জীবনের বিপুল জীবনভাষ্য। হিন্দু-মুসলমান, গারো-হাজং, ক্যাথলিক-খ্রিস্টান, মুনি-ঋষি, হিজড়া, জমিদার, জেলে, মাঝি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর অবক্ষয় প্রভৃতি অজস্র জাতি, প্রজাতি, ধর্ম, মানুষ ও প্রসঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটির বিশাল আখ্যানভাগ। এর সঙ্গে লোকজ উপাখ্যান, উপকথা, কিংবদন্তীর সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। 'আফসার আহমদ, *মঞ্চের ট্রিলোজী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, (ঢাকা : গ্রন্থিক, ১৯৯২), পৃ. ৮৮।

[৩] মাসুম রেজা, "নিভে দীপ অধিক উজ্জ্বল", হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত, *থিয়েটারওয়ালা*, ১০ম বর্ষ : ১-২ যৌথ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ২০০৮; পৃ. ১২১।

[৪] এ নাটকের দোজখ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন পরিশিষ্টে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন : "আর যে কেরামতমঙ্গল নাটক– কোরানে ঈশ্বর বর্ণিত সপ্ত দোজখের সপ্তবর্ণ অগ্নি আপনার প্রতি লোমকূপে অনুভব না করেই অভিনয় নিমিত্ত মঞ্চে অবতীর্ণ হয়– সে অভিশপ্ত। অভিশপ্ত।" সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-২*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৩০৬। (কেরামতমঙ্গল : ১২, পরিশিষ্ট : ক)

[৫] আফসার আহমদ, *মঞ্চের ট্রিলোজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, (ঢাকা : গ্রন্থিক, ১৯৯২), পৃ. ৮৬।

৬. হাজত খণ্ড: জেল স্বরূপে জাগতিক দোজখ
৭. চিগাস্থান খণ্ড: মিশনারীদির সৃষ্ট ধর্মের নামে সামাজিক দোজখ
৮. রাজাকার খণ্ড: রাজনৈতিক জীবনে ধর্মান্ধ মৌলবাদের দোজখ
৯. জলসুখা লঞ্চঘাট ও বিবাহ খণ্ড : নিরুপায় মানুষের নিরাশার দোজখ
১০. কুসুমপুর খণ্ড : রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থহীন স্বাধীনতার দোজখ
১১. চানতারা খণ্ড: নির্মম নিয়তির দোজখ

কেরামতমঙ্গল-এর দোজখ পরিক্রমা

সেলিম আল দীন *কেরামতমঙ্গল* নাটকের এগারোটি খণ্ডে মূলত গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষের নরক সদৃশ জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন, যে জীবনের দর্শক নাটকের কথক কেরামত। এ নাটকের কেরামত চরিত্রে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়েছে। *কেরামতমঙ্গল*-এ ভ্রূণহত্যা এবং রক্ষার মধ্য দিয়ে যে মানবিকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার সাথে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবন জড়িত। শিমূল ও পারুলের অসফল মাতৃত্বকে সেলিম আল দীন শিল্পের অবয়বে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের কথায় :

> [...] আমার ও নাসিরউদ্দিন ইউসুফের পারিবারিক জীবনে দুটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায়। পারুলের প্রথম সন্তান ভ্রূণের অধিক মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুতে সমর্পিত হয়। তার কিছুদিন পর শিমূল ইউসুফের অকাল গর্ভপাত ঘটে।
>
> *কিত্তনখোলা* লেখার আগে এই দুটি ঘটনা ঘটেছিলো। কিন্তু আমার দেহমনে কিত্তনখোলা এমন একটি সুরমূর্চ্ছনা তৈরি করেছিলো যে– আমি শিমূল ও পারুলের অসফল মাতৃত্বের বেদনার দুটি গহ্বর লাফিয়ে পার হয়ে গিয়েছিলাম। সহসা একদিন কোনো এক অচিহ্নিত দিনে মনে হলো আমাদের এই পারিবারিক বেদনাটুকু আমি কিভাবে দেখছি। ক্রমেই বিমর্ষ হতে থাকি। আমার পিতৃত্বের উপরে অপঘাতের যে অন্ধআলো এসে পড়লো তার জায়নামাজের উপর ধ্যানমগ্ন হই। ...ভাবি যে নিতান্ত একটা পারিবারিক বেদনাকে– যে আমি অনিবার্যভাবে ডুবন্ত– তার পক্ষে কোনো শিল্প অবয়বে বিন্যাস করণ সম্ভব কিনা।
>
> আত্মগত বেদনা গান কি কবিতা হয়ে বুকের হাড় পাঁজরে ঝাঁপতাল বাজিয়ে দেয় কিন্তু তাকে কি আত্মবিচ্ছেদনের শিল্পরূপে বিস্তারিত করা যায় না। এইরকম ভাবতে ভাবতে গল্পটি ধরা দেয়। আমার নিখিল জুড়ে ভ্রূণ বিনষ্টির হাহাকার শুনি। তখন ভূগোল মানুষ জনপদ প্রকৃতি খগোল নিয়ে বসে যাই।[৬]

সেলিম আল দীন তাঁর পারিবারিক বৃত্তে সংঘটিত এই ভ্রূণ বিনষ্টির ঘটনাকে তিনি মহাকাব্যিক আয়োজনে *কেরামতমঙ্গল*-এ রূপদান করেন। যেখানে তিনি ভ্রূণহত্যা ও রক্ষায় ব্যক্তির নির্মম নিয়তিকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। সুতরাং বলা যায় নাট্যকার নিজেই কেরামত চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন, দেখেছেন প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও নরকতুল্য জীবনযাপন এবং শত অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও কেরামতকে সচেষ্ট রেখেছেন ভ্রূণ রক্ষায়।

---

[৬] সেলিম আল দীন কর্তৃক *কেরামতমঙ্গল* নাটকের সূচীপত্র সংস্করণের *কথাগুচ্ছ*-এ তাঁর এই পারিবারিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। –উদ্ধৃত, সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র*-২, পৃ. ৩৬৫ (পরিশিষ্ট)

'নখলা' দোজখ। এ পর্বেই নাট্যকার কথক কেরামতের অতীত বর্ণনা করেছেন। কেরামতের জীবনের সাথে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প জড়িয়ে আছে। হিন্দু-মুসলিম 'রায়টে' নখলার নিরন্ন প্রান্তিক মানুষের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা বেদখল হয়ে যায়। দাঙ্গায় কেরামতের বাবা-মা মারা যায়। এরপর গ্রামের শক্তিশালী মুসলমান তালুকদার ও হিন্দু মহাজনের কূটচক্রান্তে কেরামত এবং সর্বহারা অধরচন্দ্র স্ব-গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়। কেরামতের যাত্রা শুরূ এই সাম্প্রদায়িকতার দোজখ থেকে। নাট্যকারের এই প্রতীক ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাজনকে ঘিরে। কারণ, ধর্মভিত্তিক ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। সেলিম আল দীন কেরামতমঙ্গল-এর কাহিনীবৃত্তের বাস্তবতার অন্তরালে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এঁকেছেন।

'চন্দ্রকোনা' দোজখ। নিজ গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে কেরামত আশ্রয় নেয় তার খালার বাড়ি চন্দ্রকোনা গ্রামে। এখান থেকে শুরু হয় কেরামত দর্শকের ভূমিকা। সে দেখে– খালাতো বোন নওশাদী বন্ধ্যাত্বের অভিযোগে স্বামীহারা হয়েছে। কিন্তু পেটের দায়ে তালুকদার বাড়িতে নওশাদী কাজ করতে গিয়ে গর্ভবতী হয়। তার পেটের সন্তান নষ্ট করা দেয়া হয়– গণেশ কবিরাজের ঔষধ দিয়ে। অতঃপর নওশাদী কলঙ্কিনীর অভিযোগ নিয়ে গ্রাম ছাড়া হয়। করমচা গাছের তলায় পুঁতে রাখা অপুষ্ট ভ্রূণটিকে কলাপাতায় মুড়ে নিয়ে আসে কেরামত। ভ্রূণটিকে কেরামত ইসলামি প্রথানুযায়ী কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তালুকদার তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকেও গ্রাম ছাড়া করে। নিঃস্ব কেরামতের সাথে মুচিপাড়ার সর্বহারা মানুষগুলোকেও উৎখাত করে জোতদার।

'ফইট্যামারি' দোজখ। এখানে সেলিম আল দীন তুলে ধরেছেন কলকাতা থেকে আসা জমিদার চুন্নু মিয়ার অত্যাচারের ইতিবৃত্ত। জমিদারের আগমন উপলক্ষ্যে খোসাল খান মহল জুড়ে নানা রঙের সাজগোজ দেখতে যায় কেরামত। উৎসুক দৃষ্টিতে কেরামত জমিদার বাড়ির সাজসজ্জা দেখলে গেলে জমিদারের লাঠিয়ালদের সাথে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে জমিদারের নির্দেশে সে শারীরিক নির্যাতন শিকার হয়। কেরামতের চোখে-মুখে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন। কেরামতের অন্তরে রয়েছে জমিদারদের বিরুদ্ধে 'দুইশো বছরের ঘৃণা।' ঘৃণা নিয়ে কেরামত মাঝরাতে ফইট্যামারি গ্রাম ছাড়ে। এসময় ছামেদ জিজ্ঞেস করে– 'কুনু যাবি তুই।' ছামেদের প্রশ্নের উত্তরে কেরামত জানায়– 'কুত্তার নগে থাকুম, গাছতলায় হুমু। জমিদারে দেহনের শখ আছাল, মিট্যাগেছে।'[৭] সামন্তবাদের নির্যাতনের অসামান্য চিত্র ফুটে ওঠে কেরামতের বক্তব্যে। এটি শুধু কেরামতের নিয়তি নয়, এটা মূলত প্রান্তিক জনজীবনের বাস্তবানুগ চিত্র।

'হিজড়া' দোজখ। কেরামতের সঙ্গে অল্পবয়সী এক হিজড়ার সাথে দেখা হয় মাঘ মাসের শীত-রাতে। হিজড়া নিজেকে কেরামতের কাছে মদিনা সুন্দরী হিসেবে পরিচয় দেয়। হিজড়া মদিনার ছলাকলায় কেরামত ভাঙা দালানে দুই টাকার বিনিময়ে তার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে চাইলে সে আবিষ্কার করে– মদিনা প্রকৃতপক্ষে নারী বা পুরুষ নয়। সঙ্গম ব্যর্থ কেরামত হঠাৎ করেই আরেক প্রাকৃতিক অসহায়ের প্রতি গর্জে ওঠে এবং বলে, 'দুইন্যার সব হুইয়ারের বাচ্চা– সব হুইয়ারের বাচ্চারা আমারে ঠক দিছে।'[৮] যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত হলে কেরামতের হৃদয় সমব্যথী হয়ে ওঠে হিজড়ার প্রতি। আত্মগ্লানিতে নিজেকে ধিক্কার দেয় কেরামত এবং হিজড়ার সাথে বসবাসের ইচ্ছা

---

[৭] সেলিম আল দীন, *কেরামতমঙ্গল*, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৩৯৫), পৃ. ২১৭।

[৮] সেলিম আল দীন, *কেরামতমঙ্গল*, পৃ. ২২০।

পোষণ করে। কিন্তু এরপর প্রকৃতির বিরুদ্ধে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে এবং আত্ম-যন্ত্রণায় নিরুদ্দেশ হয় হিজড়া। তখন সর্বহারা কেরামতের কণ্ঠে প্রাকৃতিক বৈরিতার শিকার মদিনার জন্য মমতাভরা কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে :

> দুকখিত মদিনারে আদর দেও বাবা, আর না অয় দেও, তোমার তারার ফুলকি আগুনে জালায়া দেও ঠকগো ঘর বাড়ী। না অয় দেও আমার এই পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচ সইলতা—এত দুখ যে সংসারে হে সংসারে আমি আগুন নাগায়া দেই।[৯]

প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেমন করবার কিছুই নেই মদিনার; তেমনি সামাজিভাবে বঞ্চিত মানুষ কেরামতের ব্যর্থ ক্ষোভ ও আত্মশ্লাঘা ছাড়া কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। মদিনা প্রাকৃতিকভাবে অসহায়; তার এই অসহায়ত্ব তাকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে আত্ম-মর্যাদা নিয়ে নিঃস্ব মদিনা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে।

'হাজং' দোজখ। কেরামত যেন এক পর্যটকের মতো বঙ্গভূমি ব্যাপী ঘুরে বেড়ায়। আর দেখে নানা ঘটনা ও দৃশ্যাদি। কেরামতের গমন পথের সামনে একসময় ভেসে ওঠে নৃগোষ্ঠী হাজংদের বসতি অঞ্চল। এখানে কেরামত আসে মূলত উদ্বাস্তু হয়ে। নাট্যকার সেলিম আল দীন জানিয়েছেন, স্বভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উদ্বাস্তু অবস্থায় এক বঞ্চিত মানুষের বেশে কেরামত হাজং বসতি এলাকায় আসে নতুন করে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে। সে চেয়েছিল হাজং সম্প্রদায়ের সাথে জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানেই গেরস্থি করতে। কেরামতের এই সদিচ্ছা হাজং সম্প্রদায়ের জানার কথা নয়। তারা তাকে বাঙালি গুপ্তচর সন্দেহে আটক করে এবং বেদম প্রহার করে। অবশ্য হাজং সম্প্রদায় তখন সংগ্রাম করছিল জমিদারের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে। হাজংরা জমিদারদের বিরুদ্ধে, খাজনার বিরুদ্ধে সর্বোপরি তাদের ওপর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়েছে। অবশ্য হাজং সম্প্রদায়ের সাথে জমিদারের বিরোধের আরেক কারণ হচ্ছে বাঙালিদের প্রতি হাজং সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস। কিন্তু এ সময় তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বজায় রাখতে পুলিশী নির্যাতন শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানি পুলিশের অত্যাচারের করুণ বিবরণ শুনে কেরামত অবশেষে নিজেও হাজংদের পক্ষাবলম্বন করে। ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় হলেও কেরামত ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হয় এবং হাজংদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকারের নির্যাতনের বিরম্নদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কেরামত পুলিশের হাতে বন্দী হয়। এটি মূলত বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের দোজখ।

'হাজত' দোজখ। হাজং সম্প্রদায়ের সাথে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিয়ে কেরামত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং বিনা বিচারে জেল হাজতে প্রায় আট বছর কাটায়। হাজতে বসে কেরামত অতীতের স্মৃতিচারণ করে আর মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে। হাজতে তার পরিচয় হয়– আজমত ডাক্তারের সাথে। ঘুস খাওয়ার অপরাধে পুলিশকে পিটিয়ে আজমত হাজত-বাস করছে। তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কেরামতের। আজমত তাকে আশ্বাস দেয়, তারা মুক্তি পেলেই কেরামতকে সে লেখাপড়া শেখাবে, কম্পাউন্ডার বানাবে এবং গারোদের দেশে গিয়ে দুজন মিলে বসতি গড়ে তুলবে। তারপর একদিন কেরামত 'হাজতের হাবিয়া দোজখ' থেকে মুক্তিলাভ করে এবং মুক্তির স্বাদ উপভোগ করার লক্ষ্যে কেরামত রওনা দেয় ময়মনসিংহের দিকে। হাজত খণ্ডের কাহিনী এভাবেই সমাপ্ত হয়েছে।

---

[৯] তদেব, পৃ. ২২১।

'চিগাস্থান' দোজখ। কেরামত এবারে এসে পৌঁছায় ময়মনসিংহে, এখানে সে ডাক্তার আজমতের কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজ শুরু করে। যে অঞ্চলে গারোদের বসতি তার নাম চিগাস্থান। নাট্যকার সেলিম আল দীন এ খণ্ডের কাহিনীতে মূল দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখিয়েছেন প্রাকৃতজনের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের দ্বন্দ্বকে। এখানে গারোদের সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত খ্রিস্টান মিশনারিরা। তারা গারো নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার অপচেষ্টায় রত। কিন্তু একদিন এই নিরন্ন মানুষগুলো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নব্য খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসীদের ওপর। অন্যদিকে কেরামতকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাদের দলের লোক বলে প্রচার করে। সর্বহারা কেরামত শৈশব থেকে ধর্মের নিষ্ঠুরতা দেখেছে; ফলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখে কেরামত ধর্মের প্রতি আরো বিরাগভাজন হয়ে ওঠে। তবে নিঃস্ব কেরামত এক পর্যায়ে প্রাকৃতজনের সাথে নিজের ঐক্য সাধন করে আদিবাসীদেরই পক্ষাবলম্বন করে। গারোদের চিগাস্থানে যখন ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ চরম আকার ধারণ করেছে, তখন কেরামত একদিন বেতারে শোনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঝিনাই নদীর ওপারে অবস্থান নিয়েছে, বঙ্গভূমি জ্বলে উঠেছে মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য। কেরামতও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়– পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির আশা নিয়ে।

'রাজাকার' দোজখ। পাকিস্তানিদের অপশাসন থেকে মুক্তির আশা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চায়। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসি ভাষণ সর্বহারা কেরামতকে যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে নিজের ভেতর শুনতে পায় কামানের গর্জন। সর্বহারা বাঙালির পক্ষে অবস্থান নেওয়া কেরামত যুদ্ধের এক পর্যায় রাজাকারদের হাতে বন্দী হয়। কেরামত সবসময় ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে, তাই সে পাকিস্তানি কমান্ডারের নির্দেশ মতো তাদের গুপ্তচর হতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বন্দী করে রাজকাররা। তার ওপর শারীরিক অত্যাচার-নির্যাতন করে রাজাকার বাহিনী। আবারো শুরু হয় কেরামতের বন্দী জীবন এবং মুক্তির প্রহর গুণে অপেক্ষা করার পালা। প্রান্তিক বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন দৃষ্টে কেরামতের মন যেন আপনা-আপনি গেয়ে ওঠে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়।' নিরীহ বাঙালি জাতির ওপর রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে নাট্যকার এ খণ্ডে স্বাধীনতাকামী মানুষের নরকযন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন।

'জলসুখা লঞ্চঘাট ও বিবাহ খণ্ড' নিরাশার দোজখ। দেশ স্বাধীন হলো একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। স্বাধীন দেশে কেরামতের জীবিকা চলে বই ফেরি করে। সদ্য স্বাধীন দেশের নানা সংকট নিয়ে কথা বলে কেরামত সাধারণ মানুষের সাথে। তাদের নিকট কেরামত শোনে– সোনা মিয়ার মাছের আড়তে মেয়েদের ওপর নির্যাতনের কথা। কেরামতের কানে আসে এক শারীরিক নির্যাতনের শিকার এক নারীর আর্তনাদ। নুরজাহানকে নিয়ে হাসপাতালে যায় কেরামত। নুরজাহানের পেটের বাচ্চাকে রক্ষা করতে না পারলে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচায় তাকে। নুরজাহানের ভ্রূণটি নদীর ধারে দাফন করে আর ভাবে কেরামত নওশাদীর যে ভ্রূণটি সে দাফন করতে পারেনি, সেই ভ্রূণের সাথে নুরজাহানের ভ্রূণটির মিলন ঘটে। স্বাধীন দেশে প্রান্তিকজনের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের দৃশ্য দেখে কেরামতের কাছে স্বাধীনতার অর্থই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। পরে সে নুরজাহানকে বিয়ে করে। শেষ পর্যন্ত নুরজাহান রক্তক্ষরণ জনিত কারণে মারা গেলে কেরামত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ তথা প্রান্তিক মানুষের নৈরাশ্যই একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে।

'কুসুমপুর' দোজখ। কেরামত রওনা দেয় নুরজাহানের লাশ নিয়ে কুসুমপুরের উদ্দেশ্যে। মৃত স্ত্রীর পাশে বসে কেরামত অনর্গল কথা বলতে থাকে। কেরামতের এই আহাজারিতে প্রাকৃতজনের জীবনসত্য প্রকাশ পেয়েছে এভাবে– 'এইটা সুখের নাও না, গুদারা না, এইটা দুঃখের নাও, এ নাওতে বেরাঙ্গনার লাশ এই লাশ কুসুমপুরে যায়।'[১০] ধর্ষিতা বীরাঙ্গনার কথা শুনে নদীর ধারের সাধারণ মানুষ সমবেদনা জানায়; আর কেরামত ভাবে চিরকাল সোনামিয়ারা টিকে থাকে তারা মরে না, 'নইলে কি ভুরুণ খসে গবভপাত অয়– দুলদুলের শইল্যে একশ এট্টা তীর হান্দায়– থুক থুক– সোনামিয়ারে থুক– জয়বাংলারে থুক; দোজখের গণ্ডীর শ্যাষ নাই সংসারে।'[১১] কেরামতের এই আত্মদহনই প্রাকৃতজনের নিকট স্বাধীনতার স্বাদ। অর্থাৎ স্বাধীনতার সুফল প্রান্তিকজনের নিকট পৌঁছেনি। 'কুসুমপুর' খণ্ডে অর্থহীন স্বাধীনতার নরকযন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

'চানতারা' দোজখ। কেরামত এরপর গমন করে চানতারা গ্রামে। এখানে এসে সে জানতে পারে আহত মুক্তিসেনার মুখে– স্বাধীনতা বাংলাদেশ তাদের (প্রান্তিকজনের) জীবনে কোনো সুখ বয়ে আনেনি। কেরামত চানতারা গ্রামে আশ্রয় পায় নেতাই ফকিরের ঘরে। এখানে শোনে নেতাই ফকিরের মেয়ে শমলার করুণ জীবন-কাহিনী। গোসল করতে গিয়ে কানের দুল হারিয়ে ফেলার অপরাধে স্বামী ও শ্বশুরের হাতে নির্যাতনে শিকার হয়। এই সামান্য অপরাধে তাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। একদিকে অপ্রকৃতস্থ মেয়ে শমলা সুস্থ হতে চায়। অন্যদিকে নেতাই ফকিরের ছেলের ছোভান ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হয়। এর মধ্যে একদিন জানাজানি হয়, পাগলা বসিরের সন্তান শমলার গর্ভে। এমতাবস্থায় শমলার বাবা নেতাই ফকির সামাজিক মেয়েকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে ভ্রূণ হত্যার পরিকল্পনা করে, কিন্তু বাধা দেয় কেরামত। নেতাই মেয়ের গলা টিপে ধরলে নিরুপায় কেরামত বাধ্য হয়ে শমলার গর্ভপাতের ঔষধ দেয়। কিন্তু পরদিন কেরামতের ওপর চাপানো হয় বসিরের কৃতকর্মের দায়। এই অপরাধে কেরামতকে ছেঁড়া জুতো গলায় পরিয়ে এবং দু'চোখ অন্ধ করে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক ইডিপাস যেভাবে নিজ রাজ্য থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিল অনিচ্ছাকৃত পাপের দায়ে; অনুরূপভাবে গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক ইডিপাসের মতো কেরামত বিতাড়িত হয় চানতারা গ্রাম থেকে।[১২]

কেরামতের চারপাশে কৌতূহলী গ্রামবাসীর ঢল, বিনা অপরাধে তাকে কন্যাপ্রতিম শমলার অবৈধ গর্ভের দায়ে শাস্তি দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু কেরামত আরো শাস্তি চায়, কারণ সে রক্ষা করতে পারেনি শমলার ভ্রূণ। নাট্যকার যেন এই ভ্রূণহত্যার মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলেন কেরামতের নরকবাসের যন্ত্রণা। '[...] কেরামত তার বোন নওশাদীর, তার বউ নূরজাহানের কিংবা তার কন্যাপ্রতিম শমলার ভ্রূণরক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভ্রূণনষ্টের মধ্যেই যেন ভাষা পায়

---

[১০] তদেব, পৃ. ২৭৬।

[১১] তদেব, পৃ. ২৭৬।

[১২] গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের থীবীর রাজা ইডিপাস ছিলেন দেবতার হাতের ক্রীড়নক। চেষ্টা করে অনিবার্য নিয়তি এড়াতে চেয়েও ইডিপাস ব্যর্থ হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত থীবীর নাগরিকবৃন্দের সামনে তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপের ইতিকথা প্রকাশ হয়ে পড়লে, তিনি নিজেরই তার দু'চোখ অন্ধ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান। কিন্তু সেলিম আল দীনের সৃষ্ট কেরামত পাপ না করেও শাস্তি পেয়েছে এবং তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে চানতারা গ্রামবাসী।

নরকবাসের অভিজ্ঞতা, এবং ভ্রূণরক্ষার আকুলতার মধ্যেই নরক থেকে বেরিয়ে আসার পথ।'[১৩] অপরাধ না করেও কেরামত শাস্তি ভোগ করেছে। অথচ সেই শাস্তির চেয়েও তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে শমলার ভ্রূণহত্যার যন্ত্রণা। এজন্য কেরামত আরো শাস্তি চায়, আরো শারীরিক আঘাতে-যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে। তথাপি অপরের জন্য কেরামতে কণ্ঠে আশীবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয় : 'আদম সুরত বেবাক মায়ের গব্‌ভে শক্তি দিক– আরাম দিক। শমলার পোলা য্যা ফিরা আহে নানার ভিটায়।'[১৪] শমলার ভ্রূণ রক্ষা করতে না পারার যে যন্ত্রণা তা নাট্যকার নরকযন্ত্রণার সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কেরামত ভ্রূণহত্যার মতো নরকযন্ত্রণা এ নাটকের এগারোটি খণ্ডেই ভোগ করেছে। কিন্তু এর প্রতিকার করতে পারেনি, সে যেন শুধুই এক দর্শক। অনিবার্য নিয়তিই যেন তাকে টেনে নিয়ে যায় নরকের পথে। এভাবেই কেরামত এ নাটকে একের পর দোজখ অতিক্রম করে এবং শেষপর্যন্ত দর্শক হয়েও সমগ্র কাহিনীর ট্র্যাজিক হিরো হয়ে উঠেছে।

উপসংহার

কেরামতমঙ্গল-এ সেলিম আল দীন সর্বমোট ৭০টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সফলভাবে। এ নাটকের নায়েব, চুন্ন মিয়া এবং উডওয়ার্ড ছাড়া বাকি ৬৭টি চরিত্রই প্রান্তিকজন। নাটকের অনেক চরিত্রের মিছিলে কেরামতের অবস্থান একাধারে কথক ও নায়কের। জনম দুঃখী কেরামত যেন সাত দোজখ প্রদক্ষিণরত এক মহান চরিত্র। কেরামত মহান মানুষের রূপান্তরিত চরিত্র স্বরূপ। তাই সবার জন্যই দরদ, সকলের জন্যই তার অন্তর কেঁদে ওঠে। *কেরামতমঙ্গল*-এ বিভিন্ন সময়-প্রেক্ষিতে ক্লান্তিহীন পর্যটক কেরামতের সর্বহারা জীবনাভিজ্ঞতায় সমাজজীবনের শোষণের চালচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সেলিম আল দীন এ নাটক সম্পর্কে উল্লেখ করেন : 'যে এই নাটক দেখে– সামাজিক মঙ্গল সাধনে সে যেন তৎপর হয়। অন্যায় অবিচারের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে এই নাটক দেখে সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রূণের জন্য যেন সে মমতার হাত বাড়ায়। মানব জনমকে সামাজিকগণ যেন স্বাগত জানায়। এই নাটক দর্শনে বন্ধ্যা নারী যেন ফলবতী হয়।'[১৫]

কেরামত বঙ্গভূমির সকল বঞ্চিত দুস্থ নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। কেরামত তাই কখনো দাঙ্গাবিধ্বস্ত কৃষক, কখনো ক্লীব হিজড়ার সঙ্গী, বিদ্রোহী হাজং সম্প্রদায়ের অধিকার আন্দোলনের মিছিলে, গারোদের বন্ধু, বারাঙ্গনার দয়িত, কিংবা ভ্রূণনষ্ট করা হতভাগিনীর পিতা। নাট্যকাহিনীতে এসব কেরামতকে ঘিরে উন্মোচিত হয়েছে দেশ-কালের চিরন্তন মনুষ্যত্ববোধ ও আদর্শ। এই আদর্শের তাড়নায় কেরামত বোন নওশাদীর, স্ত্রী নুরজাহানের ও কন্যাপ্রতিম শমলার ভ্রূণরক্ষার প্রচেষ্টা চালায়। নাট্যকার কেরামতের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভ্রূণহত্যার যন্ত্রণাকে নরকবাসের সমতুল্য করেছেন। অন্যদিকে ভ্রূণরক্ষার আদর্শিক প্রয়াসে নিহিত আছে নরকযন্ত্রণা থেকে পান্থ কেরামতের আত্মমুক্তির বেরিয়ে আসার উপায়। তার মানবিক বোধ, মানসিক কারুণ্য, অপরের প্রতি সহানুভূতি– কেরামতের সর্বস্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্য– তার সঙ্গিনী হিজড়া, সেই

---

[১৩] অরুণ সেন, *সেলিম আল দীন : নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র* (বগুড়া : দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ৪৪।

[১৪] সেলিম আল দীন, *কেরামতমঙ্গল*, পৃ. ২৭৬।

[১৫] সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র*-২, পৃ. ৩০৬ (কেরামতমঙ্গল : ১২, পরিশিষ্ট : ক)।

ক্লীবের জন্যও তার সমবেদনা; তার স্ত্রী ধর্ষিতা মুমূর্ষু এক নারী, শেষপর্যন্ত স্ত্রী মারা গেলে তার মৃতদেহ নিয়ে কেরামতকে নৌকা ভাসাতে হয় কুসুমপুরের উদ্দেশ্যে। কন্যাপ্রতিম মেয়ে শমলার ভ্রূণরক্ষার ব্যর্থতায় গর্ভপাতের দায় তাকেই বহন করতে হয়।

কেরামতমঙ্গল-এর জনতার লাঞ্ছনা কেরামতকে করে তুলেছে একালের যীশু। স্বশ্রেণীর দুঃখ-কষ্ট আপন অঙ্গে ধারণ করে কেরামত যেন যীশুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কেরামত গ্রামবাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। পান্থ কেরামতের অভিজ্ঞতায় নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেন : দোজখ বা নরক সাত কিংবা এগারো নয়, অসংখ্য। কেরামতের ভাষায় : 'যত লোম্বার কূপ তত দোজখ।' তারপর সেলিম আল দীন এ নাটকে কেরামতের যাত্রাপথে পূর্ণিমার চাঁদ, দূরে চৈত্রসংক্রান্তির ঢোলের বাজনায় নতুন সম্ভাবনার প্রতীক নির্মাণ করেছেন। এসব প্রতীকে মানবজীবনের নবউদ্যমে জেগে ওঠার আহ্বান ইঙ্গিতে আভাসিত হয়েছে। বলার অবকাশ রাখে না যে, মহান দ্রষ্টা পান্থ কেরামত স্বয়ং প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। কেরামত সমাজজীবনের দোজখ স্বরূপ পাপ-পঙ্কিলতার ভিতর দিয়ে যে পথ অতিক্রম করেছে তার মধ্য দিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছে নতুন এক সমাজে। তার এই পথ-পরিক্রমায় আছে নবজীবনের প্রত্যাশা। কেরামত না পারলেও তার উত্তরসূরিগণ হয়তো একদিন ঠিকই এই নরকপ্রতিম জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

বাংলাদেশে শেখ সাদীর কাব্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা

মোঃ ওসমান গনী*

Abstract: Shaikh Sadi (1191-1291) was the most brilliant, distinguished, acknowledged and popular ethical poet in Persian literature. He is also called the 'Master of both prose and verse'. Its were highly appreciated and much admired by many eminent poets and authors in Bangladesh, who followed the translation lead and produced their poems and books in imitation of Sadi's poetry. In this article the author tried to discuss about the appreciation translation and admiration of Shaikh Sadi's poetry in Bangladesh.

ভূমিকা

শেখ সাদী ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বিশ্বসাহিত্য পরিমণ্ডলেরও একজন অমর কবি।[১] সাদী শিরায নগরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কালজয়ী প্রতিভা বিশ্বের কোনো আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ছিল সবার কাছে গ্রহণীয় সু-উচ্চ প্রতিভা, যা এশিয়া ইউরোপসহ সারা বিশ্ববাসীকে সুপথের সন্ধান দিয়েছে। শেখ সাদী একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁর গ্রন্থাদি দেশ, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং পঠিত হয়ে আসছে।[২] তাঁর অমর *বুস্তান* (بوستان) ও *গুলিস্তান* (گلستان) গ্রন্থদ্বয় বাংলা ভাষায় বহুবার অনূদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁর গ্রন্থদ্বয় পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। এদেশের কবি সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের মানুষের নিকট শেখ সাদী ও তাঁর কাব্য যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তা আলোচনা করাই হচ্ছে উক্ত প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

---

* ড. মোঃ ওসমান গনী, সহকারী অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. J. A. Boyle, *The Cambridge History of Iran*, voll.5 (Cambridge: University Press, 1968), p. 600.

২. নাজিম উদ্দিন ভূঁইয়া, *হযরত শেখ সা'দী রহ.* (ঢাকা: দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫), পৃ. ৩।

শেখ সাদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শেখ সাদীর মূল নাম-'মুসলেহ', উপাধি- 'মোশাররফ উদ্দীন' এবং কাব্যনাম 'সাদী'।[৩] তিনি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রি.) ইরানের শিরায নগরে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতা মাইমুরা খাতুন। পিতার তত্ত্বাবধানে থেকেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতাকে হারান।[৫] এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন এবং নিযামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। নিযামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও তাসাওউফ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।[৬]

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে সাদী দেশ ভ্রমণের বাসনায় বেরিয়ে পড়েন। তিনি ১২২২-১২২৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং সিরিয়া, দামেশ্‌ক, হেজাজ, লেবানন, রোম, মক্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের শহরসমূহ পরিভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এর পর তিনি কাশ্‌গর, নাজাফ, কারবালা, হিন্দুস্তান এবং তুর্কিস্তানও ভ্রমণ করেন।[৭] দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর শেখ সাদী ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মভূমি শিরায নগরীতে ফিরে আসেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শিরায নগরে এসে তিনি সর্বদা কাসিদা ও গযল রচনা এবং ওয়াজ-নসিহতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। শেষ জীবনে তিনি স্বীয় খানকায় অবস্থান করতেন এবং সেখানেই তিনি ১২৯১ মতান্তরে ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৮]

সাদীর জীবনের দীর্ঘকাল সময় সফরে অতিবাহিত হলেও তিনি ফারসি সাহিত্যে বিশাল অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন হল তাঁর 'সাদী নামে' (سعدی نامه) যা পরবর্তীতে 'বুস্তান' (بوستان) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৯] তিনি ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন।[১০] 'বুস্তান' গ্রন্থটিকে তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এ কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ে কবি বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলি তুলে ধরেছেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একাধিক গল্প বর্ণনার মাধ্যমে সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেছেন। তাঁর এ কাব্য আলাদাভাবে এবং 'কুল্লিয়াতে সাদী' (সাদীর রচনাবলী) রূপে বহুবার

---

৩. মুহাম্মাদ জাফর ইয়াহকী, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (ইয়েক ও দো) (তেহরান: চাপখানেয়ে শেরকাত, ১৯৯৯), পৃ. ১৭০।

৪. E. G. Browne, *A Literary History of Persian Literature*, voll.ii (Cambridge: University press, 1969), p. 526; আবদুস সাত্তার, *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯), পৃ. ২৫০।

৫. *The Cambridge History of Iran*, voll-5, p. 595.

৬. মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: নিগারিশাত, তা.বি.), পৃ. ৪৩৭; W. G. Aroher and G.M. Wickens, *The Gulistan of Sadi* (New York: Capricorn Books, 1964), pp. 34,35; *A Literary History of Persian Literature*, voll.2, p. 528.

৭. পারভেজ আতাবেকী, *বারগুযিদে ওয়া শারহে আছারে সা'দী* (তেহরান: নাশরে পাজুহেশে ফারযান, ১৯৯৬), পৃ. ৬।

৮. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৯।

৯. হাসান আনওয়ারী, *গুরীদেহ ওয়া বিকারার দার বারেয়ে যিন্দেগী ওয়া আছারে সা'দী* (তেহরান: নাশরে কাতরে), পৃ. ১৮।

১০. *গুরীদেহ ওয়া বি কারার দার বারেয়ে যিন্দেগী ওয়া আছারে সা'দী*, পৃ. ১৭।

প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ফারসি কাব্যসাহিত্যে শেখ সাদীর অন্যান্য অবদানগুলো হলো: কাসায়েদ, দিওয়ানে গাযালিয়াত, মারসিয়া, সাহেবিয়া, খাবিছাত (বিদ্রুপাত্মক কবিতা), রুবা'ঈ (চতুষ্পদী কবিতা), মাসনাবি, কেতয়াত ও মুফরাদাত।[১১]

শেখ সাদী (রহ.) শুধু ইরানের প্রথম সারির কবিদের অন্যতমই ছিলেন না, বরং গদ্য লেখক হিসেবেও তিনি সমান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর চিরঞ্জীব গদ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'গুলিস্তান' (گلستان) গ্রন্থখানা অন্যতম। তিনি ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এ গদ্য গ্রন্থখানা রচনা করেন।[১২] ফার্সী গদ্যসাহিত্যে সাদীর অন্যান্য অবদানগুলো হলো- মাজালিসে পাঞ্জেগানা, রেসালে দার আকল ও ইশক, নাসিহাতুল মুলুক ও তাকরিরাতে ছালাছা।[১৩]

বাংলাদেশে শেখ সাদীর কাব্যচর্চা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা বিজয় করেন।[১৪] তাঁর এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাল্‌খ ও মাওয়ারা-উন-নাহার (Transoxania- উজবেকিস্তানের পুরাতন নাম) এলাকার মুসলিম বণিক, সুফি-সাধক ও আওলিয়াগণ ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন এবং বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের অধিকাংশের মাতৃভাষা ছিল ফারসি। তারা ছিলেন ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যার ফলে ফারসি ভাষা এ উপমহাদেশের মানুষের প্রাণের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর এ ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এতে মানুষ ফারসি ভাষা-ভাষী কবি-সাহিত্যিক এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মের সাথে খুব সহজেই পরিচিত হয়ে উঠে।[১৫] বিশেষত তারা ফেরদৌসির *শাহনামা*, ওমর খৈয়ামের *রুবাইয়াত*, হাফিযের *দীওয়ান*, আত্তারের *পান্দনামা*, মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মাসনাবি শরিফ* এবং নীতিশাস্ত্রীয় কবি শেখ সাদীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থের সাথে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে।[১৬]

১৮৩৭ সালে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ফারসিকে বাতিল করলেও অদ্যাবধি বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাদীর গ্রন্থাবলী পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। কবি-সাহিত্যিকসহ দেশের শিক্ষিত সমাজ সাদীর নৈতিক গ্রন্থাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আবার অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁর গ্রন্থাবলীকে পদ্যরীতিতে আবার অনেকে গদ্যরীতিতে অনুবাদ করেছেন। যা বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দান করেছে। এছাড়া এ দেশের আলেম সমাজ ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলে শেখ সাদীর নৈতিক গ্রন্থ *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* হতে উদ্ধৃতি প্রদান করেন এবং এর বহু পংক্তি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নিজেদের বক্তব্যকে শানিত

---

১১. আল্লামা শিবলী নোমানী, *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড (লাহোর: ইশরাত পাবলিশিং হাউস, তা.বি.), পৃ. ৪৪-৪৫।

১২. *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৫১২।

১৩. *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৫।

১৪. মুহাম্মদ কালীম সাহসারামী, *খেদমতগুযারানে ফার্সী দার বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৯), পৃ. ১।

১৫. কারীম আতা বারক, "তারাজেমে আসারে ফার্সী বে যাবানে বাঙ্গালী", *কান্দে পার্সী*, সংখ্যা ৬, ১৯৯৩ (নয়া দিল্লী), পৃ. ৮৮।

১৬. আলী আভারসাজী (সম্পা.), *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৮), পৃ. ভূমিকা।

করার লক্ষ্যে তুলে ধরেন। বিশেষ করে তাঁর *গুলিস্তান* গ্রন্থের নিম্নোক্ত অমর পংক্তি দুটি ছাড়া আজও যেন আমাদের ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল সম্পন্ন হয় না।[১৭]

بلغ العلى بكماله　　كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله　　صلوا عليه و اله[১৮]

'তিনি (মহানবী স.) চারিত্রিক পরিপূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন
যাঁর সৌন্দর্যের আলোকছটায় অন্ধকার দূরীভূত করেছেন।
তাঁর ব্যবহার ছিল সৌন্দর্যের উৎসমূল
সকলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ পাঠ কর।'

বাংলা কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে যিনি শেখ সাদীর কাব্যের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার[১৯] (১৮৩৪-১৯০৭ খ্রি.)। সাদীর *গুলিস্তান* (گلستان) গ্রন্থ এ কবিকে দান করেছিলো এক প্রকারে স্বস্তি। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে (সাদী) নীতি কবিতার অনুসরণীয় ব্যক্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন।[২০]

যেমন শেখ সাদী অপব্যয়ের কুফল সম্পর্কে বলেছেন:

ابلهی کاو روز روشن شمع کافوری نهد
زود بینی کشی بشب روغن نماند در چراغ.[২১]

---

১৭. *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০।

১৮. মোহাম্মদ আলী ফরুগি (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াতে সা'দী* (তেহরান: এনতেশারাতে রামীন, ১৯৮৯), পৃ. ২৯।

১৯. কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার: তিনি ১৮৩৪ সালে খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার সেনহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মানিকচন্দ্র ওরফে মহেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুলে লেখাপড়া করেন। তিনি ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। কর্মজীবনে কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে বরিশালের কীর্তিপাশা বাঙলা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, পরে ঢাকা নর্মাল স্কুল ও ঢাকা কলেজের জুনিয়র পণ্ডিত, বাগেরহাটের পিলজঙ্গ নওয়াপাড়া ইংরেজি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত এবং পরে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৬০ সালে প্রথমে মাসিক *মনোরঞ্জিকা* ও পরে মাসিক *কবিতা কুসুমাবলী* প্রকাশ করেন। এরপর ১৮৬১ সালে সাপ্তাহিক *ঢাকা* ১৮৬৫ সালে সাপ্তাহিক *বিজ্ঞাপনী*, ১৮৮৬ সালে মাসিক *দ্বৈভাষিকী* প্রকাশ করেন। তিনি ১৯০৭ সালে শ্লেষ্মাঘটিত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মধ্যে *সদ্ভাবশতক* (১৮৬১), *মোহঃভাগ* (১৮৭১), *রা-সের ইতিবৃত্ত* (১৮৬৮) ও *কৈবল্যতত্ত্ব* (১৮৮৩) অন্যতম। তিনি ফারসি কবি হাফিয শিরাযি ও নীতি কবি শেখ সাদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন। দ্র. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৯-৫১।

২০. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৫১।

২১. মোহাম্মদ আলী ফরুগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পৃ. ৪৯।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর *অপব্যয়ের ফল* কবিতায় উপরিউক্ত পংক্তিটির কাব্যানুবাদ করেছেন এভাবে:

'যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশুগৃহে তার দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।'[২২]

নৈতিক কবি সাদী গীবত বা পরনিন্দা হতে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে বলেছেন:

هرکه عیب دگران را پیش تو آورد و شمارد
بگشا عیب تو پیش دیگران خواهد برد.[২৩]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর *নিন্দুক* কবিতায় সাদীর প্রতিধ্বনি করে বলেন:

'পরদোষ তোমার নিকট যে কয়,
বলে সে তোমার দোষ অপরে নিশ্চয়।'[২৪]

নৈতিক কবি সাদী গরিব-দুঃখীর দুঃখে সমব্যথী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেছেন:

تندرستان را نباشد درد ریش جز همدردی نگویم درد خویش
گفتن از زنبور بی حاصل بود بایکی در عمر خود نا خورده نیش
تا ترا حالی نباشد همچو ما حال ما باشد ترا افسانه پیش
سوز من با دیگری نسبت مکن او نمک بردست و من بر عضو ریش.[২৫]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর *সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না* শীর্ষক কবিতায় সাদীর এই কবিতার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন:

চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?
যতদিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।[২৬]

---

২২. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৫৩।
২৩. মোহাম্মদ আলী ফরুগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পৃ. ২৪৪।
২৪. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৬০।
২৫. মোহাম্মদ আলী ফরুগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পৃ. ৪২।
২৬. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৭৩।

কবি শেখ সাদী অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সাদী তাঁর *গুলিস্তান* গ্রন্থে ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন। সাদীর ভাষায়:

حکایت: "هرگز از دور زمان ننالیده‌ام و روی از گردش آسمان در هم نکشیده‌ام مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم به جامع کوفه در آمدم تنگ دل یکی را دیدم که پای نداشت سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم."[২৭]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শেখ সাদীর উল্লিখিত গল্পের কাব্যরূপ দিয়েছেন এভাবে:

একদা ছিল না জুতো চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় বন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপিচুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি তথা একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ?[২৮]

বাংলা সাহিত্যের আরেকজন খ্যাতিমান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[২৯]। তিনিও সাদীর কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। শেখ সাদী ভদ্রলোকের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে তাঁর *বুস্তান* গ্রন্থে গল্প বর্ণনা করে বলেছেন:

سگی پای صحرا نشینی گزید — به خشمی که زهرش ز دندان چکید
شب از درد بیچاره خوابش نبرد — به خیل اندرش دختری بود خرد
پدر را جفا کرد و تندی نمود — که آخر تو را نیز دندان نبود؟
پس از گریه مرد پراگنده روز — بخندید کای مامک دلفروز
مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش — دریغ آمدم کام و دندان خویش
محال است اگر تیغ بر سر خورم — که دندان به پای سگ اندر برم[৩০]
توان کرد با ناکسان بدرگی — ولیکن نیاید ز مردم سگی.

---

২৭. গুরগানী (সম্পা.), *গুলিস্তানে সা'দী*, পৃ. ১৭৭।

২৮. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৭৩।

২৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত: কবি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রজনীনাথ এবং পিতামহ অক্ষয়কুমার। শৈশবে তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কবি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে কয়েক বছর পড়ালেখা করেন। ১৮৯৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরাম বসুর সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৯৯ সালে কবি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর একই বছর 'এনট্রান্স' ও ১৯০১ সালে এফ.এ. পাশ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি কনকলতাকে বিবাহ করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে *মণি-মঞ্জুষা*, *বেণু ও বীণা*, *তীর্থ-সলিল*, *কুহু ও কেকা* এবং *বিদায় আরতি* উল্লেখযোগ্য। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২২ কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অলোক রায় (সম্পা.), *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ. ১৭-২৯।

৩০. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পৃ. ১২৩-১২৪।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নৈতিক কবি সাদীর গল্পকে তাঁর 'অধম ও উত্তম' কবিতায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। কবির ভাষায়:

কুকর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে
বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায়
জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা-ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,
'তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে?
তোমার কি নেই দাঁত?'
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল
'তুইরে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়
দংশি কেমন ক'রে?
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা' ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়।[৩১]
(মণি-মঞ্জুষা)

বাংলাভাষী কবি-সাহিত্যিক শেখ সাদীর কাব্যের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন যে, বাংলায় শেখ সাদীর অনেক জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তান' গ্রন্থের অনেক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর নৈতিক গল্পসমূহ হতে নির্বাচিত গল্প-সংকলন গ্রন্থাকারে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। যা বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দান করেছে। সাদীর 'গুলিস্তান' গ্রন্থের সবচেয়ে সুন্দর এবং পরিপূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শায়খ সাদী (রহ.)-এর গুলিস্তাঁ'। যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা হতে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এ বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ২৭৫ পৃষ্ঠা সংবলিত। শুরুতে তিনি পাঁচ পৃষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। তারপর তিনি শেখ সাদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেছেন। এরপর *গুলিস্তান* গ্রন্থের গল্পগুলোর সরল বঙ্গানুবাদ এবং কবিতাগুলোকে ছন্দাকারে অনুবাদ করেছেন। নমুনাস্বরূপ তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা হতে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো, যাতে গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

---

৩১. *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৭।

"বুস্তাঁ সম্পূর্ণ পদ্য ছন্দে লেখা; কিন্তু গুলিস্তাঁ গদ্য গ্রন্থ হলেও প্রত্যেক বিষয়বস্তুর সারগর্ভ শিক্ষা ও উপদেশ প্রবাদ বাক্যের মত বিভিন্ন ছন্দে গাঁথা। দীর্ঘ আট শত বছর ধরে গ্রন্থ দুটো ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও আসামের মক্তব-মাদ্রাসাসমূহের প্রাথমিক পর্যায়ে মানবতা বিকাশের লক্ষ্যে অপরিহার্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হয়ে আসছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় 'গুলিস্তাঁ' ও বুস্তাঁর ন্যায় আর কোন বই এত বহুলভাবে অনূদিত, প্রচারিত ও প্রসারিত হয়নি। বই দুটোকে কবি ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার মাধুর্যে, শব্দ যোজনার সৌন্দর্যে ও ভাবের প্রাচুর্যে এমনভাবে সুসজ্জিত করেছেন যে, তা বিশ্বের সাহিত্যামোদী সকল মানুষের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কবি হিসেবে শায়খ সাদী এবং কাজ হিসেবে গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়।"[৩২]

মোবারক আলীর কাব্যানুবাদের নমুনা: যেমন কবি শেখ সাদী অসৎ সঙ্গ অবলম্বনের কুফল সম্পর্কে বলেছেন:

ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری
با فرومایه روزگار مبر کزنی بوریا شکر نخوری.[৩৩]

মেঘ যদি অমৃত বারি করে বরিষণ॥
ঝাউ গাছে ফুল নাহি ধরিবে কখন॥
ইতর সংসর্গ সদা করহ বর্জন॥
নল খাগড়া হতে চিনি পাবে না কখন॥[৩৪]

সাদীর *গুলিস্তান* গ্রন্থের আরেকজন খ্যাতিমান অনুবাদক হলেন জনাব এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান। তাঁর গ্রন্থের নাম *গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ*। যা বরিশাল হতে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি *বুস্তান* গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম *বোস্তাঁর বঙ্গানুবাদ*। যা ১৯৯০ সালে বরিশাল হতে প্রকাশিত হয়। জনাব আইয়ুব বিন মঈন-এর *বুস্তান* গ্রন্থের অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম *সহজ বোসতাঁ* (ফারসি-বাংলা)- যা ১৯৯৪ সালে আল কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি সাদীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর পর ফারসি বয়াতের পাশাপাশি সরল বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং পাদটীকায় পংক্তিগুলোর শব্দার্থ সংযোজন করেছেন। যা সাদীর *বুস্তান* গ্রন্থকে সহজবোধ্য করে তুলেছে।

---

৩২. মোহাম্মদ মোবারক আলী, *শায়খ সা'দী (রহ.)এর গুলিস্তাঁ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. অনুবাদকের কথা (ছয়-সাত)।

৩৩. মোহাম্মদ আলী ফরুগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পৃ. ৪১।

৩৪. *শায়খ সা'দী (রহ.)এর গুলিস্তাঁ*, পৃ. ৮।

শেখ সাদীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থকে একত্রে অনুবাদ প্রকাশ করেন মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান খান।[৩৫] এটি ২০০৫ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে সাদীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর পর বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও গল্পসূচি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর *গুলিস্তান* গ্রন্থের কবিতাগুলোকে বাংলা উচ্চারণসহ অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি *বুস্তান* কাব্য গ্রন্থের গল্প বা কাহিনী বহির্ভূত কবিতাগুলোকেও বাংলা উচ্চারণসহ সরল অনুবাদ করেছেন। শেখ সাদীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থে উল্লিখিত নৈতিক শিক্ষা সংবলিত হেকায়েত বা গল্পগুলোও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে- যা বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দান করেছে। জনাব মোঃ আশরাফ উজ্জামান *শেখ সাদীর ১০০ গল্প* নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি আল এছহাক প্রকাশনী, ঢাকা হতে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক *শেখ সাদীর শ্রেষ্ঠ ১৬১ গল্প* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটি মদীনা একাডেমী, ঢাকা হতে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে শেখ সাদীর জীবনী ও সাহিত্যকর্মমূলক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। এর মধ্যে মোঃ নাজিম উদ্দিন ভূঁইয়া রচিত *হযরত শেখ সাদী (রহ.)* গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থটি ১৯৭৮ সালে তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। লেখক এখানে সাদীর জীবনবৃত্তান্ত, সাহিত্যকর্ম এবং মূল্যায়নধর্মী আলোচনা করেছেন। এছাড়া মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন রচিত *ইরানের কবি* (১৯৭৮), আব্দুল মওদুদ রচিত *মুসলিম মনীষা* (১৯৯৪), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত *পারস্য প্রতিভা* (১৯৭৯), আব্দুস সাত্তার রচিত *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (১৯৭৯) এবং ড. হরেন্দ্র চন্দ্রপাল কর্তৃক প্রণীত *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৫৩) গ্রন্থে শেখ সাদীর জীবনী ও সাহিত্যকর্মের উপর মূল্যায়নধর্মী আলোচনা স্থান পেয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত গবেষক ও সাহিত্য সাধক জনাব আলী আহমদ তাঁর *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (১৯৮৫) গ্রন্থে শেখ সাদীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে রচিত কতকগুলো প্রকাশিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

উপসংহার

ফারসি কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে কবি শেখ সাদীই হচ্ছেন বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ফারসি ভাষার কবি। তাঁর বিখ্যাত *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* নৈতিক গ্রন্থ দু'টি এ দেশের কবি সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়পটে স্থান করে নিয়েছে। যা কবি শেখ সাদীকে সাহিত্য জগতে অমর করে রেখেছে। বর্তমান যুব সমাজকে দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ ও নীতিবোধে উজ্জীবিত করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গ্রন্থ দু'টির গুরুত্ব অপরিসীম—যা মানুষের ব্যক্তিজীবন,

---

৩৫. মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান খান, অধ্যক্ষ, চাঁদপুর আহমাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, সচিব, মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র, চাঁদপুর সদর, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন, চাঁদপুর, জেলা শাখা।

৩৬. আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১০-৭৮৭।

পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত পথ নির্দেশক। গ্রন্থ দু'টির যথার্থ অনুসরণ একজন মানুষকে সৎ, আদর্শ ও নান্দনিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে সহায়তা করবে। তাই আমি মনে করি যে, শেখ সাদীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* শীর্ষক নৈতিক গ্রন্থ দু'টি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে ব্যাপক পঠন-পাঠন এবং উচ্চ পর্যায়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

সংস্কৃত প্রকরণ কাব্যের উদ্ভব ও উপযোগিতা

বিপুল কুমার বিশ্বাস*

Abstract: New types of literature with distinctive subject-matter and art of representation emerge with the new demands of time. In this respect, Sanskrit Prakarana has its own special characteristics. Among ten Rūpakas (drama) the second one is Prakaraa. There the poet has sketched the social life of mass people avioding the famous personalities and and the public expectation has been evaluated. In this consideration, Prakaraa is more successful than Vedas, Vedantas, Dharamaśastras, etc.

সূচনা

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে, কাব্য ও সাহিত্য পরস্পর সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ ছন্দোযুক্ত হোক বা ছন্দোমুক্ত হোক, কবির যে কোন রচনাই কাব্য বা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে এই কাব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শুধুমাত্র শ্রবণ-বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ কাব্যই শ্রব্যকাব্য, আর শ্রবণের পাশাপাশি কুশীলবের অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপরূপী যে কাব্য রঙ্গমঞ্চে দেখা সম্ভব, তার নাম দৃশ্যকাব্য। এক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে কাব্যগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে রূপায়িত হয়, তাই দৃশ্যকাব্যের অপর নাম রূপক (ইংরেজি 'Drama' অথবা বাংলা 'নাটক' শব্দের পারিভাষিক শব্দ রূপক)।[১] রূপকের শ্রেণী দশটি, যথা—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। অতএব দশবিধ রূপকের অন্তর্গত দ্বিতীয় রূপকটির নাম প্রকরণ।

প্রকরণের স্বরূপ

উৎস, চরিত্র, রস ও কাহিনী-বিন্যাসরীতি—এই কয়টি দিক বিশ্লেষণ করে প্রকরণের স্বরূপ বা লক্ষণ সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্রকরণের কাহিনীর উৎস কবির কল্পনা।[২] কোন ইতিহাস, পুরাণ বা লোকপ্রচলিত বিখ্যাত কাহিনী প্রকরণ রচনার উৎস হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, প্রকরণ রচয়িতারা নিশ্চয়ই সমাজ বহির্ভূত কোন অতিমানব নন। তাই তাঁদের কল্পনা ও চিন্তা-চেতনার সাথে সমাজ সংঘটিত বাস্তব ঘটনা উঠে আসাই স্বাভাবিক।

---

* ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ "রূপারোপাত্তু রূপকম্"— বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৯), ৬/১।

২ "ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।"—*তদেব*, ৬/২২৪। "অথ প্রকরণে বৃত্তমুৎপাদ্যং লোকসংশ্রয়ম্।"—ধনঞ্জয়, *দশরূপক* , সীতানাথ আচার্য ও দেব কুমার ঠাকুর সম্পা.(কলকাতা: সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৭), ৩/৩৯।

সেই সূত্রে এর চরিত্রগুলিও সমাজের সাধারণ মানুষ। তাঁরা ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি বিখ্যাত কাহিনীর বিখ্যাত ব্যক্তি নন। অলঙ্কারশাস্ত্র মতে, এর নায়ক কোন দেব, নৃপ বা অবতার-পুরুষ নন।[৩] তিনি বিপ্র, অমাত্য বা বণিক শ্রেণীর; শাপভ্রষ্ট, নশ্বরধর্ম ও কামে আসক্ত[৪] এবং ধীরপ্রশান্ত বৈশিষ্ট্যের।[৫] প্রকরণের নায়িকা কুলজা, বেশ্যা বা দু'টির মধ্যে যে কোন বৈশিষ্ট্যের হতে পারেন। নায়ক-নায়িকা ও মুখ্য চরিত্র ছাড়াও এর কাহিনীতে দাস-দাসী, বিট, শকার, কুট্টিনী, দ্যূতকর প্রমুখ সাধারণ চরিত্রের সমাবেশ ঘটে থাকে। শৃঙ্গার রস প্রকরণের অঙ্গীরস বা প্রধান রস, তবে অন্যান্য রস অঙ্গরস বা অপ্রধান রস হিসাবে বিদ্যমান থাকে। কাহিনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নাটক ও প্রকরণ একই নিয়মে অনুসারী। কাহিনীর অধ্যায়বিন্যাস, কাহিনীর সূচনা-সমাপ্তিসহ মূলকাহিনীতে নাটকীয়তা, রমণীয়তা ও কালগত ঐক্য বজায় রাখার তাগিদে নাটকে যে সকল অলঙ্কারগত উপাদানের প্রয়োগ হয় তাকেই হুবহু অনুকরণ করে রচিত হয় প্রকরণ।[৬]

কাব্যের উদ্ভব ও উপযোগিতা

প্রথমত প্রকরণ এক শ্রেণীর কাব্য। অতএব কাব্যের উদ্ভব ও উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের প্রথমেই জানা প্রয়োজন। আর্য সভ্যতার ঊষা লগ্নে (আনু. খ্রি. পূ. ২৫০০-২০০০ অব্দে) আর্য ঋষিদের কাছে সর্বপ্রথম প্রতিভাত হয়েছিল বেদ। বৈদিক সাহিত্যের দু'টি অংশ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দেবতার স্তবস্তুতি এবং আত্মপ্রাপ্তি—এ সকল সকাম কর্মই বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অপর দিকে, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি"[৭]—গুরুনির্দেশিত এ সকল উপদেশ-বাক্যের মাধ্যমে অজ্ঞানাশ্রিত জীবকে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করানোই জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু বেদশাস্ত্র অত্যন্ত জটিল, দুর্বোধ্য, আয়াসলভ্য এবং বিশেষশ্রেণী প্রযোজ্য। তাই এর সহজবোধ্যতার জন্য এবং পঠন-পাঠনসহ বেদের শব্দার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পরবর্তীতে রচিত হয় ছয়টি বেদাঙ্গ, যথা—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। বেদাঙ্গের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্র[৮] বিবর্তিত হয়ে কালক্রমে সৃষ্টি হয় বিবিধ ধর্মশাস্ত্র,

---

[৩] "নোদাত্তনায়ককৃতং ন দিব্যচরিতং ন রাজসম্ভোগম্ ।
বাহ্যজনসংপ্রযুক্তং বিজ্ঞেয়ং প্রকরণং তজ্জ্ঞৈঃ ॥"— ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, ৩য় খণ্ড* , সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৫), ২০/৫২।

[৪] "...নায়কস্তু বিপ্রো ২মাত্য২থবা বণিক্। সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ ॥"— বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, ৬/২২৫।

[৫] "সামান্যগুর্ণৈর্ভুয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ ॥"— *তদেব*, ৩/৪১।

[৬] "শেষং নাটকবৎ সন্ধিপ্রবেশকরসাদিকম্।"—ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, ৩/৪০।

[৭] সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, বিপদভঞ্জন পাল সম্পা. (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৪), পৃ. ১৫০।

[৮] "কল্পসূত্র নামক বেদাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে তিন শ্রেণীর সূত্রসাহিত্য সৃষ্টি হয়, যথা—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যজ্ঞের বিধিবিধান সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েছে। গৃহ্যসূত্রে গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার বিষয়ক করণীয় যাগযজ্ঞের বিধিবিধান সংর্ম্পকে বলা হয়েছে। আর ধর্মসূত্রে গার্হস্থ্য জীবনকে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমে বিভক্ত করে সেখানকার কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানাদি করার সুফল এবং না করার প্রত্যবায় (পাপ) সম্পর্কেও ধর্মসূত্রে আলোচনা করা হয়েছে।"—শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৯-১৪১।

যেমন—মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদি। ব্যক্তিগতসহ রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিবিধ অনুশাসনবাক্য এ সকল শাস্ত্রে তুলে ধরা হয়েছে।[৯]

অতঃপর মহাকাব্যের যুগ। পরিপূর্ণ কাব্য বা সাহিত্য বলতে যা বুঝায় ভারতীয় সাহিত্যে তার সূচনা এই মহাকাব্যের যুগ থেকেই। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, রসযুক্ত রচনাই কাব্য, তবুও মহৎ কাব্য রচনা কালে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ ঘটে; ঠিক যেমন মধুকরের লালার মিশ্রণে ফুলের মিষ্টতা পরিণত হয় ভেষজ গুণযুক্ত উৎকৃষ্ট মধুতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এই কথাটিরই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন:

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জননস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।[১০]

রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটিতে সেটি ঘটেছে। আদিকবি বাল্মীকি এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেবের মহৎ ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে দুটি মহৎ রসসাহিত্য। তিক্ত ঔষধে চিনির প্রলেপ দিয়ে সহজাক্ষ্য করার মত কাব্যের মাধ্যমে সেখানে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরোক্ষ ও সহজভাবে। অতএব বলা যেতে পারে—বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল, আয়াসলভ্য, বিশেষশ্রেণীপ্রযোজ্য এবং কখনওবা প্রত্যক্ষ অনুশাসনবাক্য নির্ভর। পক্ষান্তরে কাব্য হল সহজতর, অনায়াসলভ্য এবং সর্বশ্রেণীপ্রযোজ্য। অতএব সহজে, সুকৌশলে, সর্বজনীনভাবে মানবসমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাব্যশিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে এরপর আমরা পুরাণের কথা উল্লেখ করতে পারি। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট নানা প্রকার আখ্যান-উপখ্যান ভিত্তিক রচনাই পুরাণ। পৌরাণিক কাহিনীতে মানুষের বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যই এ সকল আখ্যান-উপখ্যানের অবতারণা এবং ঐশ্বরিক সত্তার আরোপ। উত্তরোত্তর ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট প্রমুখ কাব্যকারদের রচনা-সম্ভারে সংস্কৃত সাহিত্য পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রচিত হয় কাব্যর স্বরূপ নির্ধারণী গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে এ সকল সাহিত্যকে শ্রব্য ও দৃশ্য ভেদে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। উল্লেখ্য, শ্রব্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত পরিপূর্ণ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হওয়া সত্ত্বেও কেন দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়ল, সে বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তি তুলে ধরা যেতে পারে:

দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির উপযোগিতা

১. সহজগ্রাহ্যতা: শ্রব্যকাব্য শুধুমাত্র শোনা যায়। ফলে এর বিষয়বস্তু ও মর্মার্থ বুঝতে, কাব্যরস আস্বাদন করতে এবং কাব্যের মধ্য দিয়ে লেখকের মতাদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পাঠক ও শ্রাবকের

---

[৯] সর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ।
শ্রৈষ্ঠ্যনাভিজনেনেদং সবং বৈ ব্রাহ্মণো২ র্হতি ॥
প্রাঙ্নাভিবর্ধনাৎ পুসো জাতোকর্ম বিধিয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্ ॥—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *মনুসংহিতা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২), ১/১০০, ২/২৯। মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনিবালভীতাদিযোজিতঃ।
অসম্বদ্ধকুতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি ॥—পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯২), ২/৩৩।

[১০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাষা ও ছন্দ', *রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩) পৃ. ৯৭।

শুধুমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের পাশাপাশি দর্শকের দর্শন-ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় দৃশ্যকাব্যে। ফলে দুই ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত শক্তির কার্যকারিতার কারণে শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য স্বল্পবুদ্ধির কাছেও সহজগ্রাহ্য হয়।

২. কাহিনীর গতিময়তা: শ্রব্যকাব্যের বিস্তৃত কাহিনী পাঠকের কাছে একঘেয়েমিতা সৃষ্টি করে। কিন্তু অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, কার্যাবস্থা, সন্ধি প্রভৃতি নাট্য-উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে দৃশ্যকাব্যের কাহিনীতে গতিময়তা আনা হয়, যা দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখে।

৩. বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা: দৃশ্যকাব্যে মঞ্চসজ্জা, কুশীলবের সাজসজ্জা, আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সংযোজিত হয়, যার মাধ্যমে দর্শকের সর্বোত্তম বিনোদন ঘটে। সেই ফাঁকে, কাব্যের মূল আবেদন জনশিক্ষা—নিজের অজান্তেই দর্শক তা অবধারণ করে ফেলে। মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির পটভূমিতে এই বিষয়টি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[১১] সারা পৃথিবী জুড়ে তখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশবর্তী হয়ে ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য, শীল-অশীল ভুলে গিয়ে মানুষ তখন আকণ্ঠ পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় জগত-সংসারে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দেবতাদের অনুরোধে পিতামহ ব্রহ্মা সর্বজনপ্রযোজ্য, সহজবোধ্য, চিত্তবিনোদনমূলক পঞ্চম-বেদ 'দৃশ্যকাব্য' সৃষ্টি করলেন। তিনি ঋগ্বেদ হতে পাঠ্যবস্তু, সামবেদ হতে গান, যজুর্বেদ হতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হতে কাব্যরস সংগ্রহ করে দৃশ্যকাব্যে সংযোজন করলেন। এ ভাবে নৃত্য-গীত-বাদ্য ও পাত্রপাত্রীর অভিনয় সংযোজনের মাধ্যমে নাট্যকাব্য হয়ে উঠল সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী। অতএব সহজে, সাবলীলভাবে, মনোযোগের মধ্যদিয়ে, বিনোদনের মাধ্যমে মানুষকে অধিকতর কার্যকর শিক্ষাদানের মাধ্যমে জনসমাজকে সুন্দর করার জন্য দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি।

প্রকরণ কাব্য সৃষ্টির উপযোগিতা

প্রকরণ এক শ্রেণীর কাব্য; আবার দৃশ্যকাব্যতো বটেই। অতএব কাব্য ও দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির যে উপযোগিতা, প্রকরণ অবশ্যই সেটি বহন করে। কাব্য ও দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির পটভূমি ও উপযোগিতা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই প্রয়োজনীতা মেটানো দৃশ্যকাব্যের প্রথমটি 'নাটকের' মাধ্যমে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু লক্ষ করা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন কাব্যকার ছাড়াও একই রূপককার তাঁর জীবদ্দশাতেই নাটক ও প্রকরণ রচনা করে গেছেন।

---

[১১] "গ্রাম্যধর্মেপ্রবৃত্তে কামলোভেবশং গতে।
ঈর্ষ্যাক্রোধাভিসংমূঢ়ে লোকে সুখিতদুঃখিতে ॥
ন বেদ ব্যহারো২ য়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্ ॥
ধর্ম্যমর্থ্যং যশস্যং চ সোপদেশং সসংগ্রহম্।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্ ॥
সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্পপ্রবর্তকম্।
নাট্যাখ্যাং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্ ॥"
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামেভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানার্থবণাদপি ॥
বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা ॥"—ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড*, ১/৯, ১/১২, ১/১৪-১৫, ১/১৭-১৮।

যেমন, ভাসের (আনু. খ্রি. তৃতীয় শতক) স্বপ্নবাসবদত্ত (নাটক), চারুদত্ত (প্রকরণ); ভবভূতির (আনু. খ্রি. অষ্টম) উত্তররামচরিত (নাটক), মালতীমাধব (প্রকরণ)। অতএব নাটক রচনার পাশাপাশি কোন্ প্রয়োজনীয়তায় প্রকরণ রচনা অনিবার্য হয়ে পড়ল, সেক্ষেত্রে কোন স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে কিনা, সেটিই আমাদের বিশ্লেষণের বিষয়।

১. অজানা কাহিনীর আকর্ষণ: নাটকের উৎস বিখ্যাত কাহিনী। ইতিহাস, পুরাণ বা লোকপ্রচলিত বিখ্যাত কাহিনী থেকে সেটি গ্রহণ করা হয়। যেমন—বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকটির মূল উৎস ইতিহাস। বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রবেত্তা কৌটিল্যের সক্রিয় ভূমিকায় নন্দবংশ বিনাশের মাধ্যমে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনার সাথে সমসাময়িক লোকশ্রুতি মিশিয়ে নাটকটির পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। কাহিনী অনুসারে:

> বিজয়ী রাজা চন্দ্রগুপ্তের মুখ্য অমাত্যের দায়িত্বভার পরেছিল চাণক্যের উপর। কিন্তু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী চাণক্য এই দায়িত্ব পালনে উৎসাসী নন। তাঁর ইচ্ছা, একজন প্রজ্ঞাবান, শক্তিমান অথচ প্রভুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির কাছে এই দায়িত্ব সমার্পণ করে নিজের সাধনমার্গে ফিরে যাওয়া। চাণক্যের দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ পক্ষের মুখ্য অমাত্য রাক্ষসের মধ্যেই এসকল গুণের সমন্বয় ঘটেছে এবং যিনি মলয়কেতুর সাথে মিলিত হয়ে প্রভুর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা করছেন। আসলে নন্দদের উৎখাত করতে মলয়কেতুর পিতা পর্বতককে অর্ধেক রাজ্য দেওয়ার কথা বলে দলে ভিড়ানো হয়েছিল। বিষকন্যা প্রয়োগের মাধ্যমে পর্বতক নিহত হন। তাই রাক্ষস ও মলয়কেতুর শত্রুপক্ষ এক হওয়ার কারণে এই মিলন। এই অবস্থায় চাণক্য নিয়োজিত গুপ্তচরেরা ভেদনীতি প্রয়োগের দ্বারা অবিশ্বাস সৃষ্টি করে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। শেষে বন্ধুপ্রীতিশীল রাক্ষস কৌটিল্যের কুটনীতির জালে আটকা পড়ে অগত্যা মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি হন। মৌর্য সম্রাজ্য নিষ্কণ্টক মনে করে চাণক্যও তাঁর পূর্ব অবস্থানে ফিরে যান।

পুরাণপ্রসিদ্ধ 'দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার' প্রেম কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাসের নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তল। নাট্যকাহিনী মতে:

> মালিনী নদীর তীরে ঋষি কণ্বের আশ্রম; কণ্বেরই পালিতা কন্যা হিসাবে সেখানে বড় হয়ে উঠেছেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরস-প্রসূত অপ্সরা মেনকার গর্ভজাতা সন্তান শকুন্তলা। একদা রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ারত অবস্থায় ভুলবশত আশ্রমে প্রবেশ করে বনমধ্যে চারাগাছে জলসেচনরতা অপরূপা শকুন্তলাকে দেখতে পান। পরবর্তী পর্যায়ে গুরুজনের অজান্তেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়, গান্ধর্ব বিবাহসহ দৈহিক মিলন সংগঠিত হয়। কিন্তু রাজকার্যে ব্যস্ততাহেতু শকুন্তলাকে শুধু একটি অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়ে রাজাকে রাজধানীতে ফিয়ে আসতে হয়। বিয়য়টি অবগত হয়ে ঋষি কণ্ব গর্ভবতী শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপের প্রভাবে শকুন্তলাকে চিনতে ব্যর্থ দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলা হন অপমানিতা ও প্রত্যাখ্যাতা। পরে ঋষি মারিচের আশ্রমে শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের জন্ম হয়। ইতোমধ্যে ধীবরের কাছ থেকে পাওয়া স্মারকচিহ্ন অঙ্গুরীয়ক পেয়ে রাজার পূর্বস্মৃতি ফিয়ে আসে। শেষে মারিচের আশ্রমে পুত্রসহ উভয়ের পুনর্মিলন ঘটে।

'উদয়ন ও বাসবদত্তার' লোকপ্রচলিত বিখ্যাত প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভাসের স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকটি। নাট্যকাহিনী মতে:

> শত্রু আরুণি কর্তৃক উদয়নের বৎসরাজ্য অধিকৃত হলে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজমহিষী বাসবদত্তাসহ অন্যান্য বিশ্বস্তজনদের নিয়ে রাজ্যোদ্ধারের পরিকল্পনা করেন। মন্ত্রীর বিশ্বাস, ভবিষ্যদ্বক্তাদের পূর্বোঘোষিত বাণী অনুসারে যদি মগধরাজ দর্শকের ভগ্নি

পদ্মাবতীর সাথে রাজার বিয়ে হয়, তবে প্রভাবশালী আত্মীয়ের সক্রিয় ভূমিকায় রাজ্যোদ্ধার সম্ভব। কিন্তু ভার্যা বাসবদত্তা বর্তমান থাকা অবস্থায় প্রগাঢ় ভার্যাপ্রীতিশীল রাজার পক্ষে দ্বিতীয় ভার্যা গ্রহণ অকল্পনীয়। এই পরিস্থিতিতে রাজার অনুপস্থিতিতে মিথ্যাভাবে রটানো হয় যে, অগ্নিদগ্ধা হয়ে উদয়ন-পত্নী মারা গেছেন এবং রাণীমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে যৌগন্ধরায়ণেরও মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তী পদক্ষেপে বিপত্নীক রাজার সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে হয়, ছদ্মবেশধারী বাসবদত্তাকে পদ্মবতীর কাছে ন্যাসরূপে গচ্ছিত রাখা হয়, দর্শকের সাহায্যে রাজ্যোদ্ধার সুসম্পন্ন হয় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বাসবদত্তার আত্মপরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার পুনর্মিলন ঘটে।

কিন্তু প্রকরণের কাহিনীর উৎস কবির কল্পনা। ইতিহাস, পুরাণ বা লোকশ্রুতি থেকে এর মুখ্য কাহিনী আগে থেকে জেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কবির কল্পনা-সৃষ্ট প্রকরণ লিখিত তথা মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই পাঠক বা দর্শকের পক্ষে সেটি জানা সম্ভব। ভাসের অবিমারক, ভবভূতির মালতীমাধব, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি প্রকরণগুলি কবি-কল্পনার মাধ্যমেই সৃষ্টি। যেমন, রাজকন্যার সাথে শাপভ্রষ্ট চণ্ডালযুবকের গোপনীয়, রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক প্রেমের অভিযান এবং শাপমোচন শেষে সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ঐ যুবকের সাথে রাজকুমারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনই অবিমারক প্রকরণের মুখ্য বিষয়:

যুবকটির নাম বিষ্ণুসেন। অগ্নিদেবের আশীর্বাদে কাশিরাজমহিষী সুদর্শনার গর্ভে তাঁর জন্ম। পরে আপন মাসী সৌবীররাজমহিষী সুচেতনার ক্রোড়ে মাতৃস্নেহে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। বাল্যকালে অবি (মেঘ) রূপধারী এক অসুরকে বধ করার কারণে বিষ্ণুসেনই হয়ে ওঠেন অবিমারক। পরবর্তীতে ঋষির অভিশাপের কারণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলেও তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধিসহ মহৎ মানসিকতা অটুট ছিল। এই অবস্থায় একদা হস্তি-আক্রান্ত রাজকুমারী কুরঙ্গীকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রেমাসক্ত হন। নায়িকার মনেও নায়কের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রধান অন্তরায় দু'জনের সামাজিক অবস্থান; একজন রাজকুমারী, অন্যজন চণ্ডালকুমার। এই জটিল পরিস্থিতিতে দৈববাণীতে ঘোষিত হয়, ঐশ্বর্যবান, রূপবান, জ্ঞানবান, সত্ত্বাবান ব্যক্তি নিচকুলজ হলেও চরিত্রশুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এই উপদেশ-বাণীর চালিকাশক্তির প্রভাবে উভয়ের গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হয়, বিদ্যাধর দম্পতির সাহায্যে উভয়ের গোপন-অভিসার ফলপ্রসূ হয় এবং শাপমুক্তিপ্রাপ্ত অবিমারকের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর সামাজিক স্বীকৃতিপূর্বক নায়িকার সাথে তাঁর প্রাজাপত্য বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

রাজকামনারোষ ও বিকৃত ধর্মাচারীদের জিঘাংসার বিরুদ্ধে নরনারীর স্বতস্ফূর্ত ভালবাসার সমর্থন দেওয়া হয়েছে ভবভূতির মালতীমাধব প্রকরণে। প্রকরণটি অনুসারে:

দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূরিবসু ও দেবরাত সহপাঠাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, উভয়ের ভবিষ্য সন্তানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন, যাতে বন্ধুত্ব আজীবন অটুট থাকে। পরবর্তীতে কর্মজীবনে উভয়ে মন্ত্রী হয়েছেন, গার্হস্থ্য জীবনে ভূরিবসুর কন্যা মালতী এবং দেবরাতের পুত্র মাধবের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পূর্বপ্রতিশ্রুত শুভপরিণয়টি এখনও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। এর কারণ রাজকামনাদৃষ্টি। পদ্মাবতীনগরেশ্বরের ইচ্ছা, মালতীর বিয়ে হবে তাঁরই নর্মসচিব নন্দনের সাথে। এই অবস্থায় রাজমন্ত্রিত্বে আসীন অসহায় ভূরিবসু ভগবতী কামন্দকীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কামন্দকী একজন একনিষ্ঠা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী। তবু ধর্মাচরণের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন মানবপ্রেম নিয়ে

এক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে এসেছেন। সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি প্রথমে মালতী ও মাধবের হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেমের জন্ম দিয়েছেন। বিকৃত তন্ত্রসাধক অঘোরঘন্ট ও কলাপকুণ্ডলা কর্তৃক অপহরণ করা মালতী বলিকাঠের নিচে বসেও প্রিয়জন মাধবের নামই স্মরণ করেছেন। মাধবও নিজের জীবন বাজি রেখে প্রেমিকাকে উদ্ধার করেছেন। উভয়ের প্রেমের গভীরতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তবুও অন্ধবিবেকী রাজা প্রেমিক-প্রেমিকাকে মূল্যায়ন না করে নন্দনের সাথে মালতীর বিবাহের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। এই অবস্থায় কামন্দকীর নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে মালতীর পরিবর্তে মালতী-সজ্জায় সজ্জিত মকরন্দের (মাধবের বন্ধু) সাথে নন্দনের বিবাহ সম্পন্ন করা হয়েছে । মালতী ও মাধবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোপন স্থানে। অতঃপর নকল বিবাহের বিষয়টি অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ রাজশক্তির সাথে মকরন্দের যুদ্ধ শুরু হয়। খরব পেয়ে মাধবও বীরবিক্রমে বন্ধুর সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। দুই বন্ধুর সম্মিলিত শক্তিতে রাজশক্তি পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বামাচারী কাপালিক কপালকুণ্ডলা কর্তৃক মালতী দ্বিতীয় বার অপহৃত হয়েছেন। সেক্ষেত্রেও কামন্দকীর সাবেক শিষ্যা সৌদামিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় মালতী ফিরে এসেছেন তাঁর বাবা-মায়ের কোলে। শেষে রাজস্বীকৃতিতে এবং আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে মালতীর সাথে মাধবের এবং মকরন্দের সাথে মদয়ন্তিকার (নন্দনের বোন) শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়েছে।

সমাজের অসম অবস্থানের অসম বর্ণ-শ্রেণীর দু'টি নরনারীর মধ্যে প্রণয়ের বন্ধন সৃষ্টি হওয়া এবং গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজার আদেশে সেটি স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণ:

প্রকরণের নায়িকা গণিকাকুলজা বসন্তসেনা। কিন্তু গণিকাপেশা এবং বিত্তে তাঁর কোন মোহ নেই। তাই, দরিদ্র অথচ প্রশস্তচিত্ত চারুদত্তের গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তিনি হৃদয়াসনে বসিয়েছেন। একদা কামদেবতার মন্দিরে বেড়াতে আসা বসন্তসেনা সরাসরি চারুদত্তকে দেখার পর এই অনুরাগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। ঐ মন্দির থেকে বাড়ি ফেরার কালে তিনি স্বৈরশাসক পালকের মদদপুষ্ট শকার কর্তৃক তাড়িত হয়ে সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়জন চারুদত্তের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হন। পরে নিজের অলঙ্কারগুলি প্রিয়জনের কাছে গচ্ছিত রেখে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেগুলি চুরি হয়ে গেলে নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া রত্নহারের বিনিময়ে চারুদত্ত বসন্তসেনার ঋণ পরিশোধে উদ্যোগী হন। এদিকে চোর শর্বিলকের চুরি করার মূলে রয়েছে একটি মহৎ স্বপ্ন, অলঙ্কারের বিনিময়ে নিজের প্রেমিকা (যে বসন্তসেনার ক্রীতদাসী) মদনিকাকে মুক্ত করে তাকে নিয়ে ঘর বাধা। প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করে বসন্তসেনা মদনিকাকে শর্বিলকের হাতে সমর্পণ করেন এবং নিজ রওনা দেন চারুদত্তের বাড়িতে অভিসারের উদ্দেশ্যে। সারা রাত্রি অভিসার শেষে সকালবেলা চারুদত্তপুত্র রোহসেনকে সোনার গাড়ি তৈরি করে দিতে এবং তার নিরাভরণা খাঁটি মা হওয়ার বাসনায় বসন্তসেনা তাঁর নিজের অলঙ্কারগুলি ছেলেটিকে উপহার দেন । ধনের উষ্মা-পরিবর্তিত জীবনে তিনি হন সর্বরিক্তদের দলভুক্তা। সে সময়ে তাঁর যাওয়ার কথা উদ্যানবিহারে। কারণ, প্রিয়জন চারুদত্ত তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে সেখানে প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু প্রবহনবিপর্যয়ের কারণে বসন্তসেনা গিয়ে পড়েন দুর্বৃত্ত শকারের ক্ষপ্পরে। তাঁকে বশে আনতে ব্যর্থ শকার বসন্তসেনার প্রতি নির্যাতন শুরু করেন। একপর্যায়ে বসন্তসেনা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে মৃত মনে করে শুকনো পাতার আড়ালে

লুকিয়ে রাখেন এবং এই হত্যার দোষ চারুদত্তের উপর চাপানোর দুরভিসন্ধিতে শকার বিচারালয়ে গিয়ে নালিশ করেন। বিচারকের রায়কে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারী রাজা পালকের আদেশে মৃত্যুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয়। একজন বৌদ্ধভিক্ষুর সহায়তায় সুস্থ হয়ে ওঠা বসন্তসেনা সেই সময়ে বধ্যভূমিকে উপস্থিত হন। সেই মুহূর্তে জানা যায়, মুক্তিকামী মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসক পালকের পতন ঘটেছে, গণমানুষের প্রতিনিধি আর্যক রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেমের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর প্রকৃত অপরাধী শকারকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মহান হৃদয় চারুদত্তের করুণায় তিনিও ক্ষমা পান।

অতএব পাঠক বা দর্শক মহলে নাটকের কাহিনী একেবারে অজানা নয়। কারণ ইতিহাস, পুরাণ বা লোকশ্রুতির কল্যাণে এর মুখ্য কাহিনী সম্পর্কে আগেই অবগত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে উপরি-আলেচিত বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, কলিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্ত প্রভৃতি নাটকের কথা বলা যেতে পারে । নাটক না পড়েও বা না দেখেও মুদ্রারাক্ষসের কাহিনী ইতিহাস থেকে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের কাহিনী পুরাণ থেকে এবং স্বপ্নবাসবদত্তের কাহিনী সমসাময়িক বিখ্যাত লোকশ্রুতি থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রকরণের ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয়। কারণ, পূর্ব-লিখিত বা পূর্বশ্রুত বিখ্যাত কাহিনী এর উৎস নয়। কবির কল্পনাশীল মস্তিষ্কই এর উৎস। সে কারণে, প্রকরণটি লিখিত বা মঞ্চায়িত হওয়ার পরই এর কাহিনী পাঠক বা দর্শক জানতে পারেন। উপরি-আলোচিত ভাসের অবিমারক, ভবভূতির মালতীমাধব, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণগুলি যার উদাহরণ। আবার এটি সত্য যে, জানা বিষয় থেকে অজানার প্রতি মানুষের বিশেষ আকর্ষণ বা কৌতূহল রয়েছে। সাহিত্যশিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। সেই অজানা কাহিনীর অদম্য কৌতূহল মিটানো, যেটি নাটকের পক্ষে সম্ভব হয় নি, সাহিত্যমোদীদের সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য ভারতীয় সাহিত্যে প্রকরণ কাব্য সৃষ্টি হওয়ার একটি যুক্তি হতে পারে।

২. গণমানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরার প্রয়াস: বিখ্যাত কাহিনীর বিখ্যাত নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে রচিত হবে নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্রের এই রীতিবদ্ধতার কারণে নাটকে সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের জীবনচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে, সাধারণ মানুষ হয়েছে উপেক্ষিত। অভিজ্ঞানশকুন্তল, স্বপ্নবাসবদত্ত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকগুলি যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রভাবশালী রাজাদের নিজস্ব প্রেম-প্রীতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, রাষ্ট্রনীতির জটিল কূটনীতি ইত্যাদি বিষয় নাটকগুলির মুখ্য বিষয়। কিন্তু প্রকরণ রচনার ক্ষেত্রে সেই সীমাবদ্ধতা নেই এবং এর নায়ক কোন রাজা, দেবতা বা অবতারপুরুষ হবেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। সে কারণে সমাজের বাস্তবভিত্তিক ঘটনাকে অবলম্বন করে কবির নিজস্ব কল্পনার মিশ্রণে কাব্যিক সত্যে গ্রথিত হয়েছে প্রকরণ, যেখানে সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের কথা উল্লিখিত হলেও সমাজের একটি বড় অংশ গণমানুষের কথা উপেক্ষিত হয়নি, বরং সযত্নে চিত্রিত হয়েছে। যেমন, অবিমারক প্রকরণের নায়ক অবিমারক নিজে রাজা নন, রাজপুত্র। অথচ সেই আত্ম-অহমিকা তাঁর নেই। কারণ, পরিবারের উপর বর্ষিত ঋষি-অভিশাপের কারণে তিনি চণ্ডালত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের সাথে একত্রে বসবাস শুরু করেছেন। রাজকুমারী কুরঙ্গীও অবিমারকের সহযোগিতায় জীবন ফিরে পেয়ে নিজের কুলশীলকে বিসর্জন দিয়ে তাঁকেই ভালবেসেছেন। এক্ষেত্রে দাস-দাসী-বিট-বিদূষক প্রমুখ চরিত্র যার যার অবস্থানে থেকে এই প্রেমকে ফলপ্রসূ করেছে। তাছাড়া, প্রকরণটিতে রাজবর্মবেষ্টিত মানুষগুলির

আভ্যন্তরীণ হৃদয়ের ভালবাসা—সন্তানবাৎসল্য, ভগ্নিপ্রীতি, সুহৃদপ্রেম, গুরুভক্তি, ইত্যাদি অকৃত্রিমভাবে চিত্রিত হয়েছে। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে নানা ধর্ম, বর্ণ, পেশা, জাতি, রুচির বিচিত্র মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। রাজা ও রাজপার্ষদদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, বণিক, প্রব্রজ্যা, গণিকা, দ্যূতকর, তস্কর, মণিকার, চর্মকার, নরসুন্দর প্রমুখ মানুষেরা একত্রে বসবাস করেছেন প্রকরণটির উজ্জয়িনী নগরে। প্রকরণের নায়ক চারুদত্ত কোন রাজা, দেবতা বা অবতারপুরুষ নন। বৃত্তিতে বণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ চারুদত্ত সমাজের একজন সাধারণ মানুষ। কোন দৈবশক্তি বা ঋষির কোপানলে তিনি অভিশপ্ত না হলেও দারিদ্র্যের অভিশাপে তিনি অভিশপ্ত। কারণ, প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করতে করতে আজ তিনি নিঃস্ব। দরিদ্র মানুষের প্রতি সমাজের স্বার্থপর শ্রেণীর যে চরম অবজ্ঞা, সে কথা তাঁর মুখে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। প্রকরণটিতে এই দরিদ্র অথচ মহানহৃদয় ব্রাহ্মণের সাথে ধনের উষ্মা পরিত্যাগকারী গণিকাকন্যা বসন্তসেনার প্রেম সংগঠিত হয়েছে। আবার গণিকালয়ের ক্রীতদাসী মদনিকার সাথে ব্রাহ্মণ শর্বিলকের প্রেম এবং ক্রীতদাসী প্রেমিকার মুক্তিমূল্য সংগ্রহের জন্য তাঁর চৌর্যকর্মে অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিও মৃচ্ছকটিক প্রকরণটিকে গণমানুষের সাহিত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাজ্যোদ্ধার, রাজ্য দখল বা রাজ আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কুটিলতা মালতীমাধব প্রকরণের বিষয় নয়। বন্ধুত্ব, পিতৃত্ব, সাংসারিক জীবনাবদ্ধ নরনারীর প্রেম-ভালবাসার প্রতি সহমর্মিতা ইত্যাদিই এর মুখ্য বিষয়। এখানে মন্ত্রী ভূরিবসু ও দেবরাতের ভূমিকা মন্ত্রিত্বে নয়—বন্ধুত্বে, পিতৃত্বে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকীর ভূমিকা সন্ন্যাসব্রতে নয়—প্রেমাসক্ত নরনারীর প্রেমের সফল পরিণতি প্রদানের ক্ষেত্রে। প্রকরণের নায়ক-নায়িকা মাধব ও মালতী মন্ত্রিপুত্র ও মন্ত্রিকন্যা হলেও সেই প্রভাব প্রকরণটিতে প্রকাশিত হয়নি। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করে দু'টি নরনারী মালতী ও মাধবের প্রেমের সফল পরিণতির লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিত ভাবে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করেছে। যার ফলে রাজকামনা চরিতার্থ হওয়ার পরিবর্তে বন্ধুত্ব, পিতৃত্ব রক্ষা পেয়েছে এবং মালতী ও মাধবের প্রেম সার্থক হয়েছে, যা গণমানুষেরই সাহিত্য।

৩. মানব চেতনা মূল্যায়নের প্রয়াস: নাটকের কাহিনীতে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। বিখ্যাত কাহিনীর নাট্যরূপ দিতে গিয়ে সেখানে দেবতাতন্ত্র, রাজতন্ত্র অথবা অভিজাততন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে গর্ভবতী শকুন্তলা নিজের অধিকার নিয়ে রাজবাড়িতে দুষ্যন্ত-সমীপে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে ভর্ৎসনা করে বলেছেন—"এবমাদিভিরাত্মকায-নির্বর্তিনীনামনৃতময়-বাঙ্‌মধুভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।"[১২] (নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য স্ত্রীলোকেরা এমন মিথ্যা মধুময় কথা বলে থাকে, আর বিষয়ী পুরুষেরা তাতেই আকৃষ্ট হয়।) আশ্রমের পরিবেশে আশ্রমবালিকার সাথে দুষ্যন্তের পরিচয়, প্রণয় এমনকি দৈহিক মিলন পর্যন্ত সংগঠিত হলেও রাজতন্ত্রের রাজাবাসে তাঁকে চিনে নেওয়ার মানসিকতা দুষ্যন্তের বিকশিত হয়নি। স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে, রাজ্য উদ্ধারের সুদূর পরিকল্পনায় এবং স্বামীর সাথে পুনরায় রাজকীয় গমনের অভিলাষে বাসবদত্তা নিজের স্বামীকে সপত্নীর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেননি। নাটকের শেষ অঙ্কে পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। নিজের অজান্তে বাসবদত্তার সাথে সখীজনোচিত আচরণের জন্য মহতী পদ্মাবতী মার্জনা চেয়ে

---

[১২] কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯২) পৃ. ৩৭৫।

বলেছেন—"সখীজণসমুদাআরেণ অদিক্কন্দো সমুদাআরো। তা সীসেণ পসাদেমি।"[১৩] (সখীজনোচিত ব্যবহারের দ্বারা আমি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছি। অতএব মস্তক অবনত করে আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করছি)। কিন্তু রাজমহিষী বাসবদত্তা পদ্মাবতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। মুদ্রারাক্ষস নাটকে মৌর্যসম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের সহযোদ্ধা এবং অর্ধরাজ্যের দাবিদার পর্বতেশ্বর চাণক্যের কূটচালে বিষকন্যার দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। কিন্তু প্রকরণ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী। দৃশ্যকাব্যের দ্বিতীয় সন্তান প্রকরণে সাধারণ গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই তুলে ধরেছে। কখনওবা রাজা, রাজপরিবার, রাজপার্ষদদের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র প্রকাশিত হলেও সমাজের চাহিদায় অনিবার্যভাবে সেটি সর্বজনীন ঐকতানের সাথে সুর মেলাতে বাধ্য হয়েছে। যেমন, অবিমারক প্রকরণে মানুষকে মূল্যায়নের প্রকৃত মাপকাঠি কি, বংশমর্যাদা, নাকি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য?—দু'টি নিম্নশ্রেণীর চরিত্র, রাজকুলের ধাত্রীমাতা জয়দা ও ধাত্রীকন্যা নলিনিকার মনে এই প্রশ্ন জাগরিত হয়েছে। দু'টি ভিন্ন বর্ণগোত্রের—চণ্ডালকুলের অবিমারক ও রাজকুমারী কুরঙ্গী প্রগাঢ় প্রণয়াসক্ত হলেও, বর্ণ ও বংশমর্যাদার পার্থক্যের কারণে তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সমুচিত হবে কিনা, এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে, উক্ত প্রশ্নটির জন্ম। এক্ষেত্রে, বংশমর্যাদা থেকে ব্যক্তির মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই অধিক বলিয়ান এবং সেটিই মানুষকে মূল্যায়নের প্রকৃত মাপকাঠি, এই সর্বজনীন সত্যকে স্বীকার করে দৈববাণীতে ঘোষিত হয়েছে—"ত্যজ কুলগতশঙ্কাং সাধ্যতাং স্বস্তমেতৎ।"[১৪]। অতঃপর গণমানুষের প্রতিনিধি ধাত্রীমাতা ও নলিনিকা নিষ্কলুষ মনে নায়ক-নায়িকাকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। পরবর্তীতে বিদ্যাধর দম্পতি এবং দেবর্ষি নারদও তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে। শেষে রাজশক্তি তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সামাজিক ভাবে অবিমারক ও কুরঙ্গীর বিবাহ সুসম্পন্ন করেছে।

মানব চেতনা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৃচ্ছকটিক প্রকরণে আরও বাস্তব, স্পষ্ট, দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকরণটিতে গণিকাকুলজা বসন্তসেনার সাথে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্ষমতাসীন নতুন রাজার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানই তার প্রমাণ। গণিকারা সমাজের শুধু নিম্নশ্রেণীর মানুষ নয়, সামাজিকভাবেও ঘৃণ্য। অর্থের বিনিময়ে রূপ-যৌবন দিয়ে পরপুরুষের মনোরঞ্জন করার মধ্যেই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুরুষের বধূ হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু বসন্তসেনা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি চান গণিকাবলয় থেকে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনের ঘরণী হতে। তাই বিত্তমোহশূন্য বসন্তসেনা দরিদ্র অথচ হৃদয়বান চারুদত্তকে ভালবেসেছেন। এক্ষেত্রে রাজমদদপুষ্ট লম্পট শকার বলপূর্বক তাঁকে অধিকার করতে চাইলে বসন্তসেনা বলেছেন—"গুণো কখু অনুরাঅস্স কারণং, ণ উণ বল্লকারো"[১৫] (গুণই একমাত্র অনুরগের কারণ বলপ্রয়োগ কখনও নয়।) জন্মদাতৃ মাতাও তাঁকে গণিকাবৃত্তিতে প্ররোচিত করলে তিনি বলেছেন—"জই মং জীঅন্তী ইচ্ছসী তা এব্বং ণ পুণো অহং অত্তাএ আণ্ণাবিদব্বামা"।[১৬] (যদি আমার মরা মুখ না দেখেন

---

[১৩] ভাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', *ভাসনাটকচক্রম্*, সি. আর. দেবধর সম্পা. (পুনাঃ অবিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৩৭) পৃ. ৫৫।

[১৪] *তদেব*, 'অবিমারকম্' ২/৫।

[১৫] শূদ্রক, *মৃচ্ছকটিকম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতাঃ সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ১৯৫৬) পৃ. ৬৭।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ২৬০।

তবে পুনরায় যেন ঐ আদেশ না করেন।) পরবর্তীতে চারুদত্তও বসন্তসেনার প্রেমে সাড়া দিয়ে তাঁকে ভালবেসেন। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই প্রেম অটুট রয়েছে। বাকি ছিল রাজশক্তির স্বীকৃতি। কিন্তু রাজা পালকের কাছ থেকে এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর অপশাসনের কিছু চিত্রও রাজ্যটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, সন্ধ্যার সূচনায় রাজপথে ভাসমান পতিতাবৃত্তি, রাজমদদপুষ্ট চরিত্রহীনদের অবলা নির্যাতন, প্রতিমাশূন্য মন্দির,[১৭] স্থায়ী নিবাসাধীন দ্যূতক্রীড়া, প্রমোদবনে বেওয়ারিশ লাশ[১৮], অযোগ্য পাত্রের গুরুদায়িত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি। রাজ্যের বিচারব্যবস্থার কিছু অপশাসনের চিত্রও আমাদের সামনে ধরা পড়ে। যেমন, শকার-কর্তৃক বিচারকদের হুমকি[১৯], বিচারকদের রাজশক্তিকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা[২০], বিচারশাস্ত্র-বহির্ভূত কালাকানুন প্রভৃতি। এ সকল অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনমনে দিনে দিনে ক্ষোভ দানা বেধে উঠেছিল এবং একদিন তা জনবিদ্রোহে পরিণত হল। জনগণের সর্বাত্মক ইচ্ছা রাজা পালকের পতন ঘটিয়ে জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের সেবক আর্যককে কারামুক্ত করে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। সেই মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেন দুঃসাহসী শর্বিলক, গুণবান চারুদত্ত, সেনাধিকারিক চন্দনক, বৌদ্ধভিক্ষু সংবাহক। সাধারণ জনগণও যার যার অবস্থানে থেকে এই সংগ্রামে এগিয়ে আসলেন। শেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্বৃত্ত রাজার পতন ঘটিয়ে আর্যক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। পরিশেষে প্রগতিশীল নতুন রাজা বসন্তসেনাকে চারুদত্তের বধূ হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। ফলে মানব চেতনার মূল্যায়িত হল।

মালতীমাধব প্রকরণে জীবনের প্রতি জীবনের ভালবাসা ও সংসারধর্মকে সর্বোত্তম ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকরণটিতে রাজাশক্তির কাছে নরনারীর ভালবাসার কোন মূল্য নেই। স্বীয় কামনা চরিতার্থ করতে তারা তৎপর। অপরদিকে নরবলিপ্রথার ধারকেরা বিশ্বমাতার পায়ে তারই সন্তান বলি দিয়ে বিকৃত আত্মসিদ্ধির পথ খোঁজেন। এদেরকে হত্যা করতে সংসারধর্মের ধারক মাধবের কণ্ঠে তাই প্রকরণটিতে উচ্চারিত হয়েছে:

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্মাণমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ ॥[২১]

---

[১৭] মৃচ্ছকটিক প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্কে, সহখেলোয়াড় ও দ্যূতসভাসরদার-কর্তৃক তাড়া খেয়ে সংবাহক একটি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করেন। কিন্তু দেবতার মন্দির হলেও সেখানে কোন বিগ্রহ ছিল না। ফলে মন্দিরের মধ্যে মানব-বিগ্রহে পরিণত হয়ে আত্মগোপন করার কৌশলকে তিনি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন।

[১৮] মৃচ্ছকটিক প্রকরণের নবম অঙ্কে ব্যবহার-দৃশ্যে বিচারকের নির্দেশে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান অনুসন্ধান করে সেনাপতি চন্দনক এসে জানান, সত্যই সেখানেই একটি মহিলার লাশ পড়ে আছে, যা শিয়াল-কুকুরে খাচ্ছে। কিন্তু ঐ লাশটি আসলে বসন্তসেনার নয়। কারণ বসন্তসেনা ততোক্ষণে চেতনা ফিরে পেয়ে নববৌদ্ধভিক্ষু সংবাহকের সাথে বৌদ্ধমঠে চলে এসেছেন। অতএব বলা যেতে পারে, উদ্যানে পড়ে থাকা ঐ লাশটি কোন দুর্বৃত্তের নির্যাতনে মারা যাওয়া কোন বেওয়ারিশ লাশ।

[১৯] "জই ণ দীশদি, তদো আউত্তং লায়াণং পালয়ং বহিণীবদিং বিণ্ণবিঅ বহিণিং অত্তিকং চ বিণ্ণবিঅ এদং অধিঅলণিঅং দূলেফেলিঅ এত্থ অণ্ণং অধিঅলণিঅং ঠাবয়িশ্শম্।"—শূদ্রক, *মৃচ্ছকটিকম্*, পৃ. ৬০০।

[২০] "রাজ্ঞশ্চ কোপাপহঃ"—M. R. Kale, *The Mṛichchhakaṭika of Sūdraka*(Sixth Eidition; Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1994), 9/5.

[২১] ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ১৯৩৬), ৫/৩০।

(কেন তুমি সংসারকে সারহীন, জগৎকে রত্নহীন, মানুষকে আলোকহীন করতে প্রবৃত্ত হয়েছ? কেন তুমি বন্ধুহৃদয়কে মারতে চেয়েছ, কেন তুমি কন্দর্পকে দর্পহীন করে এবং লোকের নয়ননির্মাণকে নিষ্ফল করে জগতকে জীর্ণ উদ্যানে পরিণত করতে চলেছ?)

শেষে সর্বজনীন মানবপ্রেমীদের বুদ্ধির কৌশল, বীরত্ব ও সেবাধর্মের কাছে পরাভূত হয়ে রাজশক্তি তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে, যার ফলে মালতী ও মাধবের প্রেম সার্থক হয়েছে। অতএব জীবনের প্রতি জীবনের ভালবাসাকে উপেক্ষা করে কোন ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না, কোন অপশক্তি জয়ী হতে পারে না, সেই শাশ্বত সত্যই প্রকরটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

উপসংহার

ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, বেদশাস্ত্র গুরুর মত, স্মৃতিশাস্ত্র প্রশাসকের মত, মহাকাব্য সখার মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপদেশ দিয়ে জীবন ও জগতসংসারকে সুন্দর করেছে। অতঃপর চিত্তবিনোদনের মধ্যদিয়ে পত্নীর মত শিক্ষা দিয়ে পার্থিবজগতে শান্তি-শৃংঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্যর প্রথম সন্তান নাটক। কিন্তু নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিখ্যাত কাহিনীর নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকারেরা দেবতাতন্ত্র, রাজতন্ত্র তথা অবিভাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণবপদাবলীর রচয়িতারা ঈশ্বর, দেবতা, ভগবান প্রমুখদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারেন নি। আসলে ধূলির ধরণীকে ঢেকে রাখে যে তৃণ, তার সংখ্যাই পনর আনা, বৃহদাকার বনস্পতির সংখ্যা মাত্র এক আনা। এক আনা বনস্পতির গুণকথনের মাধ্যমে যেমন বৃহৎ বৃক্ষরাজির প্রকৃত চিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়, তেমনি শুধুমাত্র রাজা, ভগবান, দেবতা অথবা অভিজাতশ্রেণীকে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্যে সমাজের গণমানুষের চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে, সমাজের চাহিদায় সাহিত্যরসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরা অতীব প্রয়োজন। ভারতীয় কাব্যকারেরা সেই অনিবার্য প্রয়োজন উপলব্ধি করে, নিজেদের কল্পিত অথচ সমাজের বাস্তব-ভিত্তিক ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রকরণ কাব্য রচনা করেছেন। বিখ্যাত কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করে কাব্যকারেরা সমাজ পরিবর্তনে যে ভূমিকা রাখতে সাহসী হতে পারেন নি, কল্পিত অথচ বাস্তবভিত্তিক কাহিনীর মাধ্যমে প্রকরণ কাব্য রচনা করে কাব্যকারেরা সেই দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছেন। ভাসের অবিমারক, চারুদত্ত, ভবভূতির মালতীমাধব, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণগুলি যার উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনাই এর সমতুল্য। অতএব সাহিত্যেক্ষেত্রে মানবচেতনা মূল্যায়ণের লক্ষ্যে গণমানুষকে নিয়ে রচিত সাহিত্যের উদ্ভব বলে আমরা মনে করি।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন : একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সমীক্ষা

মো. নূরুল ইসলাম*

Abstract: Empowerment of women in rural Bangladesh is relatively ignored. In Bangladesh, especially in rural areas, women cannot participate in descision making even in their families. Because, they cannot earn for their families. In this article, the author has attempted to explore the status of empowerment of the rural working women.

ভূমিকা

'ক্ষমতায়ন' শব্দটির উৎস 'ক্ষমতা'র সাথে, বিশেষ করে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক, পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বন্টনের সাথে সম্পর্কিত। মূলত ভৌত, মানবীয়, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের দ্বারা পুরুষতন্ত্র ও এ ধরনের সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে।[১]

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর লড়াই নয়; পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবতার সংগ্রাম, যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য। যেমন পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ও নারীর অধস্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ এবং রূপান্তর করা; পরিবার, শ্রেণী, জাতি, বর্ণ ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো; ধর্ম, শিক্ষা, আইন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং যেসকল বিষয় লিঙ্গ-বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং জোরদার করে তা পরিবর্তন করা; সম্পদের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ; পুরুষকে নির্যাতক ও শোষণকারীর ভূমিকা থেকে প্রতিহত করা; এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। নারীর ক্ষমতায়ন একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রক্রিয়া, যার প্রতিটি ধাপে কতকগুলো বিষয় উৎস হিসেবে নিহিত রয়েছে। যেমন নারীকে নিজের সম্পর্কে তার অধিকার, সক্ষমতা, সম্ভাবনা ও তার ওপর অর্পিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। নারী যৌথভাবে নিজেদের জন্য 'সময় এবং স্থান' তৈরি করবে, যেখান থেকে তৈরি হয় ভিন্ন জীবনবোধ ও নতুন সচেতনতা। প্রগতিশীল শক্তিসমূহ নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। নারীর ক্ষমতায়ন কোনো বৃত্যাবদ্ধ একমাত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এটি গতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে চক্রাকারে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া হচ্ছে তার অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সংঘটিত গণ-

---

*এম.ফিল. গবেষক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] এসিডি, *নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক নারী সমাবেশ* (রাজশাহী: এসিডি, ২০০২), পৃ. ৪।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয় যা বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং রূপান্তর করতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে শোষণমূলক ধারণার পরিবর্তে পরস্পর অংশগ্রহণ বা আদান-প্রদানমূলক ধারণা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতাহীনতা এ দেশের অধিক দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। অপর দিকে দারিদ্র্যের কারণেও নারী ক্ষমতাহীন হয়। তাই, এ দেশের নারী ক্ষমতায়নের প্রাথমিক উৎস হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়।

গ্রামীণ নারীর দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকা মূলত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সম্পকতি। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা ঘটলেই যে নারী সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতায়িত হবে, তা ঠিক নয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সাথে সাথে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন হলে, নারী সমাজ ক্ষমতায়িত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, নারীর স্বাবলম্বিতা নারীর অন্তত পারিবারিক ক্ষমতায়নকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

আমাদের দেশের অনেকেই 'ক্ষমতা' ও 'ক্ষমতায়ন' প্রত্যয় দুটি সমার্থক বিবেচনা করে থাকেন। অনেকেই মনে করেন নারী ক্ষমতায়িত হলে, পুরুষদের স্থলে নারীরাই জোরপূর্বক ক্ষমতায় আসীন হবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টির অর্থ হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ। "Empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation, to greater decision-making power and control, and to transformative action"।[২]

প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য, গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন মূল্যায়ন করা। আর এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের সকল শ্রমজীবী নারীর শুধুমাত্র পারিবারিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামাজ বিজ্ঞানের জরিপ পদ্ধতি অবলম্বনে, বিশেষ করে লক্ষ্য-দলের নির্বাচিত কিছু মহিলার সাথে সরাসরি কথা বলে participant obseration-এর মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয়গুলোর আলোকপাত করা হয়েছে। এদিক থেকে প্রবন্ধটি মূলত উদ্ঘাটনমূলক। তবে লক্ষ্য-দলের নিকট থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ করার জন্য মাধ্যমিক তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে, যা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য: গবেষণা এলাকার মোট গ্রামের সংখ্যা ১৬টি, মোট জনসংখ্যা ২৪,৯৫১; তার মধ্যে পুরুষ ১২,৮৭০ এবং নারী ১২,০৮১। গবেষণার জন্য মোট ১৩১ জন শ্রমজীবী নারীকে লক্ষ্য-দল হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে, দিন মজুর ৪৩ জন, ধানকলে কর্মরত শ্রমিক ২৮ জন কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক ৩৯ জন এবং রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসা করে ২১ জন।

---

[২] M. Karl, *Women and Empowermnt: Paarticipation and Decision Making* (London: Zed Books Ltd., 1995), পৃ. ১৪।

নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বর্তমানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমত, অনুন্নত দেশ, দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশ, এবং তৃতীয়ত, উন্নত দেশ। বিশ্বের গুটিকয়েক দেশ ছাড়া প্রায় সকল দেশেই উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশও এমন একটি উন্নয়নশীল দেশ। তবুও এ দেশের মানুষের নিম্ন আয়, অধিক কৃষি নির্ভরশীলতা, মূলধনের অভাব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতা, লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার, উৎপাদন ক্ষমতা কম প্রভৃতি বিষয়ের কারণে এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে গণদারিদ্র্যের রূপ অত্যন্ত প্রকট।[৩] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোতে এবং শ্রেণীবিণ্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় এ দেশের কৃষি-অর্থনীতি জাতীয় উন্নয়নে যে প্রধানতম ভূমিকা পালন করছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কৃষি-অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু গ্রাম আজো অবহেলিত, উপেক্ষিত। সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করা যথেষ্টই কঠিন কাজ।

গবেষণা এলাকার শ্রমজীবী নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য তাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা, পরিবার প্রধান, বয়স, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য সারণির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্রমজীবী নারীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা

আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি অথচ আয় কম সে পরিবারের সদস্যরা যে অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপন করে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে, যে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম সে পরিবারের আয় কম হলেও পরিবারের সদস্যরা খেয়ে-পরে মোটামুটি সহনীয় জীবন যাপন করতে পারে। শুধু তাই নয় কম সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে পারিবারিক কলহও কম হয়।

সারণি ১ : শ্রমজীবী নারীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসাকরে N=২১	মোট N=১৩১
৩ সদস্য	৫১.১৬%	৩৫.৭১%	৫৮.৯৭%	২৮.৫৭%	৪৬.৫৭%
৪ সদস্য	৩২.৫৬%	৪৬.৪৩%	৩০.৭৭%	৪২.৮৬%	৩৬.৬৪%
৫ সদস্য	১৬.২৮%	১৭.৮৬%	১০.২৬%	২৮.৫৭%	১৬.৭৯%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

পরিবারের গড় আকার : ৩.৭ অর্থাৎ প্রায় ৪ জন।

উৎস : মাঠ জরিপ

---

[৩] গাজী জাহিদ হোসেন, *স্বনির্ভরতা ও বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়নের প্রকৃতি* (খুলনা: শাওলী প্রকাশনী, ১৯৮৪), পৃ. ৯।

উপরের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিষয়ক সারণি ১ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গবেষণার জন্য নির্বাচিত শ্রমজীবী বেশিরভাগ (৪৬.৫৭%) নারীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন। অপরদিকে, ৪ সদস্যবিশিষ্ট মোট পরিবারের সংখ্যা ৩৬.৬৪% এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১৬.৭৯%। পরিবারের গড় আকার : ৩.৭ অর্থাৎ প্রায় ৪ জন।

শ্রমজীবী নারীর বৈবাহিক অবস্থা

গবেষণার জন্য নির্বাচিত অধিকাংশ শ্রমজীবী মহিলাই তালাকপ্রাপ্তা (৫০.৩৮%)। এরপর স্বামী পরিত্যক্তা ২২.৯০%, আর বিবাহিতা এবং স্বামী বর্তমান, তাদের সংখ্যা মোট ১৬.৭৯%। উল্লেখ্য, এই সমস্ত নারীর স্বামী অসুস্থ অথবা অক্ষম। তবে শ্রমজীবী নারীর মধ্যে বিধবা মহিলার সংখ্যা সব চাইতে কম (৯.৯৩%)।

সারণি ২ : শ্রমজীবী নারীর বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসাকরে N=২১	মোট N=১৩১
বিবাহিতা এবং স্বামী বর্তমান	৯.৩০%	১৭.৮৬%	১০.২৬%	৪২.৮৬%	১৬.৭৯%
তালাকপ্রাপ্তা	৫১.১৬%	৫৭.১৪%	৫৩.৮৪%	৩৩.৩৩%	৫০.৩৮%
স্বামী পরিত্যক্তা	২৩.২৬%	১৭.৮৬%	২৫.৬৪%	২৩.৮১%	২২.৯০%
বিধবা	১৬.২৮%	৭.১৪%	১০.২৬%		৯.৯৩%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৫০.৩৮%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের শ্রমজীবী নারীর বৈবাহিক অবস্থা বিষয়ক সারণি ২ বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত শ্রমজীবী নারীর স্বামী না থাকার কারণে অথবা স্বামী বর্তমান থাকলেও কর্মক্ষম না হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে সর্বাধিক বিপন্ন তালাকপ্রাপ্তা নারী (৫০.৩৮%)।

শ্রমজীবী নারীর পরিবার প্রধান

নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীরমধ্যে সিংহভাগই (৮৪.৭৩%) নিজেই পরিবার প্রধান। মাত্র ১৫.২৭% শ্রমজীবী নারীর পরিবার প্রধান তাদের বাবা, বড় ভাই অথবা সন্তান। গবেষণা এলাকায় অবস্থান ও সার্বিক পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা গেছে যে, এই সব নারীর নিজস্ব কোনো বসত বাড়ি না থাকায় তারা কেউ বাবার পরিবারে, কেউ বড় ভাইয়ের পরিবারে, কেউবা তাদের সন্তানের পরিবারে বসবাস করে।

সারণি ৩ : শ্রমজীবী নারীর পরিবার প্রধান

পরিবার প্রধান	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসা করে N=২১	মোট N=১৩১
নিজে	৮৮.৩৭%	৮৯.২৯%	৯৪.৮৭%	৬৬.৬৭%	৮৪.৭৩%
নিজে নয়	১১.৬৩%	১০.৭১%	৫.১৩%	৩৩.৩৩%	১৫.২৭%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৮৪.৭৩%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণি ৩ বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, তা হলো শ্রমজীবী নারীরা নিজেই পরিবার প্রধান হওয়ায় তারা যেকোনো সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে। শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে প্রচুরক অর্থাৎ যারা নিজেই পরিবার প্রধান, তাদের সংখ্যাই বেশি (৮৪.৭৩%)।

শ্রমজীবী নারীর বসত-বাড়ির স্বত্ব

যে কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের বসত বাড়ির স্বত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে স্থায়ী ঠিকানাহীন জনগোষ্ঠীর সমাজে কোনো মূল্য নেই বললেই চলে। গবেষণা এলাকায় অবস্থানকালে নির্বাচিত শ্রমজীবী মহিলা এবং এলাকার গণ্যমান্য লোকজনের সাথে সরাসরি আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে স্থায়ী ঠিকানাহীন লোকজনের ছেলেমেয়েদের বিয়েশাদি দেওয়াও সমস্যা।

সারণি ৪: শ্রমজীবী নারীর বসত-বাড়ির স্বত্ব

বসত-বাড়ির স্বত্ব	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসাকরে N=২১	মোট N=১৩১
নিজস্ব	৮৮.৩৭%	৮৯.২৯%	৯৪.৮৭%	৬৬.৬৭%	৮৪.৭৩%
নিজস্ব নয়	১১.৬৩%	১০.৭১%	৫.১৩%	৩৩.৩৩%	১৫.২৭%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৮৪.৭৩%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার নির্বাচিত অধিকাংশ (৮৪.৭৩%) শ্রমজীবী মহিলাই তাদের নিজস্ব বসত বাড়িতে বসবাস করে। বাকি ১৫.২৭% মহিলার কোনো নিজস্ব বসত বাড়ি নাই। তাদের মধ্যে কেউ পিতার বাড়ি এবং কেই আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকে। শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে প্রচুরক অর্থাৎ যারা নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করে, তাদের সংখ্যাই বেশি (৮৪.৭৩%)।

শ্রমজীবী নারীর মাসিক আয়

আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য লক্ষ্য দলের বার্ষিক আয় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সারণি ৫ : শ্রমজীবী নারীর মাসিক আয়

মাসিক আয়	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসা করে N=২১	মোট N=১৩১
১,০০০-১,৫০০	৫১.১৬%	৩৫.৭১%	৫৮.৯৭%	২৮.৫৭%	৪৬.৫৭%
১,৫০১-২,০০০	৩২.৫৬%	৪৬.৪৩%	৩০.৭৭%	৪২.৮৬%	৩৬.৬৪%
২,০০১-উপরে	১৬.২৮%	১৭.৮৬%	১০.২৬%	২৮.৫৭%	১৬.৭৯%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৪৬.৫৭%
উৎস : মাঠ জরিপ

গবেষণার জন্য নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীর মাসিক আয় সংক্রান্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৪৬.৫৭% শ্রমজীবী নারীর মাসিক আয় ১,০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকার মধ্যে। আর এদের সংখ্যাই সর্বাধিক। বাকি ৩৬.৬৪% নারীর মাসিক আয় ১,৫০১ টাকা থেকে ২,০০০ টাকার মধ্যে। এরা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে যারা রয়েছে (১৬.৭৯%), তাদের মাসিক আয় ২,০০১ টাকার উপরে। বলা বাহুল্য, শ্রমজীবী সকল নারীরই মাসিক আয় মোটামুটি সন্তোষজনক এবং প্রচুরক বা সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমজীবী নারীর (৪৬.৫৭%) মাসিক আয় ১,০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকার মধ্যে।

শ্রমজীবী নারীর মাসিক ব্যয়

আয়ের সাথে ব্যয়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আয় না থাকলে কেউ কখনো ব্যয় করতে পারে না। 'আয় বুঝে ব্যয়' করার প্রবাদটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সারণি ৬ : শ্রমজীবী নারীর মাসিক ব্যয়

বার্ষিক ব্যয়	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসা করে N=২১	মোট N=১৩১
৯০০-১,২০০	৭৯.০৭%	৮৯.২৮%	৮৯.৭৪%	৮০.৯৫%	৮৩.৯৭%
১,২০-১,৬০০	২০.৯৩%	১০.৭২%	১০.২৬%	১৯.০৫%	১৬.০৩%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৮৩.৯৭%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীরা ব্যয়ের ব্যাপারে বেশ সচেতন। প্রয়োজনের বেশি কখনই তারা ব্যয় করে না, বরং আয়ের চেয়ে ব্যয় কম করে। প্রচুরক বা সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমজীবী নারীর (৮৩.৯৭%) মাসিক ব্যয় ৯০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকার মধ্যে।

সারণি ৭ : শ্রমজীবী নারীর মাসিক সঞ্চয়

মাসিক সঞ্চয়	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসা করে N=২১	মোট N=১৩১
১০০-৩০০	৭৯.০৭%	৮৯.২৯%	৮৯.৭৪%	৮০.৯৫%	৮৪.৭৩%
৩০১-৫০০	২০.৯৩%	১০.৭১%	১০.২৬%	১৯.০৫%	১৫.২৭%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৮৪.৭৩%

উৎস : মাঠ জরিপ

গবেষণার জন্য নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীর মাসিক সঞ্চয় সংক্রান্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৮৪.৭৩% শ্রমজীবী নারীর মাসিক সঞ্চয় ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। মাসিক সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সর্বাধিক। বাকি ১৫.২৭% নারীর মাসিক সঞ্চয় ৩০১ টাকা থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। বলা বাহুল্য, শ্রমজীবী সকল নারীরই মাসিক সঞ্চয় মোটামুটি সন্তোষজনক।

নারী ক্ষমতায়নের উৎস

গবেষণা এলাকায় নারী ক্ষমতায়নের উৎস অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ কালে লক্ষ করা গেছে যে, 'ক্ষমতায়ন' ও 'নারী-ক্ষমতায়ন' প্রত্যয় দু'টি সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।

'ক্ষমতায়ন' শব্দটি প্রায় সবার কাছেই 'ক্ষমতা' বা 'শক্তি'র প্রতিশব্দ হিসেবে গণ্য। তবে 'ক্ষমতায়ন' ও 'নারী-ক্ষমতায়ন' প্রত্যয় দু'টি সম্পর্কে বিষদ ব্যাখ্যা, আলোচনা এবং ভালোভাবে বোঝানোর পর অনেকেই প্রত্যয়দু'টি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে, আবার কারো কারো বিষয়দু'টি সম্পর্কে উদাসীনতাও লক্ষ করা গেছে। গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী মহিলারা 'ক্ষমতায়ন' ও 'নারী-ক্ষমতায়ন' বিষয়ে অবগত কিনা জানতে চাওয়া হলে প্রায় সব মহিলারাই নিরুত্তর থেকেছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গবেষণার জন্য মূলত নির্বাচিত এলাকার শ্রমজীবী মহিলারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর।

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীদের ক্ষমতায়নের উৎস অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য নিম্নে আলোচিত প্রত্যয়গুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমেয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। এর ব্যাপ্তি পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র। বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলো পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করা হলো।

পরিবার : ক্ষমতায়নের মূল উৎস-ক্ষেত্র হলো পরিবার। কারণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য এবং প্রতিটি মানুষই পরিবারবদ্ধ জীবনযাপন করে। তাই মানুষ পারিবারিক তথা সামাজিক জীব। একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই সেই পরিবারের আনন্দ-বেদনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অংশীদার। আর এই অংশীদারিত্বই বৃহদার্থে ক্ষমতায়ন। বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলোর সদস্যদের কর্ম বিভাজন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ শুধুমাত্র উপার্জনমূলক ও মহিলা সদস্যরা উপার্জনমূলক কর্মসহ ও গৃহকর্মেও নিয়োজিত থাকে। তবে নারীরগৃহকর্ম অর্থনৈতিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় না।

ক. নারী ক্ষমতায়নের পারিবারিক উৎস

১. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা : গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবীমহিলারা সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত। তাদের মধ্যে কেউ সরকারি রাস্তায় মাটিকাটা কাজ করে, কেউ সরকারি রাস্তার পাশে লাগানো গাছ পাহারা দেয়, কেউ ধানকলে কাজ করে, কেউ কোল্ড স্টোরেজে কাজ করে, কেউ দিন মজুরি করে আবার কেউ বা ছোট-খাট ব্যবসা করে। সাথে সাথে তারা পরিবারের যাবতীয় গৃহকর্মও করে থাকে; যেমন শিশু পালন থেকে শুরু করে রান্না-বান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার, গবাদিপশুর খাদ্য প্রদান, ধানসহ অন্যান্য ফসলাদি মাড়াই, ধান সেদ্ধ করা, শুকানো, প্রয়োজনে ঢেঁকিতে ধান ভানা, জ্বালানি সংগ্রহ, ঘর গোছানো ইত্যাদি। এইসব কাজের মাঝে অনেক মহিলাই নিজের খাওয়া ও গোসল করার কাজটি পর্যন্ত নিয়মিত ও সময়মতো সমাধা করতে পারে না। তারপরও সমাজে নারীরা পুরুষের অধস্তন।

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী মহিলারা স্ব-উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নির্বাচিত নারী সকলেই জানায় যে তারা তাদের উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে।

কেস স্টাডি : ১

মোছাঃ জোসনা বেগম, বয়স ৪৫ বছর। চার বোন এক ভাই। জোসনা সবার বড়। আনসার ভিডিপি-র সদস্য। নিঃসন্তান। বাড়ি চুনিয়াপাড়া গ্রামে। বেশ সুঠাম দেহ। স্বামীর নাম বাচ্চু। শারীরিকভাবে অক্ষম। অর্থাৎ কোনো কাজ কর্ম করতে পারে না। ছোট বেলায় বেশ কিছুদিন জ্বর হওয়ার পর আস্তে আস্তে হাতপা পঙ্গু হয়ে গেছে। এখন লাঠি ধরে কোনোমতে চলাফেরা করতে পারে। বাচ্চু জোসনার দ্বিতীয় স্বামী।

জোসনার প্রথম বিয়ে হয়েছিল মাত্র ১৪ বছর বয়সে। সুখানদিঘির সোলেমান মণ্ডলের ছেলে আবেদ আলীর সাথে। পণ দিতে হয়েছিল সাত হাজার টাকা। গরিব হলেও তাদের সংসার বেশ সুখেরই ছিল। বিয়ের পর আবেদ আলী বাবার সংসার থেকে পৃথক হয়ে যায়। সে সময় তার বাবা তাকে তিন কাঠা বাড়ি করার জায়গা আর দুই বিঘা ধানী জমি দিয়েছিল। আবেদ আলী মানুষের জমিতে কামলা খাটতো এবং নিজের দুই বিঘা জমিতে চাষাবাদ করতো। জোসনাও তাকে সব কাজে সাহায্য করতো।

পৃথক হওয়ার পর প্রথমেই তারা বাবার দেওয়া তিন কাঠা জায়গার উপর পণের সাত হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে ছোট্ট একটা ঘর করেছিল। জোসনা তার ঘরের আশেপাশে লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, বরবটি প্রভৃতি শাকসবজি তৈরি করতো। এর ফলে বাজার থেকে তাদের কোনো তরিতরকারি কিনতে হতো না। তাছাড়া জোসনা পণের বাকি দুই হাজার টাকা দিয়ে একটা গরুর বাছুর আর দুটি ছাগলের বাচ্চা কিনেছিল।

সংসার তাদের বেশ ভালো ভাবেই চলছিল। এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর। এর মধ্যে জোসনার কোনো সন্তানাদি হয়নি। ফলে দু'জনার মধ্যে আস্তে আস্তে মন কষাকষি শুরু হয়। জোসনা গোপনে ডাক্তার-কবরেজ দেখানো শুরু করে। কিন্তু ফল কিছুই হয় না। আবেদ আলীর মাবাবা, ভাই-বোন সকলেই জোসনার উপর অখুশী হতে থাকে। এরপর সংসারে শুরু হয় অশান্তি। আবেদ আলী প্রায়ই তার স্ত্রীকে মারধোর করতে থাকে। কিন্তু অসহায় জোসনা নরিবে সবকিছু সহ্য করে। একদিন আবেদ আলী তার স্ত্রীকে ভীষণ মারধর করে এবং রাগের মাথায় মুখে তিন তালাক দিয়ে জোসনাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এরই মধ্যে তার পিতাও মারা যায়। ফলে গরিব ছোট ভাইয়ের সংসারে অতি কষ্টে দিন কাটাতে থাকে জোসনা। একদিন সে অসুস্থ হয়ে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ চিকিৎসা নিতে এসে জানতে পারে যে নারীদের আনসার-ভিডিপি-তে ভর্তি করা হচ্ছে। সে সাহস করে ডাক্তার সায়েবের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক্তার সাহেব তাকে আনসার-ভিডিপি-তে ভর্তি হতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, আনসার-ভিডিপি-তে ভর্তি হলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। জোসনা আনসার-ভিডিপি-তে ভর্তির জন্য কি করতে হবে—জানতে চাইলে ডাক্তার সাহেব ফোনে তাকে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। আর সেদিনই সে

আনসার-ভিডিপি-তে ভর্তি হয়ে যায়। এরপর কিছুদিন তাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

সে বছরই সরকারি রাস্তা মাটি কেটে মেরামত করার জন্য মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্যদের দৈনিক ষাট টাকা মজুরিতে মাটি কাটা শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এতে জোসনাও সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাঁর ওয়ার্ডের মেম্বারদের সুপারিশক্রমে মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মধ্যে থেকে পর্যায়ক্রমে মোট দশ জনকে সরকারি রাস্তার মাটি কাটা শ্রমিক হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে থাকে। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে এ রকম দশ জনের একটি করে দল গঠন করা হয়। সুঠাম দেহের অধিকারী জোসনা তার মাটি কাটা শ্রমিক দলের লিডার মনোনীত হয়। এ কাজে যোগ দিয়ে জোসনার বেশ ভালোভাবেই দিন যেতে থাকে। কিন্তু স্বামী পরিত্যক্তা জোসনা সম্পর্কে আশ-পাশের লোকজন আজে বাজে কথা বলতে থাকে। বাধ্য হয়ে জোসনা একই গ্রামের শারীরিকভাবে অক্ষম যুবক বাচ্চুকে বিয়ে করে এবং দুজনে আলাদাভাবে সংসার শুরু করে। জোসনার মা, বাচ্চুর বৃদ্ধ অসুস্থ পিতা এবং বাচ্চুকে নিয়ে জোসনার সংসার। সংসার চালানোর জন্য একমাত্র জোসনাই রোজগার করে থাকে। সংসারের সবাই জোসনাকে বেশ ভালোবাসে। জোসনার আচার ব্যবহারও ভালো। সংসারের জন্য জোসনার সব সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, জোসনা নিজের ইচ্ছে মতো যে কোনো কাজ করতে পারে। সোজা কথা, জোসনার কোনো কাজে সংসারের কেউ কখনো বাধা দেয় না। সংসারের সবাই জোসনাকে ভালো চরিত্রের মেয়ে হিসেবেই জানে এবং বিশ্বাসও করে।

জোসনার রোজগারের টাকা জোসনাই খরচ করে। দুর্গাপুর সোনালী ব্যাংকে জোসনা একটি এপিএস হিসাব খুলেছে। এই হিসাবে জোসনা প্রতি মাসে দুইশত টাকা করে জমা রাখে। তাছাড়া প্রতি মাসে সে কিছু কিছু করে টাকা জমা করে। তার জমানো টাকা থেকে প্রতি ঈদ পরবে মা, শশুর এবং স্বামী বাচ্চুকে নতুন জামা-কাপড় কিনে দেয়। নিজেও নতুন জামা-কাপড় নেয়।

জোসনার সংসার এখন জোসনার সিদ্ধান্তেই চলে। গত নির্বাচনে সে নিজের ইচ্ছেমতো নিজের পছন্দের প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভোটের সময়ে তার মা, শ্বশুর এবং স্বামী বাচ্চুও কোন প্রার্থীকে ভোট দিলে ভালো হবে তা জিজ্ঞেস করেছিল।

বাচ্চুর বাবার দুই কাঠার বসত বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো জমি নাই। এই জমি সে তার পঙ্গু ছেলে বাচ্চুকে লিখে দিয়েছে। গত বছর জোসনা তার জমানো টাকা দিয়ে সেখানে মাটির দেয়াল ও টিনের চালা দিয়ে দুটি ঘর তৈরি করেছে এবং থানা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর থেকে সরবরাহকৃত পায়খানা তৈরি করে নিয়েছে। জোসনার ইচ্ছে, বাড়িতে সে একটি

টিউবওয়েল বসাবে। তবে এ জন্য তাকে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

জোসনা এখন একজন স্বাবলম্বী সচ্ছল মহিলা। সুখের সংসার। তার একটাই দুঃখ, সে এখনো কোনো সন্তানের জননী হতে পারেনি। তবে এখনো সে হাল ছাড়েনি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারের সাথে সে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছে। সে খুব শীঘ্রই রাজশাহীতে গিয়ে একজন বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাবে।

পূর্বে জোসনা লেখাপড়া জানতো না। এখন পাশের বাড়ির (বাচ্চুর চাচাত ভাইয়ের ছেলে) এক ছেলের কাছে কিছু লেখাপড়া শিখেছে। সে এখন নাম সই করতে পারে। বানান করে খবরের কাগজও পড়তে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন কি—তা সে জানে না। তবে সংসারটা এখন তার ইচ্ছেমতোই চলে এবং যেকোনো সিদ্ধান্ত এখন সে-ই নিয়ে থাকে।

২. নারী শিক্ষা : এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যেকোনো মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি অতি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা হচ্ছে সেই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে লোকে নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে অংশগ্রহণ এবং প্রতিবিধানের নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যাস গড়ে তুলতে শেখে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি শিক্ষার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো তাহলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মর্যাদাহীন করে সংকুচিত ও নিষ্ফল জীবনধারার মধ্যে না ফেলে দিয়ে বরং নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশসাধন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হতো।

বাংলাদেশের মানবসম্পদের প্রায় অর্ধেকই নারী। মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে তাই নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়টি অবসম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। নারীকে পুরুষের চেয়ে হেয় প্রতিপন্ন করার সনাতনী মনোভাব, ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার এগুলো নারীর উন্নয়ন ও প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। শুধু পুরুষ নয়, নারী সমাজেও এ ধরনের সনাতনী মনোভাব রয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ নারীর শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা। পরিবারে শিক্ষিত এবং শ্রমজীবী নারীর মর্যাদা যথেষ্ট বেশি। কিন্তু গবেষণা এলাকার শ্রমজীবী নারীর অধিকাংশই (৭৮.৬৩%) নিরক্ষর (সারণি ৮)।

সারণি ৮ : শ্রমজীবী নারীর শিক্ষা

শ্রমজীবী নারীর শিক্ষা	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসাকরে N=21	মোট N=১৩১
সামান্য লেখাপড়া জানে	৯.৩০%	৩২.১৪%	২৮.২০%	১৯.০৫%	২১.৩৭%
নিরক্ষর	৯০.৭০%	৬৭.৮৬%	৭১.৮০%	৮০.৯৫%	৭৮.৬৩%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৭৮.৬৩%

উৎস : মাঠ জরিপ

৩. নারীর ব্যক্তিত্ব : ব্যক্তিত্ববান মানুষকে সকলেই সমীহ করে। এখানে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান এবং বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের কোনো ভেদাভেদ নেই। এখানেও ব্যক্তিত্বের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ বিষয় হিসেবে শিক্ষাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। তবে শিক্ষা ছাড়াও অনেকেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন। গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীদের বেশিরভাগই লেখাপড়া জানে না। তাছাড়া এমন অনেক শ্রমজীবী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যারা যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। সমাজে তাদের সেভাবে মূল্যায়ন করা না হলেও তাদের ব্যক্তিত্ব এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার কারণে পরিবারে বেশ ভালো চোখে দেখা হয় এবং পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের (৯৭.৭১%) মতামতই প্রাধান্য পায় (সারণি ৯)।

সারণি ৯ : পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে শ্রমজীবী নারী

সিদ্ধান্তগ্রহণে শ্রমজীবী নারী	শ্রমজীবী মহিলা				
	দিন মজুর N=৪৩	ধানকলে কর্মরত শ্রমিক N=২৮	কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক N=৩৯	রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসাকরে N=21	মোট N=১৩১
শ্রমজীবী নারীর সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায়	৯৫.৩৫%	৯৬.৪৩%	১০০%	১০০%	৯৭.৭১%
শ্রমজীবী নারীর সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায় না	৪.৬৫%	৩.৫৭%	-	-	২.২৯%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্রচুরক: ৯৭.৭১%
উৎস : মাঠ জরিপ

৪. নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যবোধ : প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সুন্দরের পূজারি। অর্থাৎ সুন্দরকে সকলেই ভালোবাসে। প্রতিটি পুরুষই তার সুন্দরী স্ত্রীর জন্য গর্ববোধ করে। তাছাড়া সুন্দরী স্ত্রীও আত্ম-অহংকারজনিত কারণে অনেক সময়ে পরিবারের অন্যসব সদস্যদের সাথে খুব বেশি কথাবার্তা বলা পছন্দ করে না অথবা যখন-তখন যার-তার সাথে গল্প-গুজব করাও পছন্দ করে না। এতে পরিবারের সদস্য এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলে থাকে, অমুকের স্ত্রীর রূপ আছে বলে অহংকারে কারো সাথে মিশতে চায় না। পরিবারের সদস্যরা কদাচিৎ এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করলেও পক্ষান্তরে তারাও কিন্তু গর্ববোধ করে। এ তো গেল নারীর দৈহিক সৌন্দর্য। অনেক নারীর তেমন চোখ ঝলসানো রূপ বা দৈহিক সৌন্দর্য না থাকলেও তাদের সৌন্দর্যবোধ রয়েছে। অর্থাৎ এরা নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নশীল এবং ঘর-বাড়ি, নিজ পরিবার ও ছেলেমেয়েদের পরিপাটি করে রাখে। এ সমস্ত নারীর মতামতকে স্বভাবতই স্বামীতো বটেই, পরিবারের অন্যসব সদস্যও বেশ মূল্য দেয়।

কেস স্টাডি ২

মনোয়ারা আর এসলামের সংসার ছিল সুখে ভরপুর। দীর্ঘ চার বছর আগে তাদের বিয়ে হলেও কোনো সন্তানাদি হয়নি। দুজনেই দিনমজুর। বাড়ি জয়নগর ইউনিয়নের সুকানদীঘি গ্রামে। বিয়ের সময়ে মনোয়ারার বয়স ছিল পনের বছর আর এসলামের বয়স ছিল আঠার বছর। দুজনই পূর্ব থেকে সুকানদীঘি গ্রামের বাসিন্দা এবং ছোটবেলা থেকেই দুজন দুজনের পরিচিত। দুজনই ভূমিহীন দিন মজুর পরিবারের সন্তান। মনোয়ারা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এবং এসলাম পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। ছোট্ট ঘরে ছোট্ট সংসার। বেশ সুখেই কাটছিল তাদের দিনকাল। হঠাৎ তাদের সংসারে নেমে এলো দুঃখের ছায়া। সাপে কেটে মারা গেল এসলাম। মনোয়ারা স্বামীর ঘর ছাড়লো না। অভাবের তাড়নায় সে একই গ্রামের কাঁচু গোছন্দারের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে আর রাতে নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার উপর চোখ পড়ে গোছন্দারের মেজো ছেলে সেলিমের। সুযোগ পেলেই সে মনোয়ারার সাথে কথা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে। মনোয়ারা কিছু মনে করে না। একদিন সুযোগ বুঝে আকারে ঈঙ্গিতে কু-প্রস্তাব দেয় এমনকি গায়ে হাতও দেয়। মনোয়ারা এসব হেসে উড়িয়ে দেয়। কেননা সেলিম আগে থেকেই তাকে ভাবী বলে ডাকতো।

মনোয়ারার ঘরের দরজায় কপাট নেই। রাতের বেলা শোবার সময়ে ঝাপ লাগিয়ে ঘুমায়। সময় যেতে থাকে। মনোয়ারার শরীর বেশ নাদুস-নুদুস এবং আকর্ষণীয়। সহজেই যে কারও নজর পড়ে তার ওপর। অনেকেই যে তার দিকে আড়ে-ঠারে তাকায়, মনোয়ারা তা লক্ষ করে। আশে পাশের অনেক যুবকই সুযোগ বুঝে এমন-তেমন কথা বলে। মনোয়ারা মুচকি হেসে সরে যায়। মনোয়ারা অত্যন্ত খোলামেলা স্বভাবের মেয়ে। সবার সাথেই হেসে হেসে কথা বলে। মনোয়ারার আরো একটি গুণ আছে; সে গ্রামের যে কারো বিয়েতে নাচ-গান করে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। এ কারণে মনোয়ারা তাদের সমাজের ছোট বড় সবার কাছেই বেশ প্রিয়। সমাজের প্রধানরাও তাকে সহানুভূতি ও স্নেহের চোখে দেখে। তবে উঠতি বয়সী যুবকদের অনেকেই তার সাথে ভাব জমাতে চেষ্টা করে, কেউ কেউ আড়ালে-আবডালে একা পেলে প্রেম নিবেদন করে। মনোয়ারা কৌশলে হাসি মুখে সব এড়িয়ে যায়। মনোয়ারা অত্যন্ত উচ্ছল, চঞ্চল ও হাসিখুশি স্বভাবের যুবতী।

স্বভাবজাত কারণেই মেয়েরা সৌন্দর্য-সচেতন। মনোয়ারাও অত্যন্ত সৌন্দর্য-সচেতন এবং সাজগোজ তার ভীষণ পছন্দনীয়। মনোয়ারা ছাপা শাড়ি পরে। লাল এবং গোলাপি রঙের ছাপা শাড়ি তার খুব পছন্দ। কাজে যাবার পূর্বে এবং কাজ থেকে ফিরে এসে নিয়মিত সে সাজগোজ করে। এ কারণে সে সবারই চোখে পড়ে যায়।

প্রাণ-খোলা স্বভাবের যুবতী মনোয়ারার সাথে সেলিম ধীরে ধীরে ভাব জমিয়ে ফেলে। তাদের আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলায় অনেকে সন্দেহ করলেও মুখে কিছু বলতে সাহস পেত না। কারণ সেলিম সমাজের একজন

প্রভাবশালী লোকের ছেলে। তাছাড়া মনোয়ারা তাদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। তাদের এই ভাব ধীরে ধীরে দৈহিক সম্পর্কে রূপ লাভ করে। তাদের চাল-চলনে প্রতিবেশীদের অনেকেই তা বুঝতে পারে এবং বিষয়টি তারা গোপনে কাঁচু গোছন্দারকে জানায়। কাঁচু গোছন্দার তার ছেলেকে মারধোর করে এবং মনোয়ারাকে বিদায় করে দেয়। মনোয়ারা তখন বাধ্য হয়ে বাজুখলসী গ্রামে তার মামার বাড়িতে চলে যায়। সেখানেই পরিচয় হয় সনেকার সাথে। সনেকা কানপাড়া হাটের পাশে কলাইয়ের রুটি বানিয়ে বিক্রি করে। সনেকার দোকানে খদ্দেরের ভীষণ ভিড়। সে মনোয়ারাকে তার দোকানে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতিদিন খাওয়া-দাওয়াসহ পাঁচ টাকা করে পাবে। মনোয়ারা তার মামার অনুমতি নিয়ে সনেকার দোকানে কাজে লাগে। প্রথমে সে খদ্দেরদের রুটি দেয়, পানি দেয়, দোকানের থালা বাসন মাজাঘোষা করে। তারপর আস্তে আস্তে সে নিজেও রুটি বানানো শিখে ফেলে। মাঝে মাঝে তার বাড়িটি দেখার জন্য সুকানদীঘি গ্রামে যায়। এ ভাবেই কেটে যায় প্রায় বছর দেড়েক।

মনোয়ারা ফিরে আসে তার মৃত স্বামীর পুরনো বাড়িতে। নিজের জমানো টাকা খরচ করে বাড়িটি সে বসবাসের উপযোগী করে। ঘরে কাঠের দরজা লাগায়। এখন সে আর একা থাকে না। একই গ্রামের তার দুরসম্পর্কের বয়স্কা মহিলা রাতের বেলা মনোয়ারার সাথে থাকে। মনোয়ারা ইউনিয়ন পরিষদের পাশে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের হুকুম নিয়ে রুটির দোকান দেয়। সাথে তার দুঃসম্পর্কের নানীও থাকে। অল্প দিনেই তার দোকান বেশ জমে ওঠে। তার দোকানের বেশির ভাগ খদ্দেরই ভ্যান চালক, দিন মজুর এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে ইউনিয়ন পরিষদে আসা লোকজন। খদ্দেরদের সাথে মনোয়ারা খুবই ভালো আচরণ করে। তার ব্যবসা বেশ জমজমাট। ছয় মাস যেতে না যেতেই মনোয়ারা তার ঘরে টিন দেয়, সেমি-পাকা পায়খানা বসায় এবং চারিদিকে ছাঁচার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়। মনোয়ারার দিনকাল বেশ ভালোভাবেই চলতে থাকে।

সুকানদীঘির আবুল ভ্যান চালায়। বয়স বাইশ-তেইশ। সুঠাম দেহ। সব সময় হাসি-খুশি। মনোয়ারাকে ভাবী বলে ডাকে। আবুল মনোয়ারার নিয়মিত একজন খদ্দের। অর্থাৎ প্রত্যেকদিন দুপুরে সে মনোয়ারা দোকানে চারখানা করে রুটি খায়। তারপর হাসতে হাসতে বলে, 'ভাবী তোমার হাতের চারখানা রুটিতে পেট ভরে না। কিন্তু কি করবো, সব যদি আমিই খাই তাহলে মা-বাবা, ভাই-বোন ওরা কি খাবে।' উল্লেখ্য, আবুলের বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। কোনো কাজ কাম করতে পারে না। তাদের কোনো চাষাবাদ যোগ্য জমিজমাও নেই। তারা চার ভাইবোন। আবুলই সবার বড় এবং তার রোজগারেই তাদের সংসার চলে। আবুল খুবই পরিশ্রমী ছেলে। আবুলের কথা শুনে মনোয়ারার কষ্ট হয়। সে আবুলকে প্রতিদিন একটা করে রুটি এমনিই দেয়। আবুল এতে খুশি হয়। আবুলের প্রতি আস্তে আস্তে মনোয়ারার

মায়া জন্মাতে থাকে। মনোয়ারা আবুলকে ভালোবেসে ফেলে। আবুলও একদিন বলে বসে, 'চলো আমরা বিয়ে করি।'

এক কান দুকান হতে হতে কথাটা ছড়াতে থাকে। মানুষে কানাকানি শুরু করে। আবুল তার বৃদ্ধ পিতাকে সব খুলে বলে। তার পিতা রাজি হয়। তারপর দুজনে সামাজিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আবুলের টানাটানির সংসার। একজনের রোজগারে সাত জনার খাবার জোটানো খুবই কঠিন। বিয়ের পর মনোয়ারা ছোট দুই বোনকে নিজের কাছে রাখে এবং দুজনকেই স্কুলে ভর্তি করে দেয়। শুধু তাই নয়, ঈদ-পরবে মনোয়ারা পরিবারের সবাইকে নতুন জামা-কাপড় কিনে দেয়। মনোয়ারার উপর তার শশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদ সবাই খুশি। আস্তে আস্তে মনোয়ারাই তাদের সংসারের কর্ত্রী হয়ে ওঠে। পরিবারের সমস্ত কাজই এখন মনোয়ারার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়। আবুলের ছোট ভাই দুলালকে কিছু টাকা দিয়ে মনোয়ারা সবজির দোকান করে দিয়েছে। তার দোকানও বেশ ভালোই চলে। মনোয়ারা নিজেও স্বাবলম্বী হয়েছে, আবুলের পরিবারেও মোটামুটি সচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

একবার ইউনিয়ন পরিষদে দুস্থ মাতার কার্ড দেওয়ার সময় চেয়ারম্যান সাহেব বলেছিলেন, 'তোমরা অনেকেই কাজ করে খেতে পার। সবাই দুঃস্থ মাতার কার্ডের উপর ভরসা করে থাক কেন ? তোমাদের পাশেই তো দেখতে পাচ্ছ মনোয়ারার রুটির দোকান। সে-ও একজন দুঃস্থ মহিলা। কিন্তু নিজের চেষ্টায় কষ্ট করে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সে এখন একজন স্বচ্ছল-স্বাবলম্বী মহিলা।' চেয়ারম্যান সাহেবের এ কথা শুনে মনোয়ারা নিজেকে একজন সার্থক মহিলা ভাবে।

৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: চরিত্র হলো মানবজীবনের গৌরব মুকুট। কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায়, চিন্তা-চেতনায়, ওঠা-বসায়, আচার-আচরণে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূত-পবিত্র ভাবকেই চরিত্র বলা হয়। চরিত্র একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপ, তিনি পুরুষই হোন বা নারীই হোন। মানুষ অন্য কোনো গুণের অধিকারী না হলেও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য পরিবারে ও সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সততা, সত্য-প্রিয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, আত্মসংযম, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ সচ্চরিত্রের লক্ষণ। চরিত্রবান ব্যক্তিমাত্রই অহিংসা, নির্লোভ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিপরায়ণ হয়। সমস্ত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অন্যায়, অহমিকাবোধ ও দাম্ভিকতা থেকে মুক্ত ব্যক্তিই সমাজে চরিত্রবান বলে বিবেচিত। চরিত্রগুণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং চরিত্রবলেই মানুষ মহত্ত্বের অধিকারী হয়। চরিত্রবান ব্যক্তি প্রতিশোধে উন্মুখ হয় না, ক্রোধে নিষ্ঠুর হয় না, আনন্দে আত্মহারা হয় না। এমন মানুষ সর্বদাই সংযমী থাকে, আর এটাই তার চারিত্রিক গুণ। যেসব নারীর চরিত্রের স্বচ্ছতা রয়েছে, পরিবারে ও সমাজে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। শুধু তাই নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার মতামতকেও নারী ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. স্বাস্থ্য সচেতনতা : বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত অশিক্ষিত নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা কম। অনেকেই আবার নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন। এরা নিজেদের স্বাস্থ্য

সম্পর্কে যেমন উদাসীন তেমনি নিজের স্বামী, সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও উদাসীন। স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিবারের অন্যসব সদস্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া, গর্ভবতী অবস্থায় নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা করা, সন্তানের প্রয়োজনীয় টিকাদানের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। গবেষণা এলাকার নির্বাচিত সকল শ্রমজীবী মহিলাই যথেষ্ট স্বাস্থ্য সচেতন। তারা সকলেই টিউবওয়েলের পানি পান করে থাকে এবং নিজের ও সন্তানের অসুখ-বিসুখ হলে অবহেলা না করে তারা সরাসরি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা সরকারি হাসপাতালে যায়। স্বাস্থ্য-সচেতন নারীর পরিবারে ও সমাজে সবাই ভালো চোখে দেখে। সুতরাং স্বাস্থ্য-সচেতনতাও নারী ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ উৎস।

ক. ৭. পরিবারের সদস্যদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ : পরিবারের সকল সদস্যের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ অর্থাৎ ছোটদের আদর-স্নেহ আর বড়দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নারীর মর্যাদাকে অনেকখানি বৃদ্ধি করে। নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে তার ক্ষমতায়নও ঘটে। তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণকালে দেখা গেছে যে, গবেষণা এলাকার নির্বাচিত সকল শ্রমজীবীমহিলাই পরিবারের সদস্যদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে থাকে।

কেস স্টাডি ৩

দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত জয়নগর ইউনিয়নের বাজুখলশী একটি গ্রাম। রাহেলা এই গ্রামেরই একজন বাসিন্দা। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তবে শরীরের গাঁথুনি দেখে তার বয়স অনুমান করা কঠিন। তিন সন্তানের জননী। তালাকপ্রাপ্তা। বাবার বসত-বাড়ি ছাড়া চাষাবাদযোগ্য জমিজমা নেই। রাহেলা তার ছোট মেয়ে সোভানকে নিয়ে বাবার সংসারে থাকে। সে একটা ধানকল বা চাতালে শ্রমিকের কাজ করে।

প্রায় দশ বছর আগে একই ধানকলের শ্রমিক আবদুলের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরপরই সে বুঝতে পারে যে তার স্বামীর চরিত্র ভালো নয়। চাতালে কর্মরত অন্য মেয়ে শ্রমিকের সাথে খারাপ সম্পর্ক আছে। মাঝে মাঝেই সে রাতে বাড়ি ফিরতো না। এ সম্পর্কে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে রেগে যেতো এবং রাহেলার উপর শারীরিক নির্যাতন করতো। এ ভাবেই সে দীর্ঘ দশ বছর স্বামীর নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। কিন্তু স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে। রাহেলা বাধ্য হয়ে তিন মাসের মেয়েকে সাথে নিয়ে বাবার কাছে চলে আসে। আবদুল এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় বিয়ে করে। এবং রাহেলাকে তালাক দেয়। রাহেলা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে থাকে। সে দিশাহারা হয়ে পড়ে।

এমনই এক সময়ে হঠাৎ করেই দেখা হয় গগনবাড়িয়া গ্রামের ধানকলে কর্মরত মহিলা শ্রমিক আলেমার সাথে। আলেমা তার দূরসম্পর্কের খালা। সে রাহেলার অবস্থা দেখে ধানকলে কাজ করার পরামর্শ দেয়। রাহেলা উপায়ান্ত র না দেখে একটা ধানকলে শ্রমিকের কাজ নেয় এবং ছোট মেয়েটাকে নিয়ে আলেমার সাথেই থাকে। সাত বছর যাবত সে ধানকলে কাজ করছে। অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব দিলেও রাহেলা আর বিয়ে করতে রাজি হয়নি।

মেয়েটা এখন তার কাছে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। বড় এক ছেলে ও এক মেয়ে তার বাবার কাছে থাকে। তারা মাঝে মাঝে মায়ের সাথে দেখা করতে আসে।

রাহেলা বিগত ছয় বছর যাবৎ ধানকলে শ্রমিকের কাজ করছে। এরই মধ্যে সে টাকা জমিয়ে বাবার বসত-বাড়ির সাথে এক কাঠা জমি কিনেছে। টাকা পয়সার জোগাড় হলে সেখানে সে ছোট্ট একট বাড়ি তৈরি করবে।

রাহেলা ভোটার হয়েছে এবং গত নির্বাচনের সময়ে সে তার পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিয়েছে। রাহেলা এখন স্বনির্ভর এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। তার উপার্জিত অর্থ সে এখন নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। কাজের অবসরে সে মাঝে মাঝে প্রয়োজন বোধে একাই বাজারে যায়, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতেও যোগ দেয়। রাহেলা একজন পোড় খাওয়া মহিলা। তাই সে তার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। তাই মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য দুর্গাপুর সোনালী ব্যাংকে তার মেয়ের নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছে। সে প্রতিমাসে সেই হিসাবে টাকা জমা করে। কোনো মাসে দুইশো, কোনা মাসে তিনশো আবার কোনো মাসে পাঁচশো টাকাও জমা রাখে।

৮. পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ : পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ স্বামীর সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে যৌতুক, পিতা বা মাতার সম্পত্তির অংশ, অসময়ে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণের ওপরও স্বামীর পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদার তারতম্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ বিয়ের সময়ে যৌতুক, সময়ে-অসময়ে আর্থিক সহায়তা এবং পিতার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণের ওপরও স্বামীর পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা নির্ভর করে। তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণকালে দেখা গেছে যে, গবেষণা এলাকার নির্বাচিত অনেক শ্রমজীবীমহিলা মূলত যৌতুকের কারণেই স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছে এবং অনেকেই তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে।

খ. নারী ক্ষমতায়নের পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা

পরিবার হলো নারী ক্ষমতায়নের প্রথম ও প্রধান উৎসস্থল। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর মতামত অহরহই অগ্রাহ্য হয়। পুরুষ-শাসিত সমাজে প্রতিটি নারীই তার জীবনকাল পুরুষের অধীনে থেকে কাটিয়ে দেয়। বিয়ের আগ পর্যন্ত পিতা, বড় ভাই বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো পুরুষের অধীনে; বিয়ের পর স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর অবর্তমানে ছেলের অধীনে থেকে জীবন কাটাতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্য-বস্ত্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবারের পুরুষ সদস্যই বেশি প্রাধান্য পায়। সুতরাং নারী ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা শুরু হয় নারীর শিশুকাল থেকেই। গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীদের সাথে একান্ত স্বাক্ষাৎকারে এবং সার্বিক পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নারী-ক্ষমতায়নের পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হলো।

১. সাক্ষরজ্ঞানহীনতা : শিক্ষা হলো নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস। বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং নারীই কেবল শিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। কিন্তু আমাদের গ্রামীণ সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। কন্যা সন্তান এখনো পরিবারে অবহেলিত। কোনো অসচ্ছল পরিবারে একটি কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তান একই সাথে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত হলে, শুধুমাত্র পুত্র সন্তানটিই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং নানা অজুহাতে কন্যা সন্তানটি লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, একটি কন্যা সন্তান বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পরিবারের সকলেই তার বিয়ের বিষয়টিই বেশি গুরুত্বের সাথে দেখে থাকে। ফলে কন্যা সন্তানটি হয়তো নিরক্ষরই থেকে যায় এবং বাল্যকালেই হয়তো বিয়েও হয়ে যায়। অতঃপর বিয়ের পর ঐ মেয়েটি যে পরিবারে যায় সেখানেও ঘটে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন কন্যা-সন্তান শিক্ষার সুযোগ পেলেও শিক্ষার মাঝ পথেই হয়তো তার বিয়ে হয়ে যায়। সুতরাং তার এই সামান্য শিক্ষা পরবর্তী সময়ে কোনো কাজেই লাগে না। এতে একটি বিষয় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কন্যা সন্তানের অভিভাবকরা সময় মতো তার কন্যা সন্তানটিকে বিয়ে দিতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। তাদের ধারণা কন্যা সন্তানের লেখাপড়া শেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বিয়ের পর স্বামীর সংসারে গিয়ে লেখাপড়া জানলেও তাকে যে কাজ করতে হবে, না জানলেও তাকে সে কাজই করতে হবে। সুতরাং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো অর্থহীন। তাছাড়া একজন শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে দেওয়াও সমস্যা। কারণ প্রথমত, শিক্ষিত মেয়েকে কোনোক্রমেই একজন অশিক্ষিত ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত ছেলের সাথে বিয়ে দিতে হলে আনুপাতিক হারে অধিক অর্থের প্রয়োজন। আমাদের গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র। দরিদ্র পরিবারের পিতামাতার এহেন চিন্তা-ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে গ্রামীণ সমাজের এই ধরনের পরিবারের মেয়েরা অশিক্ষিতই থেকে যায়। অথচ পরিবারের শিক্ষিত নারীর মতামতকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, যেমন সন্তানের বিয়ে বা পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তের জন্য পরিবারের শিক্ষিত মহিলার মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অন্যদিকে পরিবারের অশিক্ষিত নারীর মতামত একেবারেই মূল্যহীন। শুধু তাই নয়, পরিবারের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অশিক্ষিত মহিলাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয় না এবং জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও মনে করে না। উল্লিখিত বিষয়গুলো মুসলমান, হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষেত্রেই একইভাবে প্রযোজ্য। গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীর প্রায় সকলেই শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে তারা শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত।

২. দারিদ্র্য : এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। এ দেশের লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আর অধিকাংশ লোকই গ্রামে বসবাস করে। তাই দারিদ্র্যের প্রকটতা গ্রামীণ সমাজেই বেশি।

দারিদ্র্যের প্রথম এবং প্রধান শিকার নারীসমাজ। পুরুষশাসিত সমাজের দরিদ্র পরিবারের নারী দরিদ্রেরও দরিদ্র। কারণ দরিদ্র পরিবারের নারীরা সব সময়ই সহায়-সম্বলহীন জীবনযাপন করে। তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণহীনতার কারণে সম্মানজনক কোনো উপার্জনমুখী কাজ জোগাড় করতে পারে না। সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, দরিদ্রের মতামত মূল্যহীন।

গ. নারী-ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না থাকলে নারীর আর্থিক সচ্ছলতা থাকে না। ফলে যেকোনো প্রয়োজনে স্বামী বা পরিবার প্রধানের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং তাদের কাছে হাত পাততে হয়। সুতরাং আর্থিকভাবে অসচ্ছল বা বেকার নারীর পরিবারে ও সমাজে মতামতের কোনো মূল্য থাকে না। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের মহিলারা বলতে গেলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ষোল ঘন্টাই গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাদের এই কর্ম অর্থহীন।

১. সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা : সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতা নারী ক্ষমতায়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীরা সকলেই দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবারের সদস্য। তাদের স্থাবর সম্পত্তি নেই বললেই চলে। অস্থাবর সম্পত্তিও একেবারেই সীমিত।

খ. ২. দারিদ্র্য : দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, কৃষি উৎপাদনের স্বল্পতা প্রভৃতি বিষয়গুলো নারীর ক্ষমতায়নকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই দারিদ্র্যের শিকার, তথাপি শ্রমজীবী নারীরা সমাজের সর্বস্তরে পুরুষদের তুলনায় অধিক বঞ্চিত। দরিদ্র শ্রেণীর নারীরা দ্বৈত শোষণের শিকার। একদিকে তারা স্বামী-সন্তানসহ সমাজের ক্ষমতাবানদের শোষণের শিকার, অন্যদিকে জন্মের সাথে সাথে নারী হিসেবে পুরুষের শোষণের শিকার।

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত শ্রমজীবী নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ শোষণের মতাদর্শ ক্রিয়াশীল। আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজ-কাঠামোয় পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক ক্ষমতা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে, অন্যদিকে সামাজিক ক্ষমতা সমাজপতিদের নিয়ন্ত্রণে। তবে গবেষণা এলাকার নির্বাচিত কিছু নারীর ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষমতা-কাঠামোয় বেশ শৈথিল্য লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ অনেক নারীই পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

উপসংহার

সামগ্রিক পর্যালোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এইসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অধিকাংশ মহিলার ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তাদের পক্ষে সংসারে বাড়তি অর্থ যেজগানও সম্ভব হয় না। সুতরাং পরিবারে তাদের মর্যাদাহীন অবস্থায় বসবাস করতে হয়। অথচ নারী আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে না পারলে পরিবারে ও সমাজে তার ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তির জন্য কোনো কলকারখানায় যোগ দিলে সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর লোক তাদের পর্দাহীন ও নির্লজ্জ আখ্যা দেয়। শুধু তাই নয়, এইসব মহিলারা অনেক সময়ে ফতোয়াবাজিরও শিকার হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে এসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করা অধিকাংশ মহিলার ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বে দরিদ্রতম একটি দেশ এবং এ দেশের নারীসমাজ হচ্ছে সমাজের অধিকতর দরিদ্রতম অংশ। এ কারণেই দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীর একটি ভূমিকা রয়েছে। আর এ

জন্য প্রয়োজন নারীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সমাজপতিদের মানসিক পরিবর্তন। তা না হলে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব নয়।

গবেষণা এলাকার যে সমস্ত শ্রমজীবী নারী নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে তারা হলো : দিন মজুর, ধানকলে কর্মরত শ্রমিক, কোল্ড স্টোরে কর্মরত শ্রমিক এবং রুটির দোকান বা ছোট-খাট ব্যবসা করে–এমন মহিলা শ্রমিক। এই সমস্ত মহিলারা সব ধরনের পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে বিভিন্ন রকমের শ্রমিক হিসেবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে। আর এই আর্থিক সচ্ছলতার কারণেই তাদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতভাবে ঘটেছে। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পুরোপুরি না ঘটলেও, তাদের মধ্যে এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

জনাব আবদুল করিম মোল্লা, চেয়ারম্যান, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
রাহেলা বেগম, মাটিকাটা শ্রমিক, নোনামাটিয়াল, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
সোনাই বিবি, মাটিকাটা শ্রমিক, বাজুখলশী, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
রবেদা খাতুন, রাস্তার গাছ পাহারা দেওয়া শ্রমিক, চুনিয়াপাড়া, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
রহিমা খাতুন, রাস্তার গাছ পাহারা দেওয়া শ্রমিক, সুখানদীঘি, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
রেজিয়া বিবি, কোল্ট স্টোরে কাজ করে, বাগলপাড়া, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
মুনু বিবি, কোল্ট স্টোরে কাজ করে, দুর্গাদহ, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
সামেনা বেগম, রুটির দোকানী, বাজুখলশী, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।
নেকজান বিবি, রুটির দোকানী, বাজুখলশী, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা ১৪১৭

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রম শোষণের প্রকৃতি: মেঘনা পাড়ের ইলিশ আহরণকারী জেলেদের উপর সমীক্ষা

মোঃ জাহাঙ্গীর কবির*

Abstract: The aim of this paper is to demonstrate the different aspects of labour exploitation of the fishermen of Hilsha, the marginal community in Bangladesh. Due to the poverty, illiteracy, landlessness and powerlessness, this community is bound to make an unwritten contract with *Malik* or *Dadandar* for collecting helping tools. This contract is totally disfavourable to the fishermen, but they agree to this for survival. On the other hand, with the help of this unwritten contract, some benificial groups make 'surplus value' by different ways to exploit the fishermen from their actual earning.

ভূমিকা

বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ইলিশ আহরণকারী জেলে সম্প্রদায় অন্যতম। উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন জেলাতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় এরা ৪.৫ লক্ষের মতো।[১] এদের অধিকাংশ ভূমিহীন, দরিদ্র ও সর্বহারা। ইলিশ আহরণ ব্যতীত এদের আয়ের অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি সামাজিক ও মানবিক সুবিধাবলী উপভোগের ক্ষেত্রে এরা এখনো পশ্চাৎপদ। এদের অধিকাংশেরই স্থায়ী বাসস্থান নেই, বরং এরা নদীর পাড় বা বেড়ি বাঁধের উপর অস্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে। এদের জীবন জীবিকার অনেকটাই দাদনদার বা মহাজনের ঋণের উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু, এদেরকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন: ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি মোকাবেলা করতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে এদের অবদান বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। এই অবদান জেলেদের দারিদ্র্য বিমোচনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না, যে কারণে এরা এখনো চরম দরিদ্রই রয়ে গেছে।

ইলিশ আহরণকারী জেলেরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রোটিনজাতীয় আমিষ সরবরাহ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইলিশ আহরণের পাশাপাশি প্রায় ২৫ লক্ষ লোক পরিবহন, বিপণন, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।[২] এ দেশের বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাহিদার শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ সরবরাহ করে ইলিশ আহরণকারী জেলেরা।[৩] এ ছাড়া, প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশ আহরিত হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ হাজার কোটি

---

* এম.ফিল গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] জে.সি হালদার, "ইলিশ ও নদ নদীর মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব", *দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, অভিযান ২০০৭, ১৩-৩০ জুলাই*, ঢাকা: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ১৪।

[২] *প্রাগুপ্ত*।

[৩] মোঃ রফিকুল ইসলাম, "জাটকা রক্ষা কর্মসূচী ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত ও সাফল্য", *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ মার্চ ২০০৮, পৃ. ১১।

টাকা। সম্ভবত এটিই একমাত্র খাত, যেখানে বাংলাদেশ বিশ্ব চাহিদার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ রপ্তানি করতে সক্ষম[৪] এবং বাৎসরিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ প্রায় ২০০-২৫০ কোটি টাকা, যা জি.ডি.পির শতকরা প্রায় ১ ভাগ।[৫]

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ইলিশ আহরণকারী জেলেদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও তা থেকে এদের প্রাপ্তি তুলনামূলক অনেক কম। ২০০১ সালের একটি গবেষণায় প্রধান মাঝি ও সাধারণ মাঝির বাৎসরিক আয় যথাক্রমে ৩৯০০০ ও ১৪৪০০ টাকার মতো উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]

অপরদিকে, হালদারের তথ্য মতে জেলেদের বাৎসরিক পারিবারিক আয় ২০০৪ সালে ২৬২৩১ টাকা ও ২০০৫ সালে ৪৭৫২৭ টাকা ছিল।[৭] আয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি পারিবারিক আয় গণনা করলেও ব্যক্তিগত আয়ের কোনো তথ্য প্রদান করেননি। ইলিশ আহরণে যে একই পরিবারের একাধিক সদস্য নিয়োজিত থাকে তা উক্ত তথ্যে উল্লেখ আছে। সে কারণে, জেলেদের পারিবারিক আয়ের তুলনায় ব্যক্তিগত আয় অনেক কম হতে পারে বলে অনুমান করা যেতে পারে। অপরদিকে, আহরণকৃত ইলিশের মোট মূল্য বিবেচনা করলে বিনিয়োগকৃত শ্রমের তুলনায় এদের ব্যক্তিগত অর্জন অপেক্ষাকৃত কম বলেই ধরা যায়, অর্থাৎ এরা এদের প্রাপ্য আয় থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হয়।[৮] মোট কথা, জেলেদের বিনিয়োগকৃত শ্রম ও অর্জিত আয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান রয়েছে কিনা এবং যদি থেকে থাকে তবে অতিরিক্ত আয় কারা কিভাবে শোষণ করছে তা একটি জিজ্ঞাস্য, যেটি গবেষণার দাবী রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে সে প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো ইলিশ আহরণকারী জেলেদের শ্রম শোষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে প্রথমত শ্রম শোষণের প্রত্যয়গত ধারণা ব্যাখা ও তার প্রায়োগিক কাঠামো গঠন, দ্বিতীয়ত জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আলোচনাপূর্বক তাদের ইলিশ আহরণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং তৃতীয়ত জেলেদের আয়, মালিক কর্তৃক উদ্বৃত্ত আয় তৈরি এবং শ্রম শোষণের প্রকৃতি পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

আলোচ্য নিবন্ধে সামাজিক জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ইলিশ আহরণের ক্ষেত্রে মেঘনা নদী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে জন্য, গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় ভোলা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদীর কূলবর্তী জেলে পাড়াসমূহকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উক্ত পাড়াসমূহের ভিতর হতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাঁচটি পাড়া, যথাক্রমে ইলিশা ও নাসির মাঝির ঘাট (সদর উপজেলা), রাজবল্লভের ঘাট (দৌলতখান উপজেলা), বেতুয়া ও শ্যামরাজের ঘাট (চরফ্যাশন উপজেলা) চয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলে পাড়া থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুড়ি (২০) জন উত্তরদাতা চয়ন করে মোট একশত (১০০) জনের নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। সমুদ্র ও গভীর নদী হতে ইলিশ আহরণে মহিলারা নিয়োজিত থাকে না, বিধায় নমুনা নির্বাচন কালে কোনো মহিলা উত্তরদাতা বিবেচিত হয়নি। তবে, উত্তরদাতা চয়নের ক্ষেত্রে যেমন জেলে দলের ভিন্নতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে তেমন জেলেদের প্রকারভেদের (প্রধানমাঝি, ইঞ্জিনচালক, সাধারণ মাঝি ও পাচক) উপরও সমগুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্ষেত্র

---

[৪] "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০০৮, ১০-১৬ মার্চ", *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ মার্চ ২০০৮, পৃ. ১১।

[৫] শাইখ সিরাজ, "ইলিশ আমার ইলিশ", *দৈনিক যুগান্তর*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ০৫।

[৬] চূড়ান্ত প্রতিবেদন, *বাংলাদেশ হিলশা ফিশারিজ রিপোর্ট ২০০১*, পৃ. ৯৯।

[৭] জে.সি. হালদার, "ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জেলেদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিকল্প কর্মসংস্থান", *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ মার্চ ২০০৮, পৃ. ১১।

[৮] *ইলিশ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল*, ৩ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯৬।

পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে আবদ্ধ ও মুক্ত প্রান্ত প্রশ্নমালা অনুসৃত হয়েছে এবং নিবিড় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাঁচাই করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০০৯ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কে বিবেচনা হয়েছে।

১.১ শ্রম শোষণ

শ্রম শোষণ প্রত্যয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। শাব্দিক অর্থে শোষণ বলতে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা[৯] বা পরকে ক্রমাগত বঞ্চনা করে তার ধনসম্পদ নিজে ভোগ করাকে বোঝানো হয়েছে।[১০] সে দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমের মূল্য অনুযায়ী শ্রমিককে তার নায্য মজুরি থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করাকে শ্রম শোষণ বলা যেতে পারে। প্রত্যয় হিসেবে শ্রম শোষণ যতটা না তাত্ত্বিক, তার চেয়ে বেশি ব্যবহারিক। অভিজ্ঞতা ব্যতীত এর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুঢ়ার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সে কারণে, শ্রম শোষণের একক বা সার্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া বেশ কঠিন। প্রত্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তীতে, তাকে অনুসরণ করে নব্যউদার ও নব্যধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে, যারা কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে শ্রম শোষণকে ব্যাখা করার প্রয়াস নেন। নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক মাপকাঠির ভিত্তিতে কার্ল মার্কস শ্রম শোষণকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে শ্রমিকের বিনিয়োগকৃত শ্রমের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মজুরি লাভ করাকে শ্রম শোষণ বলে।[১১] মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী সমাজে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয় শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে। বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো যেমন উভয় শ্রেণি সহায়তা করে তেমন শ্রমিকের শ্রম শোষণের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের সহায়তা করে। সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে তিনি তিনটি উপাদানকে সনাক্ত করেছেন, যা শ্রমিকের শ্রম শোষণে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। উপাদানগুলো হলো: (ক) উৎপাদনের উপকরণের উপর সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশের (পুঁজিপতি) স্বত্ব বা মালিকানা, (খ) পুঁজিপতিদের নিকট শ্রম বিক্রি ব্যতীত শ্রমিকের টিকে থাকার অযোগ্যতা এবং (গ) পুঁজিপতিদের স্বার্থে রাষ্ট্র বা সামাজিক শক্তিগুলো একযোগে কাজ করা, যার ফলে সমাজে ক্ষমতা ও সম্পদের অসমবণ্টন সুরক্ষিত হয়। উপরোক্ত উপাদানসমূহের সহযোগিতায় পুঁজিপতিরা তাদের পণ্য উৎপাদনে শ্রমিককে কম মজুরিকে কাজ করতে বাধ্য করে। ফলশ্রুতিতে শ্রমিক তার শ্রম বিনিয়োগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মজুরি পায় এবং পুঁজিপতি তার উৎপাদিত পণ্যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী করে।[১২] উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরিতে শ্রমিকের শ্রমই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সে কারণে, তিনি উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যে ও শ্রমিককের প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানকে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই সাথে অর্জিত মুনাফাকে শ্রম শোষণের হার বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩]

অপরদিকে, নব্যউদারপন্থী ও নব্যধ্রুপদীগণ ভিন্ন আঙ্গিকে শ্রম শোষণকে ব্যাখা করেছেন, যেখানে নব্যউদারপন্থী শক্তি প্রয়োগ এবং ও নব্যধ্রুপদীগণ ন্যায়বিচার বা বৈধতাকে মাপকাঠি ধরেছেন। নব্যউদারপন্থীদের মতে, যখন পুঁজিপতিরা শ্রমিকের উপার্জন জোর করে ভোগ না করে সমাজ কাঠামোর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ভোগ করে তখন তাকে শ্রম শোষণ বলা যায় না। কিন্তু,

---

[৯] *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ১০৯০।

[১০] *সংসদ বাংলা অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০০), পৃ. ৫৫৫।

[১১] Karl Marx উল্লেখিত G.A. Cohen, "The Labour Theory of Value and the Concept of Exploitation", অর্ন্তগত M. Cohen, T. Nagel and T. Scanlon (eds.), *Marx, Justice, and History* (New Jurcy: Princeton, 1980), p. 136.

[১২] Karl Marx, *Capital*, Vol. 1, p. 326.

[১৩] Subrata Mukherjee and Sushila Ramaswamy, *A History of Socialist Thought: From the Precursors to the Present* (New Delhi: Sage Publication, 2000), p. 120.

যদি শক্তি বা জোর-জবরদস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকের উপার্জন ভোগ করা হয়, তবে তাকে শ্রম শোষণ বলা যায়। তাদের মতে, বিশেষ স্বার্থোসিদ্ধির জন্য ক্ষমতা ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে অপরকে ন্যায্য মজুরি হতে বঞ্চিত করার নামই শ্রম শোষণ।[১৪] অন্যদিকে, নব্যধ্রুপদীগণের মতে শ্রম শোষণ যতটা না কাঠামোগত তার চেয়ে বেশি সাংগঠনিক, যেখানে স্বাভাবিক নিয়মে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপার্জন ভোগ করার সুযোগ পায়। সাংগঠনিক নিয়মে যদি এটি বৈধ হয়, ন্যায়বিচারের পরিপন্থি না হয় এবং শ্রমিকের মানসিক অশান্তির কারণ না হয়, তবে এটিকে শ্রম শোষণের পর্যায়ে পড়ে না।[১৫]

শ্রম শোষণ প্রত্যয়টির বিশ্লেষণে তারতম্য থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে ইলিশ আহরণে নিযুক্ত জেলেদের শ্রম শোষণের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের তত্ত্বকে বোঝানো হয়েছে।

১.২ জেলেদের শ্রম শোষণ: প্রায়োগিক কাঠামো বিশ্লেষণ

জেলেদের শ্রম শোষণ প্রক্রিয়াটি বেশ সেকেলে ও জটিল। পুরো প্রক্রিয়াটি 'মালিক-জেলেদের মৌখিক চুক্তির' উপর নির্ভরশীল, যে চুক্তিটি তিনটি উপাদান, যথা: বিনিয়োগ, বিক্রয় পদ্ধতি, ও আয়বণ্টন নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত। উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্ক জেলেদের শ্রম শোষণে নিয়ামক শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত, ইলিশ আহরণে ব্যবহৃত সহায়ক ক্রয়ের জন্য অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন, যা সাধারণত দাদনদার ও স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী সরবরাহ করে। সহায়ক উপকরণ দুই ধরনের যথা: অপরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনশীল। অপরিবর্তনশীল উপকরণ হলো ইঞ্জিনচালিত ট্রলার, জাল ও বয়া, আর পরিবর্তনশীল উপকরণ হলো খাদ্য, জ্বালানি, বরফ ইত্যাদি[১৬]। অপরিবর্তনশীল ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ দাদনদার স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগীকে সবরাহ করে। স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী, যিনি মালিক হিসেবে পরিচিত, উক্ত অপরিবর্তনশীল উপকরণের সাথে পরিবর্তনশীল যুক্ত করে শর্তসাপেক্ষে[১৭] জেলেদের নিকট বিনিয়োগ করে, যে গুলোর সাহায্যে জেলেরা পরবর্তীতে ইলিশ আহরণ করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত, আহরণকৃত ইলিশ জেলেরা দাদনদারের আড়তে সরবরাহ করে, যেখানে মালিক কর্তৃক নিযুক্ত দালালের ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে[১৮] তা বিক্রি হয়। দালাল ও ক্রেতারা উভয়ই জেলেবান্ধব না হওয়ায় দাদনদার অপেক্ষাকৃত কম দামে ইলিশ ক্রয় করে, যা তাকে পরবর্তীতে অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।

---

[১৪] A. W. Wood, "The Marxian Critique of Justice", in M. Cohen, T. Nagel and T. Scanlon (eds.), *Marx, Justice and History* (New Jurcy: Princeton, 1980), pp. 3-41.

[১৫] G. Young, "Justice and Capitalist Production: Marx and Bourgeois Ideology", *Canadian Journal of Philosophy,* Vol. VIII, No. 3, September 1978, pp. 421-455.

[১৬] ইঞ্জিনচালিত ট্রলার/নৌকা, জাল ও বয়া ইত্যাদিকে অপরিবর্তনশীল উপকরণ বলা হয়েছে, কারণ এ গুলোতে একবারই বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। কখনো মেরামতের প্রয়োজন পড়লে দাদনদারকে কোন ব্যয় নির্বাহ করতে হয় না। জেলেদের আয় হতে তা মেটানো হয়। অন্যদিকে খাদ্য, জ্বালানী, বরফ ইত্যাদি উপকরণসমূহ শুধুমাত্র আহরণকালে প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেক ট্রিপে ক্রয় করতে হয়, যার ফলে এই উপকরণসমূহকে পরিবর্তনশীল উপকরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[১৭] শর্ত বলতে দাদনদার ও মালিক এবং মালিক ও জেলেদের মধ্যে বিদ্যমান মৌখিক চুক্তির শর্তকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে আহরিত ইলিশে দাদনদার ও মালিকের অংশ লাভের কৌশল লুকায়িত। মৌখিক চুক্তিটি পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

[১৮] নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে এমন একটি বাজারকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে ক্রেতাগন দাদনদার কর্তৃক বেধেঁ দেওয়া মূল্য পর্যন্ত নিলামে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মূল্য পর্যন্ত ডাক উঠলে অবশিষ্ট ক্রেতারা নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

তৃতীয়ত, চুক্তির শর্তানুযায়ী ইলিশের বিক্রয়মূল্য থেকে দালালের মজুরি, আহরণকালীন খরচ, মালিকের প্রতিনিধির মজুরি, চাঁদাবাজদের চাঁদা[১৯], সহায়ক মেরামত ব্যয় ও বিবিধ ব্যয়[২০] পরিশোধিত হয়।

চতুর্থত, সকল ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট আয় মালিক ও জেলে দলের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত হয়। পরবর্তীতে, দলীয় সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে জেলেদলের প্রাপ্ত অংশ ভাগ হয়। এভাবে ক্রমাগত বণ্টিত হতে হতে সাধারণ জেলেরা শ্রম বিনিয়োগের তুলনায় কম অংশ ভোগ করতে সক্ষম হয়।

জেলেদের শ্রম শোষণের প্রক্রিয়াটি যে 'মালিক-জেলে মৌখিক চুক্তির' ভিত্তিতে আবর্তিত হয় তার শর্তাবলী পরবর্তীতে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.৩ মালিক-জেলে মৌখিক চুক্তি

দরিদ্রতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে জেলেরা ইলিশ আহরণের ব্যবহৃত সহায়ক সমূহের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না। উক্ত সমূহ ব্যতীত ইলিশ আহরণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু সহায়ক ক্রয়ের অর্থ দাদনদার সরবরাহ করে এবং আহরণকালীন ব্যয় ইলিশের বিক্রয়মূল্য থেকে ফেরৎ দেওয়া হয়, সেহেতু ক্রয় বাবদ মালিকের কোন অর্থ বিনিয়োগ নেই বলে অনুমান করা যায়। তবে, দাদনদার ও জেলেদের মধ্যে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালনের কারণে সে চুক্তির প্রধান পক্ষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উক্ত চুক্তির প্রধান শর্তগুলো নিম্নরুপ:

ক. জেলে দল আহরণকৃত ইলিশ দাদনদারের আড়তে বিক্রী করতে বাধ্য থাকবে, যেখানে একজন দালালের ব্যবস্থাপনায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তা বিক্রি হবে।

খ. ইলিশের বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ মজুরি হিসেবে দালালকে দিতে হবে।

গ. ইলিশের বিক্রয়মূল্য থেকে আহরণসংক্রান্ত সকল ব্যয় পরিশোধ করতে হবে। এই ব্যয়গুলো হলো পরিবর্তনশীল উপকরণের মূল্য, মালিকের প্রতিনিধির মজুরি, মেরামত ব্যয়, স্লিপ/টোকেন বাবদ চাঁদা ও বিবিধ ব্যয়।

ঘ. সকল ব্যয় পরিশোধের পর অবশিষ্ট আয় মালিক ও জেলেদের মধ্যে ১০ : ৬ অনুপাতে বণ্টিত হবে।

ঙ. জেলেদলের অংশ দলীয় সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করতে হবে। প্রধান মাঝি, ইঞ্জিনচালক, সাধারণ মাঝি ও পাঁচকের মধ্যে বণ্টনের হার হবে ৩ : ১.৫০ : ১ : ০.৫০।

২ ইলিশ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

২.১ পরিবারের আকার

পরিবারের আকার বলতে সাধারণত এক চুলাতে রান্না করা খাবার গ্রহণকারী একান্নভূক্ত সদস্যদের সমষ্টিকে বোঝায়। পরিবারের আকারের সাথে পারিবারিক আয় ও ব্যয় গভীরভাবে সম্পর্কিত। পেশা ও সামাজিক সম্পর্কে নির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সারণি ১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইলিশ জেলেদের পরিবারের আকার প্রায় ৬.৭১ জন। অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় প্রধান মাঝির পরিবারের আকার বৃহৎ। প্রধান মাঝি, ইঞ্জিন চালক ও সাধারণ মাঝির পরিবারের আকার যথাক্রমে ৯.৫৫, ৬.২২ এবং ৫.৫৪ জন। জেলেদের পুত্র সন্তান কামনা ও বহু বিবাহের প্রবণতা পরিবারের আকার বৃদ্ধির মধ্যে সহসম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়। একই সারণিতে লক্ষণীয় যে, পুরুষ ও মহিলা সদস্যের সংখ্যা যথাক্রমে ৩.৭৬ ও ২.৯৫ জন।

২.২ শিক্ষাস্তর এবং কর্ম অভিজ্ঞতা

ইলিশ আহরণ জেলেদের একমাত্র পেশা। বিকল্প পেশাতে এদের তেমন একটা দেখা যায় না। এমনকি পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের সহায়ক মেরামত ও সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

---

[১৯] গভীর নদী বা সমুদ্রের বিভিন্ন জলদস্যু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। জো (মৌসুম) অনুয়ায়ী এরা নির্দিষ্ট হারে টোকেন বা স্লিপ বিক্রয় করে, যেটি জেলেদের নিকট ইলিশ আহরণের অনুমতিপত্র হিসেবে বিবেচিত। আলোচ্য নিবন্ধে স্লিপ বিক্রিকে চাঁদা হিসেবে গন্য করা হয়েছে।

[২০] অনেক সময় জেলেরা স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক ব্যক্তি, পুলিশ, মৎস্য অফিস, সাংবাদিক ও ঘাট মালিককে চাঁদা বা উপঢৌকন প্রদান করে থাকে। এই চাঁদা বা উপঢৌকনকে বিবিধ ব্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জেলেদের দল গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও কর্ম অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সারণি ১ অনুযায়ী জেলেদের শতকরা ৫১ নিরক্ষর এবং শতকরা ২৭ ভাগ শুধুমাত্র স্বাক্ষর দিতে জানে। অপরদিকে, ইলিশ আহরণ কর্মে এদের গড় অভিজ্ঞতা প্রায় ৮.০৪ বছর। সদস্যদের মধ্যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক তারতম্য বেশ লক্ষণীয়। প্রধান মাঝি, ইঞ্জিনচালক ও সাধারণ মাঝির কর্ম অভিজ্ঞতা যথাক্রমে ১০.৮৬, ৮.৫৮ ও ৬.৩৬ বছর। সুতরাং, জেলেদের অধিকাংশই যে নিরক্ষর ও কর্মে অভিজ্ঞ তা বলা যেতে পারে।

২.৩ জায়গা-জমি

ইলিশ আহরণকারী জেলেদের অধিকাংশ ভূমিহীন ও দরিদ্র। বসত ভিটার অভাবে এরা নদী পাড় বা বেড়ি বাঁধের বসবাস করে। অধিকাংশের পারিবারিক সম্পদ নেই। তবে স্বল্প সংখ্যক জেলে পরিবার অল্প পরিমাণ হাঁস-মুরগি বা ছাগল পালন করে থাকে। সারণি ১ হতে প্রতীয়মান যে জেলেদের ভূমিহীনতার হার শতকরা ৫৫ ভাগ। শুধুমাত্র বাস্তুভিটা ও স্বল্প পরিমাণ চাষযোগ্য জমি আছে যথাক্রমে শতকরা ৩২ ও ১৩ ভাগ জেলের।

২.৪ বাৎসরিক ব্যয় ও ঋণ গ্রহণ

পরিবারের আকার ও দরিদ্রতার সাথে পারিবারিক ব্যয় এবং পারিবারিক ব্যয়ের সাথে পারিবারিক ঋণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী ও বছরে প্রায় ৪-৫ মাস বেকার থাকার কারণে জেলেদের প্রতি বছর উচ্চ সুদে মহাজনী ঋণ গ্রহণ করতে হয়, যেখান থেকে এরা আর মুক্ত হতে পারে না। সারণি ১ হতে দেখা যায় যে, জেলেরা পরিবার প্রতি বাৎসরিক গড়ে প্রায় ৪৭৯০০ টাকা ব্যয় ও ৫২৫০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে থাকে। প্রধান মাঝির পারিবারিক ব্যয় ও ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তুলনামূলক বেশী। সুতরাং, এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে, জেলেদের ঋণ গ্রহনের পিছনে পরিবারের আকার, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ভূমিকা রয়েছে।

৩ ইলিশ আহরণ প্রক্রিয়া

৩.১ ইলিশ আহরণে বিনিয়োগ

ইলিশ আহরণে ব্যবহৃত অপরিবর্তনশীল ক্রয়ের অর্থ দাদনদার এবং পরিবর্তনশীল ক্রয়ের অর্থ মালিক সরবরাহ করে থাকে তবে শর্ত থাক যে পরিবর্তনশীল ক্রয়ের অর্থ মালিক ইলিশের বিক্রয়মূল্য হতে ফেরত পাবে। দাদনদার অপরির্তনশীল ক্রয়ের অর্থ মালিকের নিকট বিনিয়োগ করে। মূলত, উপরোক্ত দুই ধরনের সরবরাহ করার কারণে মালিক জেলেদের নিকট মূল বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচিতি পায়। প্রকৃতপক্ষে, সহায়ক উপকরণে মালিকের কোনো বিনিয়োগ থাকে না। অপরদিকে, ইলিশ আহরণে যতটুকু শ্রমের প্রয়োজন হয় তা সম্পূর্ণরুপে জেলেরা বিনিয়োগ করে। জেলেরা সরাসরি কোনো অর্থ বিনিয়োগ করে না, তবে ইলিশের বিক্রয়মূল্য থেকে পরিবর্তনশীল ক্রয়ের অর্থ পরিশোধের কারণে এরা অর্থ বিনিয়োগে কিছুটা ভূমিকা রাখে। সহায়ক বাবদ বিনিয়োগ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৩.১.১ দাদনদারের বিনিয়োগঃ অপরিবর্তনশীল উপকরণ ক্রয়

দাদনদার হলো ইলিশ আহরণ খাতের মূল বিনিয়োগকারী, যে বিনিয়োগের মাধ্যমে অপরিবর্তনশীল সমূহ ক্রয় করা হয়। এ খাতে একবার বিনিয়োগ করলে প্রায় ৫-৭ বছর যাবৎ আর বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণত শহরাঞ্চলের বড় বড় ইলিশ ব্যবসায়ীগণ শর্তসাপেক্ষে মালিকের নিকট অর্থ বিনিয়োগ করে।

শতকরা ৩৩ ভাগ দাদনদারের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা মধ্যে এবং শতকরা ৩১ ভাগের বিনিয়োগ প্রায় ৪ হতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। বিনিয়োগের পরিমাণ গড়ে প্রায় প্রায় ৪.৮১ লক্ষ টাকা।

৩.১.২ মালিকের বিনিয়োগ (ফেরতযোগ্য): পরিবর্তনশীল উপকরণ ক্রয়

ইলিশ আহরণে অপরিবর্তনশীল উপকরণের পাশাপাশি পরিবর্তনশীল উপকরণের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইলিশ আহরণ সংক্রান্ত প্রত্যেক ট্রিপে প্রয়োজনীয়। প্রতি ট্রিপের পরিবর্তনশীল ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ফেরতযোগ্য শর্তে মালিক জেলেদের নিকট সরবরাহ করে। এটি মাঠ পর্যায়ে মালিকের বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে জেলেদের বিনিয়োগ।

লক্ষণীয় যে প্রতি বছর পরিবর্তনশীল ক্রয় বাবদ শতকরা ৩৯ ভাগ মালিক প্রায় ৯০,০০০ থেকে ১২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে থাকে। এ খাতে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১১৫.৭০ হাজার টাকা। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে প্রতি ট্রিপ থেকে ফিরে এসে জেলেরা মালিককে তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত দিয়ে থাকে। সুতরাং, পরিবর্তনশীল ক্রয়ের অর্থ জেলেদের বিনিয়োগ বলে ধরা যেতে পারে।

৩.১.৩ জেলেদের শ্রম বিনিয়োগ ও দল গঠন

ইলিশ আহরণে জেলেদের শ্রমকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ব্যতীত ইলিশ আহরণ সম্ভব নয়। শ্রমের সাথে দৈহিক সুস্থতা ও কর্মাভিজ্ঞতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে, জেলেদল গঠন প্রক্রিয়া বিবেচনা করলে লক্ষ করা যায় যে শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এরা জ্ঞাতিসম্পর্ক, অভিজ্ঞতা ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মানসিক শক্তিকে ব্যবহার করে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে সমুদ্রগামী জেলেরা প্রতি ট্রিপে সাধারণত ২০ বা তদূর্ধ্ব দিন এবং নদীগামী জেলেরা দৈনিক ১৫ বা উদূর্ধ্ব ঘণ্টা ইলিশ আহরণে ব্যয় করে।

জেলে দলের সদস্য সংখ্যা গড়ে প্রায় ১১ জন এবং শতকরা ৫৭ ভাগ জেলে দল ৯ থেকে ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। ইলিশ আহরণকারী জেলেরা দল গঠনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কিত সদস্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। উক্ত সারণিতে আরো লক্ষণীয় যে, শতকরা ৯৫ ভাগ সদস্যই জ্ঞাতিসম্পর্কে সম্পর্কিত। পারিবারিক আয় বৃদ্ধি বা বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবহারের প্রত্যাশায় এরা দল গঠনে জ্ঞাতিসম্পর্ককে প্রাধন্য দিয়ে থাকতে পারে বলে অনুমিত হয়।

৩.২ ইলিশ আহরণ: বিক্রয়মূল্য

ইলিশ আহরণকে কেন্দ্র করে জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ-দুঃখ আবর্তিত হয়। সে কারণে, বছরের অধিকাংশ সময় এরা গভীর নদী ও সমুদ্রে অবস্থান করে ইলিশ আহরণে ব্যস্ত থাকে। মৌসুমের তারতম্য অনুসারে ইলিশ আহরণে ট্রিপ অনুযায়ী ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, যেমন অমাবস্যার জোতে তুলনামূলক বেশী ইলিশ আহরিত হয়। প্রতি ট্রিপে নদী বা সমুদ্র হতে ইলিশ আহরণ করে দাদনদারের আড়তে ফিরে আসে এবং কিছু দিন বাড়ীতে বিশ্রাম করে পুনরায় বেরিয়ে পড়ে। এভাবে এরা সারা বছর ধরে ইলিশ আহরণ করে। দাদনদারের আড়তে আহরণকৃত ইলিশের গড় বিক্রয়মূল্য প্রায় ১৪.৫৫ লক্ষ টাকা, যার প্রকৃত বাজার মূল্য গড়ে প্রায় ২১.৩৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং, জেলেরা প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ ইলিশ আহরণ করে তা বলা যেতে পারে। আহরিত ইলিশের আড়তে বিক্রয়মূল্য ও প্রকৃত বাজারমূল্যের ভিতর প্রায় ৬.৮০ লক্ষ টাকার ব্যবধান রয়েছে, যা থেকে জেলেরা বিদ্যমান বিক্রয় পদ্ধতির কারণে বঞ্চিত হয়।

৪ জেলেদের আয়

ইলিশ আহরণে জেলেদের শ্রম মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, মালিক-জেলে মৌখিক চুক্তিতে বিদ্যমান অসম আয় বণ্টন নীতিমালার কারণে জেলেরা মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ ভোগ করতে পারে। ফলে, পুঁজিপতি ও স্বার্থোন্বেষী মহল জেলেদের শ্রমের উপর ভিত্তি করে উদ্বৃত্ত মূল্য

বা মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। একদিকে এরা আহরিত ইলিশের প্রকৃত বাজারমূল্য পেতে ব্যর্থ হয়, অপরদিকে আড়তে বিক্রিত ইলিশের আয় হতে নায্য অংশ লাভে বঞ্চিত হয়। সে কারণে, শ্রম বিনিয়োগের তুলনায় জেলেদের বাৎসরিক ব্যক্তিগত আয় খুবই সামান

জেলে দলের বাৎসরিক গড় আয় প্রায় ২৯৮,৭৫০ টাকা। শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ জেলে দল প্রতি বছর ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকার আয় মতো করে থাকে। একই সাথে সারণি ৭ পর্যালোচনা করলে আহরিত ইলিশের আড়তে বিক্রয়মূল্য ও প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের তুলনায় জেলেদের আয় অতি সামান্য বলে প্রতীয়মান হয়।

৫ উদ্বৃত্ত মূল্য: জেলেদের শ্রম শোষণ

মার্কসীয় তত্ত্বে শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য ও শ্রমিকের অর্জিত মজুরির মধ্যে পার্থক্যকে উদ্বৃত্ত মূল্য বা শ্রম শোষণের পরিমাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সারণি ৫ ও সারণি ৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আড়তে বিক্রয়মূল্য ও জেলেদের আয়ের মধ্যে প্রায় ১১.৫৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত বাজারমূল্য ও জেলেদের আয়ের মধ্যে প্রায় ১৮.৩৬ লক্ষ টাকা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, ইলিশ আহরণ খাতে ঊদ্বৃত্ত মূল্য তৈরির পরিমাণ প্রায় ১১.৫৬ বা ১৮.৩৬ লক্ষ টাকা, যেটি থেকে জেলেরা বঞ্চিত হয়।

৬ জেলেদের শ্রম শোষণের প্রকৃতি

মালিক ও জেলেদের মধ্যে সম্পাদিত মৌখিক চুক্তিতে বিদ্যমান বিভিন্ন শর্তাবলি পুঁজিপতি কর্তৃক জেলেদের শ্রম শোষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জেলেদের শ্রম শোষণে কারা কিভাবে সংশ্লিষ্ট তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

৬.১ দাদনদার কর্তৃক শোষণ

চুক্তিতে দাদনদারের আড়তে আহরণকৃত ইলিশ বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকায় দাদনদার ক্রয় প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। উক্ত আড়তে মালিক নিযুক্ত একজন দালাল থাকে, যার ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র দাদনদার প্রেরিত ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলক বাজার অংশগ্রহণ করে। উক্ত বাজারে অন্য কোনো ক্রেতা অংশগ্রহণ না করায় দাদনদারের বেঁধে দেওয়া মূল্যে ইলিশ বিক্রয় হয়। ফলে, দাদনদার প্রকৃত বাজারমূল্যের অনেক কম মূল্যে আহরিত ইলিশ ক্রয় করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে। সারণি ৫ ও সারণি ৭ বিশ্লেষণে আহরিত ইলিশের প্রকৃত বাজারমূল্য ও দাদনদারের আড়তে বিক্রয়মূল্যের মধ্যে প্রায় ৬.৮০ লক্ষ টাকার ব্যবধান লক্ষ করা যায়। এটি প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ৩২ ভাগ, যা দাদনদার কৌশলে বাজার প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোগ করে।

সারণি ১ : আড়তে বিক্রয় মূল্য ও প্রকৃত বাজার মূল্যের তুলনামূলক বণ্টন

শেয়ারের খাত	আড়তে বিক্রয়মূল্য		প্রকৃত বাজারমূল্য	
	টাকার পরিমাণ	%	টাকার পরিমাণ	%
দাদনদার			৬৮০০০০	৩২
দালালের মজুরি	১৪৫৩৫০	১০	১৪৫৩৫০	৭
পরিবর্তনশীল ক্রয়ের অর্থ ফেরৎ	১৭৮০০০	১২	১৭৮০০০	৮
চাঁদাবাজ	১২০০০০	৮	১২০০০০	৬
সহায়ক মেরামত	২০০০০	১	২০০০০	১
মালিকের প্রতিনিধি	১৪০০০০	১০	১৪০০০০	৭
অন্যান্য	৫৫০০০	৪	৫৫০০০	৩
মালিক	৪৯৭৯০০	৩৪	৪৯৭৯০০	২৩

শেয়ারের খাত	আড়তে বিক্রয়মূল্য		প্রকৃত বাজারমূল্য	
	টাকার পরিমাণ	%	টাকার পরিমাণ	%
প্রধান মাঝি	৭৪,৬৮৮	৫	৭৪,৬৮৮	৩
ইঞ্জিনচালক	৩৭,৩৪৪	৩	৩৭,৩৪৪	২
সাধারণ মাঝি	১৭৪২৭০ (২৪৮৯৬)	১২(১.৭১)	১৭৪২৭০ (২৪৮৯৬)	৮ (১.৬৬)
পাঁচক	১২৪৪৮	১	১২৪৪৮	১
মোট	১৪৫৫০০০	১০০	২১৩৫০০০	১০০

উৎস: ক্ষেত্র জরিপ

টিকা: বন্ধনীর মধ্যে ১ জন সাধারণ জেলের প্রাপ্ত অংশ দেখানো হয়েছে।

৬.২ মালিক কর্তৃক শোষণ

ইলিশ আহরণ প্রক্রিয়ায় মালিকের তেমন কোনো অর্থ বিনিয়োগ না থাকলেও চুক্তির প্রধান পক্ষ হিসেবে সে গুরুত্বপূর্ণ অংশ লাভ করে। অপরিবর্তনশীল ক্রয়ের বিনিয়োগকারী সম্পর্কিত তথ্য জেলেদের নিকট অজ্ঞাত থাকায় এরা মালিককে বিনিয়োগকারী হিসেবে স্বীকার করে এবং পরিবর্তনশীল ক্রয় বাবদ ব্যয়িত অর্থ এরা মালিককে ফেরত দেয়। সুতরাং, তথ্য গোপন করার কৌশলে মালিক পরিবর্তনশীল ক্রয় বাবদ ব্যয়িত অর্থ ফেরত গ্রহণের মাধ্যমে জেলেদের শ্রমকে শোষণ করে। সারণি ৭ অনুসারে এ ক্ষেত্রে শোষণের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ১৭৮,০০০ টাকা, যা ইলিশের প্রকৃত বাজারমূল্য ও আড়তে বিক্রয়মূল্যের যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ১২ ভাগ। অপরদিকে, চুক্তি অনুসারে আয় মালিক ও জেলেদের মধ্যে ১০:৬ অনুপাতে বণ্টিত হয়, ফলে মালিক আয়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশ লাভ করে অর্থাৎ, মালিক বিনিয়োগ না করেও চুক্তির কৌশলে শ্রমিকের শ্রম শোষণ করে।

মালিক ইলিশ আহরণজনিত আয়ের শতকরা ৬২ ভাগ ভোগ করে। অপরদিকে মালিকের অংশ আহরিত ইলিশের আড়তে বিক্রয়মূল্য ও প্রকৃত বাজারমূল্যের যথাক্রমে শতকরা ৩৪ ও ২৩ ভাগ। সুতরাং, মালিক জেলেদের শ্রমের উল্লেখযোগ্য অংশ শোষণ করে থাকে তা বলা যেতে পারে।

৬.৩ দালাল কর্তৃক শোষণ

আহরিত ইলিশ দাদনদারের আড়তে বিক্রয় ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মালিক নিযুক্ত একজন মজুর থাকে, স্থানীয় ভাষায় তাকে দালাল বলে। দাদনদারের সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও সে ইলিশের বিক্রয়মূল্য থেকে মজুরি লাভ করে। সারণি ৭ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দালালের বাৎসরিক গড় আয় প্রায় ১৪,৫৩৫০ টাকা, যা আড়তে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ ও প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ৭ ভাগ। যেহেতু দালালের মজুরি জেলেদের অংশ হতে পরিশোধিত হয়, সেহেতু দালালের মজুরি প্রদানের মাধ্যমে জেলেদের শ্রম শোষণ করা হচ্ছে তা বলা যায়।

৬.৪. মালিকের প্রতিনিধি কর্তৃক শোষণ

ইলিশ আহরণের উদ্দেশ্যে নদী বা সমুদ্রে গমন করাকে জেলেদের ভাষায় ট্রিপ বলে। প্রত্যেক ট্রিপ তদারকি করার জন্য মালিক নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি থাকে। উক্ত প্রতিনিধি মালিকের উদ্দেশ্য পূরণে নিয়োজিত থাকলেও তার মজুরি ইলিশের বিক্রয়মূল্য হতে পরিশোধিত হয়। সুতরাং, মালিকের প্রতিনিধির মজুরি গ্রহণের মাধ্যমে জেলেদের শ্রমকে শোষণ করা হয় তা অনুমান করা

যায়। সারণি ৭ অনুযায়ী মালিকের প্রতিনিধির বাৎসরিক গড় আয় প্রায় ১৪০,০০০ টাকা, যা ইলিশের বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১০ ও প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ৭ ভাগ।

৬.৫. জলদস্যু বা চাঁদাবাজ কর্তৃক শোষণ

নদী ও সমুদ্রের বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন চাঁদাবাজ বা জলদস্যু কর্তৃক অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদার বিনিময়ে টোকেন বা স্লিপ সংগ্রহ ব্যতীত ইলিশ আহরণ সম্ভব নয়, ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভব হলেও তা বেশ ঝুঁকির সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলে দল এই টোকেন বা স্লিপ সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু. মজার ব্যাপার হলো এই স্লিপ ক্রয়ের অর্থ জেলেরা ইলিশের বিক্রয়মূল্য থেকে পরিশোধ করে। ফলে, দাদনদার বা মালিকের মুনাফা অর্জনের উপর এটির কোনো প্রভাব থাকে না। সারণি ৭ পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয় যে টোকেন বা স্লিপ ক্রয় বাবদ জেলেদের প্রতি বছর প্রায় ১,২০০০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়, যা বিক্রয়মূল্যের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ ও প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ৬ ভাগ। সুতরাং, চাঁদাবাজির মাধ্যমে জেলেদের শ্রম শোষণ করা হচ্ছে তা অনুমান করা যায়।

৬.৬ সহায়ক মেরামত বাবদ শোষণ

সহায়ক উপকরণসমূহ মেরামতের প্রয়োজন হলে তার ব্যয় জেলেরা বহন করে। এ জন্য মালিকে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। কিন্তু, যে পর্যন্ত উপকরণসমূহ ইলিশ আহরনে ব্যবহৃত হয়, সে পর্যন্ত দাদনদার ও মালিক উভয়েই মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। সুতরাং, জেলেদের আয় থেকে উপকরণসমূহ মেরামতের ব্যয় নির্বাহ করা জেলেদের শোষণ একটি কৌশল বলে ধরা যায়। সারণি ৭ অনুযায়ী সহায়ক মেরামত বাবদ বাৎসরিক গড় ব্যয় প্রায় ২০,০০০ টাকা, যা বিক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্য উভয়ের শতকরা ১ ভাগ।

৬.৭. প্রধান মাঝি কর্তৃক শোষণ

প্রধান মাঝি দলীয় নেতা হিসেবে বিবেচিত, যে মালিকের নিকট হতে সহায়ক উপকরন সংগ্রহ ও দল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ইলিশ আহরণ ক্ষেত্রে তার কোনো অর্থ বিনিয়োগ থাকে না। সে অন্যান্য জেলেদের মতোই শুধুমাত্র শ্রম বিনিয়োগ করে থাকে। সারণি ৭ অনুযায়ী দেখা যায় জেলেরা আহরিত ইলিশের প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ১৪ ভাগ ও আড়তে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ২১ ভাগ পেয়ে থাকে। কিন্তু, প্রাপ্ত আয়ের বেশীর ভাগ ভোগ করে প্রধান মাঝি। চুক্তিতে জেলে দলের প্রাপ্ত আয় প্রধান মাঝি, ইঞ্জিনচালক, সাধারণ মাঝি ও পাঁচকের মধ্যে যথাক্রমে ৩ : ১.৫ : ১ : ০.৫ অনুপাতে বণ্টন করার রীতি বিদ্যমান। সুতরাং, প্রধান মাঝি কর্তৃক অন্যান্য জেলেরা শ্রম শোষণের শিকার হয়ে থাকে তা বলা যেতে পারে।

জেলে দলের অর্জিত আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ প্রধান মাঝি ভোগ করে, যেখানে ইঞ্জিনচালক, সাধারণ মাঝি ও পাঁচক ভোগ করে যথাক্রমে শতকরা ১২.৫, ৮.৩৬ ও ৪ ভাগ।

৬.৮. বিবিধ ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে শোষণ

ইলিশ আহরণজনিত পেশায় টিকে থাকার স্বার্থে জেলেদেরকে স্থলে বিভিন্ন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা করতে হয়। এ সকল গোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ঘাটমালিক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, মৎস্য অফিসের সদস্য, সাংবাদিক ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এরা শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হওয়ায় জেলেরা

ইলিশের বিক্রয়মূল্য হতে বিভিন্ন সময়ে এদেরকে মাসিক চাঁদা, উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করে থাকে। সুতরাং, বিবিধ ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে জেলেদের শ্রম শোষিত হয় তা অনুমান করা যায়। সারণি ৭ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে বিবিধ ব্যয় বাবদ জেলেদের বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ৫৫,০০০ টাকা, যা বিক্রয়মূল্যের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ এবং প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা প্রায় ৩ ভাগ।

৬.৯. মহাজন কর্তৃক শোষণ

মহাজন সরাসরি জেলেদের শ্রম শোষণের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং আয় শোষণের সাথে সম্পৃক্ত। বেকারকালীন সময়ে যখন জেলেদের অর্থের প্রয়োজন পড়ে তখন মহাজন এদেরকে উচ্চসুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। ইলিশ মৌসুমে জেলেরা সুদসহ উক্ত ঋণ পরিশোধ করে এবং পরবর্তীতে আবার ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে চক্রাকারে জেলেদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। নিম্নের প্রবাহচিত্রে মহাজনী ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের দুষ্টচক্র দেখানো হলো।

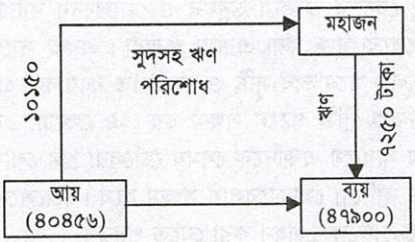

প্রবাহচিত্র ১ : মহাজনী ঋণচক্র

প্রবাহচিত্র ২ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, জেলেরা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭২৫০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং পরে সুদসহ প্রায় ১০,১৫০ টাকা পরিশোধ করে অর্থাৎ সুদের হার শতকরা ৪০ ভাগ। সুদসহ ঋণ পরিশোধের কারণে জেলেদের ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে জেলেদের আয়ের বেশীর ভাগই মহাজনের দখলে চলে আসে। সুতরাং, ঋণ প্রদানের কৌশলে মহাজন পরোক্ষভাবে জেলেদের শ্রম শোষণ করে বলে ধরা যায়।

৭. জেলেদের শ্রম শোষণের প্রায়োগিক কাঠামো বিশ্লেষণ

জেলেদের শ্রম শোষণের পিছনে বহুমুখী কারণ ক্রিয়াশীল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান এবং চক্রাকারে আবর্তিত হয়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ক্রিয়াশীল হতে পারে না। মূলত প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এই সকল উপাদান বিদ্যমান থাকে, যা জেলেদের শ্রম শোষণের প্রায়োগিক কাঠামো রচনায় পুঁজিপতিদের সাহায্য করে।

লক্ষ করা যায় যে, জেলেরা আহরণকৃত ইলিশের প্রকৃত বাজারমূল্যের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ ভোগ করতে পারে। কিন্তু, এ আয়ের কিছু অংশ ঋণের সুদ (শতকরা ৪০ ভাগ হারে) হিসেবে মহাজনের কাছে চলে যায়। অন্যদিকে, প্রকৃত বাজারমূল্য থেকে জেলেদের প্রাপ্ত আয় বাদ দিলে শতকরা ৮৬ ভাগ অবশিষ্ট থাকে, যাকে উদ্বৃত্ত মূল্য অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য হতে যেমন দাদনদার, মালিক, দালাল, মালিকের প্রতিনিধি ও জলদস্যু/ চাঁদাবাজ অংশ লাভ করে, তেমন মেরামত ও বিবিধ ব্যয় মেটানো হয়। উক্ত প্রবাহচিত্রে আরো দেখা যায় যে দাদনদার নিয়নিত্রক বাজার প্রতিযোগিতা সৃষ্টির কৌশলে প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ৩২

ভাগ মুনাফা অর্জন করে। অপরদিকে, বিনিয়োগ না করেও মালিক আয় করে শতকরা ২৩ ভাগ। আহরণকৃত ইলিশের প্রকৃত বাজারমূল্যের শতকরা ৭, ৭ ও ৬ ভাগ যথাক্রমে দালাল, মালিকের প্রতিনিধি এবং চাঁদাবাজদের কাছে চলে যায়। পরিবর্তনশীল উপকরণ ক্রয়, সহায়ক উপকর মেরামত ও বিবিধ ব্যয় বাবদ খরচ হয় বিক্রয়মূল্যের যথাক্রমে শতকরা ৮, ১ এবং ৩ ভাগ। মোদ্দাকথা, ইলিশ আহরণে ব্যবহৃত জেলেদের শ্রমের শতকরা ৮৬ ভাগ শোষণের শিকার হচ্ছে তা অনুমান করা যায়।

৮ উপসংহার

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে ইলিশ আহরণকারী জেলে সম্প্রদায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যে ভূমিকা পালন করে তা বেশ গুরুত্ববহ। এ ভূমিকা পালনে এরা এদের শ্রম, সামর্থ্য, মেধা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করলেও মোট আয়ের অতি সামান্য অংশ ভোগ করার সুযোগ পায়। বিনিয়োগকৃত শ্রমের বেশির ভাগ পুঁজিপতি কর্তৃক শোষণ করার ফলে দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও জেলেদের দারিদ্র্য মোকাবেলার স্বার্থে এদেরকে শ্রম শোষণের জাল থেকে মুক্ত করা একান্ত জরুরী। একই সাথে এদেরকে সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধিকরণ, সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি ও সমষ্টিগত কার্যাবলী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে এরা সামাজিক পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন জেলেরা শ্রম শোষণের জাল থেকে মুক্ত হতে পারবে, অপরদিকে তেমন দারিদ্র্য মোকাবেলায় সক্ষম হবে। জেলেদের শ্রম শোষণের জাল থেকে মুক্তকরনের লক্ষে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. উপকূলবর্তী এলাকার খাস জমিতে 'জেলে পল্লী' গঠন করা এবং সেই সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদনজনিত সুবিধাবলী সরবরাহ করা।

খ. জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র দল গঠন করে জেলেদের সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

গ. ইলিশ আহরণের জন্য প্রত্যেক জেলে দলকে সরকারিভাবে বিনা সুদে বা সহজ শর্তে ঋণ বা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা। ঋণ প্রদান করলে, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা সহজ করা।

ঘ. আহরিত ইলিশ বিক্রয়ের জন্য খোলা বাজারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং বিক্রয়যোগ্য ইলিশের নায্য মূল্য নিশ্চিত করা।

ঙ. ইলিশ আহরণের সুবিধার্থে জলে ও স্থলে জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ. আপদকালীন সময় মোকাবেলায় জেলেদের জন্য সরকারি ত্রাণ বা ঋণ প্রদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তাকে আরো জেলেবান্ধব করা।

আইবিএস প্রকাশনা

1976	The *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* i) English volums.1–32 (1976–2009) and *ii)* Bangla volums 1–17 (1993–2010)
1977	David Kopf & S. Joarder, eds. *Reflections on Bengal Renaissance* (Seminar Volume 1).
১৯৭৯	এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *ঐতিহ্য–সংস্কৃতি-সাহিত্য* (সেমিনার ভলিউম ৩).
1981	Enayetur Rahim. *Provincial Autonomy in Bengal (1937–1943).*
1981	M.K.U.Molla. *The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905–1911).*
1981	S.A.Akanda, ed. *Studies in Modern Bengal* (Seminar Volume 2).
1983	S.A.Akanda, ed. *The District of Rajshahi : Its Past and Present* (Seminar Volume 4).
1984	M.S. Qureshi, ed. *Tribal Cultures in Bangladesh* (Seminar Volume 5).
১৯৮৫	আমানুলাহ আহমদ। *বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা* (সেমিনার ভলিউম ৬).
1991	Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period*, Vol 1.
1991	S.A.Akanda & M. Aminul Islam. *Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh.* (Seminar Volume 8).
১৯৯১	এস.এ. আকন্দ, সম্পা.। *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার ভলিউম ৭).
১৯৯২	আবদুল করিম। বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড।
1993	Md. Shahjahan Rarhi. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An Up–to–date Index.*
1995	Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period*, Vol 2.
১৯৯৭	এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার ভলিউম ৯)।
2002	Md. Shahjahan Rarhi. *Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses.*
2004	Pritikumar Mitra & Jakir Hossain (eds.). *Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm.*
2004	The Institute of Bangladesh Studies: An Introduction.
২০০৯	মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*
২০১০	মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *বিশ শতকের বাংলা* (সেমিনার ভলিউম ১০)
2010	Md. Shahjahan Rarhi. *Annotated Bibliography of PhD Theses: Produced in the Institute of Bangladesh Studies, 1976–2010.*
2010	Md. Shahjahan Rarhi. *Index to the Journal of The Institute of Bangladesh Studies: Volume 1-32 (1976-2009)*

সপ্তদশ সংখ্যার সূচিপত্র

স্বরোচিষ সরকার	॥ বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি	৭
গৌতম কুমার দাস	॥ বিষাদ-সিন্ধু : নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন	৩৩
ইয়াসমিন আরা সাথী	॥ শামসুর রাহমানের গল্প এবং উপন্যাসে শব্দের ব্যবহার	৪৯
মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগম	॥ বিভূতিভূষণের দুর্গা : সীমাবদ্ধতার প্রতিকৃতি	৬১
তপন কুমার গাঙ্গুলী	॥ পাগলা কানাইয়ের গান : কবির আত্মপরিচয়ের দলিল	৭৭
তপন কুমার রায়	॥ জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : রাজনৈতিক অনুষঙ্গ	৯৩
মোঃ গোলাম সারওয়ার	॥ কবি জয়দেব : প্রাচীন বাংলার গৌরব	১০১
শাহরিয়ার হোসেন	॥ বাংলাদেশের মাটির পুতুল : নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক মান	১১১
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা	॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর চিত্রকলা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুরাগ	১২৫
মো. আতাউর রহমান	॥ ১৯৭১-এ পাবনা জেলার হাদল-কালিকাপুর গ্রামে গণহত্যা	১৩৯
এম. আমিনুর রহমান	॥ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৭২-১৯৯০)	১৪৭
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম	॥ সুরা মসজিদ : স্থাপত্যিক উৎস পর্যালোচনা	১৫৯
মোঃ হাবিবুল্লাহ	॥ তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা : বগুড়া জেলার দুটি ইউনিয়নভিত্তিক সমীক্ষা	১৭৩
মো. ছাদেকুল আরেফিন	॥ নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষদের সচেতনতা : একটি গ্রামকেন্দ্রিক সমীক্ষা	১৯৯
রিপন কুমার সরকার	॥ ওরাওঁ সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি	২১১